শিকারের কথা

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

(ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্
ও তথাকার হাইকোর্টের
ভূতপূর্ব্ব জজ্)

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য আড়াই টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

'শিকারের কথা' প্রধানতঃ কাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে এবং তাতে কি কি বলতে চেয়েছি তা, 'কথা'র আরম্ভেই, যাদের উদ্দেশে লিখিত তাদেরই সম্বোধন ক'রে বলেছি। তার পরে কিন্তু 'কথা' বলতে বলতে মনে হ'ল যে তরুণ-বয়স্ক পাঠক পাঠিকা ছাড়া অন্য পাঠকদের পক্ষেও সম্ভবতঃ বইখানা অনুপযোগী না হতে পারে। প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যাঁরা শিকার শিখছেন বা শিখতে চান এই পুস্তক তাঁদের শিকার শিক্ষার অনুকুল হওয়া অসম্ভব নয়, এবং সত্যকার শিকারের সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী এমন সাধারণ পাঠকদেরও কৌতূহল এর দ্বারা অন্ততঃ কতকটা তৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করি। তা হ'লেও আমি তরুণ-বয়স্কদের সম্বোধন ক'রে বলার সুর শেষ পর্য্যন্ত বজায় রেখে গিয়েছি।

পুস্তকের 'উপসংহার' সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। মূল পুস্তকটি বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে লেখা শেষ হয়েছিল এবং উপসংহারটি সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) লেখা হয়েছে। উপসংহারের ভাষা মূল পুস্তকের ভাষা হতে কতকটা বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয় বস্তুর সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রাখতে হ'লে এই পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

গ্রন্থকার

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

উৎসর্গ

আমার গল্প শুনতে শুনতে যাদের মুখ চোখ কখন উজ্জ্বল কখন ম্লান হয়েছে দেখেছি, আর কল্পনার চোখে দেখি এই বই পড়তে পড়তে যাদের মুখে চোখে হয়ত ঐ রকম অনুভূতির ছাপ জেগে উঠবে, ঘরে যাদের মুখ আমার চার পাশে ফুলের মতো ফুটে থাকে, বাহিরে আমার দৃষ্টি যাদের ঐ রকম মুখ লোকের ভিড়ের ভিতরে কেবলি খুঁজে বেড়ায়, ঘরে বাহিরে যাদের মুখের তরুণ আভা আমার মনে আনন্দ ও বেদনা দুইই এক সঙ্গে জাগায়, যাদের বর্ত্তমানকে অনিমেষ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি, সময়ের যবনিকা তুলে ধ'রে যাদের ভবিষ্যৎকে দেখবার জন্য দিব্যদৃষ্টি পেতে ইচ্ছা হয়, তাদের হাতে এই বই খানি দিয়ে কৃতার্থ হলাম।

গ্রন্থকার

উপহার

শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থকার)।

বিষয় সূচী

১ম পরিচ্ছেদ—(৩—৫ পৃঃ)। কি হ'লে ভালো পাখী শিকারী হওয়া যায়। চাঁদমারীতে নিপুণতা ও শিকারে বন্দুক চালনায় নিপুণতার পার্থক্য। পাখী শিকারের একটি ছোট গল্প।

২য় পরিচ্ছেদ—(৬—২৫ পৃঃ)। বন্দুকের কথা। সাধারণতঃ কত রকমের বন্দুক হয়। সাদা-নলী বন্দুক ও রাইফ্‌লের গঠনের ও ব্যবহারের পার্থক্য। অটোমেটিক্ রাইফল্ কাকে বলে। রাইফ্‌লে নিশানা করার উপায় ও ও প্রণালী।

৩য় পরিচ্ছেদ—(২৬—৪৫ পৃঃ)। জঙ্গল 'বিট্' করে শিকার বা বেড় শিকার জিনিষটা কি। ঐরূপ শিকারের প্রণালী। একটা বড় বেড় শিকারের গল্প। হাতী কি ক'রে 'রোগ্' বা গুণ্ডা হয়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ—(৪৬—৫২ পৃঃ)। শিকারের নিয়মের লঙ্ঘনে শিকারীর কিরূপ বিপদ ঘটতে পারে। বন্য জন্তু হ'তে না হয়ে অন্য যে রূপে শিকারীর বিপদ ঘটতে পারে তার কয়েকটা গল্প।

৫ম পরিচ্ছেদ—(৫২—৬৪ পৃঃ)। একটি বিশেষ প্রণালীর বেড় শিকার। ঐরূপ শিকারের সম্বন্ধে একটি ঘটনা। হাতী দিয়ে 'বিট্' ক'রে শিকার।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—(৬৫—৮৭ পৃঃ)। বেড় শিকার ব্যতীত অন্য কি উপায়ে শিকারী সহজে জঙ্গলের জানোয়ারের দেখা পায়। ভালুকের আচরণের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা। ভালুক শিকারের কয়েকটি গল্প। একটি বড় রয়্যাল্ টাইগারের অদ্ভুত উপায়ে মৃত্যুর গল্প। বাঘে ভালুকে যুদ্ধ কখন হয় এবং তার ফল কি দাঁড়ায়।

৭ম পরিচ্ছেদ—(৮৮—১১৫ পৃঃ)। বাঘের কথা। বাঘ কত রকমের হয়, রয়্যাল্ টাইগার্ ও লেপার্ড্ বা প্যান্থার্। তাদের আকৃতির ও স্বভাবের

পার্থক্য। একটি ম্যান্-ইটার্ টাইগার্‌কে শিকারের গল্প। ম্যান্-ইটার্ টাইগার্ ও ম্যান্-ইটার্ প্যান্থারের মানুষ-শিকারের বিষয়ে আচরণের পার্থক্য। কি ক'রে বাঘ মানুষ-শিকারে অভ্যস্ত হয়। শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার চতুরতা বাঘ কি ক'রে অর্জ্জন করে। ঐরূপ চতুর বাঘকে শিকারী কিরূপে প্রতারিত করতে পারে তার একটা গল্প। শিকার ধরার পরে বাঘের কিরূপ আচরণ হয়ে থাকে এবং তা জানা থাকলে শিকারী মানুষের কি সুবিধা হয়।

৮ম পরিচ্ছেদ—(১১৬—১৪১ পৃঃ)। একটা ম্যান্-ইটার্ টাইগার্‌কে শিকারে শিকারীর অসাধারণ সাহস ও ধৈর্য্যের চিত্তাকর্ষক গল্প। একটি প্যান্থার্ শিকারের বড় গল্প। শিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ লোকের হঠকারিতায় কি রকম বিপদ ঘটতে পারে। অভিজ্ঞ শিকারীর ভুল থেকেও কিরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার দৃষ্টান্ত।

৯ম পরিচ্ছেদ—(১৪২—১৬১)। শিকারী কি কি উপায়ে শিকারের জন্তু হ'তে আত্মগোপন ক'রে শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। মাচান ও ট্রেঞ্চের বিবরণ ও তাদের সুবিধা অসুবিধা। অন্ধকার রাত্রিতে ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চের সাহায্যে শিকারের প্রণালী ও ঐরূপ শিকারের কয়েকটি গল্প।

১০ম পরিচ্ছেদ—(১৬২—১৯৮ পৃঃ)। ম্যান্-ইটার্ প্যান্থার্ যে কত ভীষণ চতুর হ'তে পারে তার কয়েকটা গল্প। একটি ঐ রূপ প্যান্থার্‌কে শিকারের চেষ্টায় ক্ষোভজনক বিফলতার গল্প। 'কল-কাঁড়' কা'কে বলে এবং তা দিয়ে কি ক'রে জানোয়ার মারা যায়। ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্-টাইগারের সম্মুখীন একটি সাঁওতাল যুবকের অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক এক ঘটনা। মহিষকে আক্রমণকারী রয়্যাল্-টাইগার্‌কে একটি কোল যুবক কিরূপে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তীর দিয়ে হত্যা করেছিল। অতর্কিতে রয়্যাল্-টাইগারের নিকটে গিয়ে পড়ায় একটি লোক কিরূপে নিহত হয় এবং তার পর শিকারী বাঘকে কি ক'রে শিকার করেন। সময় সময় ম্যান্-ইটার্ টাইগার্ কত নির্ভীক হ'তে

পারে তার দৃষ্টান্ত। শিকার ধরা সম্বন্ধে বাঘ ও সিংহের পার্থক্য। প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত ও এখনকার ভারতীয় সিংহের তুলনা।

১১শ পরিচ্ছেদ—(১৯৯—২২২ পৃঃ)। কয়েকটা বাঘের গল্প যাতে তাদের স্বভাবের আরো পরিচয় পাওয়া যায়। প্যান্থার্-শিকারের সঙ্গে জড়িত একটি মজার ঘটনা। ঘরের মধ্যে প্যান্থার্ শিকার। বাঘ আহত হয়ে নির্জীবের মতো প'ড়ে থাকলেও সতর্ক হয়ে তার কাছে যাওয়া উচিত, এবং ঐ সতর্কতার অভাবে কি ঘটতে পারে তার গল্প। প্যান্থার্ কতদূর বে-পরোয়া হ'তে পারে তার দৃষ্টান্ত। একটা প্যান্থার্-শিকারে দারুণ দুর্ঘটনার গল্প।

১২শ পরিচ্ছেদ—(২২৩—২৩৭ পৃঃ)। হরিণের কথা। কয়েক জাতীয় হরিণের বর্ণনা। হরিণ শিকারের দু'একটি গল্প। একটি ছোট হরিণকে ধরবার চেষ্টার শোচনীয় পরিণাম। কোল সাঁওতালদের মধ্যেও শিকারের সম্বন্ধে ন্যায়ানুবর্ত্তিতা কত থাকতে পারে তার দৃষ্টান্ত। Salt lick বা 'ভোল' কা'কে বলে, উদ্ভিদ্-ভোজী জন্তুরা সেখানে যায় কেন। পুরুষ সম্বর হরিণের একটি অদ্ভুত অভ্যাসের কথা। বর্ষাকালে পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে হরিণ শিকার।

১৩শ পরিচ্ছেদ—(২৩৮—২৬০ পৃঃ)। জঙ্গলের আর কয়েকটি জানোয়ারের কথা। গয়াল বা ভারতীয় বাইসনের বর্ণনা। গয়ালও কখন কখন 'রোগ্' বা গুণ্ডা হয়। রোগ্ হাতীর সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা। হাতী-ধরা বা 'খেদা'র বর্ণনা। বন্য বরাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও তার কারণ। বন্য কুক্কুরের স্বভাব ও বিস্ময়কর দুঃসাহস। বনের ভয়ঙ্কর জীব অহিরাজ বা সর্পভুক্ গোক্ষুরের আকার ও স্বভাবের বিবরণ। কি ক'রে তাদের ধরা হয়।

উপসংহার—(২৬১—২৬৭ পৃঃ)

পরিশিষ্ট ও অশুদ্ধি সংশোধন—(২৬৮—২৬৯ পৃঃ)

ছেলে মেয়েরা, তোমরা শোন,

"বাবু গল্প বল।" আমার চার বৎসরের নাতি আমাকে 'বাবু' বলে, আর সে রোজই গল্প বলতে বলে। রামায়ণ মহাভারতের গল্প, বাঘ ভালুকের গল্প, তা ছাড়া কত কি আবোল তাবোল গল্প প্রায় রোজই তার ধারণার মতো ক'রে তাকে বলতে হয়। তার চেয়ে বড় বড় ছেলে মেয়েরাও সময়ে সময়ে এসে ঐ সব গল্প শোনে দেখতে পাই। গল্প শুনতে সকলেই চায়। আমার যে ষাট বৎসরের উপর বয়স হ'ল, আমিও গল্প পেলে আর সব ভুলে গিয়ে গল্প শুনি। তা আর হবে না কেন? এই বিশ্বজগৎটাই একটা অফুরন্ত গল্প কি না? কে একজন গল্প ব'লে যাচ্ছেন, আর এই বিশ্বের যা কিছু সব ফুটে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কত আলো কত অন্ধকার, কত মাধুর্য্য কত ভীষণতা, কত হাসি কত কান্না, কত প্রীতি কত হিংসা, কত পুণ্য কত পাপ, কত জীবন কত মৃত্যু। তুমি আমি সকলেই এই গল্পের ভিতর রয়েছি। সেই জন্যই বোধ হয় গল্প বলা আর শোনা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব।

আমি কিন্তু গল্প বলার চেয়ে গল্প শুনতে ভালোবাসি। আর ভালো ক'রে গল্প বলাও সহজ নয়। তবুও আমি বলতে বসেছি তার কারণ এই যে বহুদিন ধ'রে এক এক ক'রে আমার কাছে কতকগুলি গল্প জমে গেছে যা হয়ত তোমাদের শুনতে

ভালো লাগবে। এই গল্পগুলোও বানান গল্প নয়, সত্য গল্প। এর অধিকাংশ ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছে ; আর বাকীগুলি এমন লোকের কাছে শোনা যিনি নিজে সেগুলির সঙ্গে প্রধান ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তোমাদের শিকারের গল্প বলতে চাই।

অনেক দিন ধ'রে শিকার ক'রে যে সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলাম তা এই গল্পগুলোর সঙ্গে কতক কতক বলতে ইচ্ছা করি। তা কিন্তু খুব ছোটরা বুঝতে পারবে না। বিশেষতঃ যে রকম ভাষায় সেগুলো বলবার দরকার হবে সে ভাষা তাদের জন্য নয়। তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড় হয়েছ তারা বুঝতে পারবে। এই সব গল্প যদি তোমাদের ভালো লাগে, তোমরাই না হয় আর সব বাদ দিয়ে কেবল গল্পগুলোই ছোটদের বোলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিকারের গল্প বলতে গিয়ে আমি পাখী শিকারের কথা তোমাদের বেশী কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। তার মানে এ নয় যে পাখী শিকারে শিকারীর বাহাদুরী বা নিপুণতা কিছু প্রকাশ পায় না। পাখী শিকারে সাহসের কোনো পরিচয় নাই বটে, কিন্তু তাতে অস্ত্রচালনায়—অর্থাৎ বন্দুক ছোড়ায় নিপুণতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় ; বিশেষত উড়ন্ত বেগগামী পাখীর, —যেমন পায়রা, ঘুঘু, বুনো হাঁস, স্নাইপ্ বা কাদা-খোঁচা প্রভৃতির শিকারে। বন্দুক চালনায় এবং মুহূর্ত্তমাত্র দেখে দ্রুত উড়ন্ত পাখীর গতির বেগ ও দিক উপলব্ধি করায় অভ্যস্ত না থাকলে ভালো পাখী শিকারী হওয়া যায় না। এরকম ভালো শিকারীর সংখ্যা বেশী নয়, যেমন ভালো ক্রিকেট্ খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বেশী নয়। যখন ভালো বোলার্ (Bowler) বেগে বল্ করে তখন ভালো ব্যাট্স্-ম্যান্ (batsman) যেমন চক্ষুর নিমেষে বলের গতিবেগ, গতির দিকের বা লাইনের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন, বলের পিচ্ (pitch) সমস্ত একসঙ্গে ধারণা ক'রে নিয়ে ব্যাট্ চালনা করে, উড়ন্ত দ্রুতগামী পাখীর শিকারীও সেই মতো বন্দুক চালনা করে, জানবে। এতে পাখীর গতির বিচারে যেমন ক্ষিপ্রতার দরকার, মুহূর্ত্তমাত্রে লক্ষ্য স্থির ক'রে তেমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুক চালনারও দরকার। ভালো

শিকারের কথা

শিকারী উড়ন্ত পাখীই শিকার করে, পারতপক্ষে ব’সে থাকা পাখী শিকার করে না। চাঁদমারী করতে, অর্থাৎ ধীরে সুস্থে লক্ষ্য স্থির ক’রে কোন একটা স্থির বোর্ডের উপর আঁকা একটা চাঁদের মত গোল চাকার ঠিক মধ্যস্থলে বা তার খুব কাছাকাছি গুলী লাগাতে অনেক লোক অনেক দূর থেকেও পারে, কিন্তু যদি ঐ লোকের উড়ন্ত পাখীর উপর বা দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছে এমন জন্তুর উপর গুলী চালানর ক্ষিপ্রতা না থাকে তাহ’লে সে ভালো শিকারী হ’তে পারে না।

আমি পাখী শিকারের গল্প বেশী বলতে চাই না কারণ ঐ গল্প তোমাদের বেশ ভালো লাগবে ব’লে আমার বিশ্বাস নাই। কখন কখন দেখতে পাই বটে যে ছেলেমেয়েদের জন্য বা আমার মত বৃদ্ধের জন্যও ছাপান মাসিক পত্রিকায় একটি হাঁস বা ঘুঘু শিকারের গল্প ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক’রে বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে শিকারের গল্প বলা চলে না, বরং শিকারের অছিলায় চড়ুইভাতি করার গল্প বলা চলে।

তবু একটা পাখী শিকারের ছোট গল্প বলি। ঘটনাটা আমার মনে আঘাত দিয়েছিল ব’লে অনেকদিনের কথা হ’লেও আমার বেশ মনে আছে। একদিন সুবর্ণরেখা নদীতে চখাচখী (চক্রবাক) হাঁস শিকার করতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার আগে এক জোড়া পাখীকে নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখে একটিকে লক্ষ্য ক’রে বন্দুক ছোড়ায় পাখীটি আহত হয়ে নদীর জলে পড়ে ম’রে ভাসতে লাগল, আর আমার চাকর তাকে তুলে নিয়ে এল। নদীর ধারেই একটা বাংলোতে সে রাত্রির মতো আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। মৃত পাখীর সঙ্গী বা সঙ্গিনী

সেই যে সন্ধ্যার সময় থেকে বাংলোর কাছে নদীর উপরে ডাকতে ডাকতে আকাশে দিকে দিকে উড়ে বেড়াতে লাগল, সমস্ত রাত্রি সে ডাকের আর বিরাম ছিল না। শেষরাত্রি পর্যান্ত জ্যোৎস্না ছিল এবং যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ তার ডাক শুনেছিলাম। খানিকটা থামে, আবার ডেকে ওঠে। চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পর আর তার ডাক শুনতে পাই নি। যতক্ষণ তার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম ততক্ষণ তন্দ্রা আসলেও ঘুমুতে পারি নি। মাঝে মাঝে নদীর ধারে এসে পাখীটির ডাক লক্ষ্য ক'রে জ্যোৎস্নার আলোতে তাকে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাই নি। আর দেখতে পেলেই বা কি করতাম ?

আমি তোমাদের বেশীর ভাগ বাঘ ভালুকের আর দু' একটা বা হরিণ শিকারের গল্পই বলব। সেগুলো শুনতে তোমাদের বোধ হয় মন্দ লাগবে না। তবে সে সব গল্পও বেশী বলতে গেলে একঘেয়ে হয়ে যাবে। চেষ্টা করব যেগুলোর ভিতর কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে, সেইগুলোই বলতে। কি বল ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঘ ভালুক প্রভৃতি বড় জন্তু শিকারের গল্প শোনার আগে তোমাদের আর একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। শিকারে কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয় আর শিকার কত রকমের করা হয়ে থাকে তার একটা মোটামুটি আভাস আমি এইখানে দিতে চাই,—তাতে আমার গল্প বলবার আর তোমাদেরও শোনবার সুবিধা হবে। আগে অস্ত্রের কথাই বলি।

তোমরা সকলেই জান শিকার করতে হলে বন্দুকের দরকার হয়। বন্দুক দেখেছ সকলেই, কিন্তু বন্দুক সাধারণতঃ কত রকমের হয় তা বোধ হয় সকলে জান না। বন্দুক মোটামুটি দুই রকমের হয় বলা যেতে পারে। এক রকম হচ্ছে স্মুথ্-বোর্ বন্দুক (Smooth-bore Gun), আর একরকম হ'ল রাইফ্‌ল্ (Rifle)। নলার ভিতরের গঠনকে বোর্ বলে। স্মুথ্-বোর্ বন্দুকের নলার ভিতরটা একেবারে মসৃণ বা প্লেন্,—একটা সাধারণ জলের পাইপের ভিতরটা যেমন হয়। আমি এই বন্দুককে 'সাদা-নলী' ব'লে নাম দিতে চাই। সাধারণতঃ গৃহস্থের ঘরে এই বন্দুকই বেশী দেখা যায়, এবং তোমাদের অনেকেই এই বন্দুকের নলার ছিদ্রের মুখে বা পিছন দিকে চোখ লাগিয়ে দেখেছ ভিতরের দিকটা কেমন আয়নার মত প্লেন্ আর ঝক্‌ঝকে। রাইফ্‌লের নলার ভিতরটা সম্পূর্ণ প্লেন্ নয়, ভিতরটাতে আগা গোড়া স্ক্রুয়ের মতো ক'রে একটা অগভীর প্যাঁচালো খাঁজ কাটা থাকে। ছিদ্রের ভিতরে আলো ফেলে

দেখলেই ঐ খাঁজটি স্পষ্ট দেখা যায়। রাইফ্‌ল্‌ বন্দুকের কোন দেশী নাম দেওয়ার দরকার মনে করি না। রাইফ্‌ল্‌ নলা সম্পূর্ণ ইউরোপ থেকে আমদানী। ইউরোপীয়েরা আমাদের দেশে আসবার আগে আমাদের দেশের লোকেরা 'সাদানলী' বন্দুকের ব্যবহার জানত।

এই দুই রকম বন্দুকই এক নলার বা দুই নলার হ'তে পারে। দুই নলার বন্দুককে দুনলী বা জোড়নলী বন্দুক বলে। তোমরা প্রায় সকলেই একনলী আর দুনলী দুই রকমই দেখেছ।

এক রকম একনলী রাইফ্‌ল্‌ আছে, তার নাম মেগাজিন্‌ (Magazine) রাইফ্‌ল্‌। মেগাজিন্‌ মানে একটি আধার যার ভিতর কতকগুলি কার্ত্তুস্‌ একসঙ্গে রাখা যায়। এই রকম একটি ক'রে মেগাজিন্‌ এই রাইফ্‌ল্‌ গুলিতে সংযুক্ত থাকে এবং মেগাজিন্‌টি রাইফ্‌লেরই একটি অংশ বলা যেতে পারে। মেগাজিন্‌ রাইফ্‌ল্‌ এমনভাবে তৈরী যাতে একটি কার্ত্তুস্‌ ফায়ার্‌ হবার পর বন্দুক-সংলগ্ন কোন বিশেষ অংশে (যার নাম লিভার্‌) হাত দিয়ে ঠেলা বা টানামাত্রই যে কার্ত্তুস্‌টি ফায়ার্‌ হয়ে গেল সেটি নলা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেগাজিন্‌ থেকে আর একটি কার্ত্তুস্‌ গিয়ে নলার মধ্যে ঢোকে। তখন বন্দুকের ঘোড়া টিপলেই ঐ নতুন কার্ত্তুস্‌টি ফায়ার্‌ হয়ে যাবে। এতে সুবিধা এই যে প্রত্যেকবার ফায়ারের পর নলার পিছন দিক খুলে, হাত দিয়ে ঐ ফায়ার্‌ করা কার্ত্তুস্‌ বা'র ক'রে ফেলতে আর তারপর কার্ত্তুসের থলি বা বাক্স থেকে অন্য কার্ত্তুস্‌ বা'র ক'রে হাত দিয়ে নলার ভিতর পূরতে যে অনেকটা সময় লাগে সেই সময়টা

অপব্যয় হয় না, এবং ফলে কয়েকটা ফায়ার্ খুব শীঘ্র শীঘ্র করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয়টা কার্ত্তুস্ এক একটি মেগাজিনে থাকে। আবার এ রকম মেগাজিন্ রাইফল্‌ও আছে যাতে একটা কার্ত্তুস্ ফায়ার্ হওয়ার পরে আর হাত দিয়ে কিছুই করতে হয় না, আপনা আপনি ফায়ার্ হওয়া কার্ত্তুস্ তৎক্ষণাৎ নলা থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার জায়গায় আর একটি কার্ত্তুস্ মেগাজিন্ থেকে বা'র হয়ে নলার ভিতর যায়। এই রকম রাইফ্‌লে যতক্ষণ মেগাজিনের ভিতর কার্ত্তুস্ থাকবে, কেবল ঘোড়া টিপে গেলেই একটার পর একটা ফায়ার্ হয়ে যাবে। এতে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর সেকেণ্ডে একটা ক'রে ফায়ার্ বেশ চলে। আজকাল প্রায় সমস্ত যুদ্ধের রাইফল্‌ই এই রকমের। একে অটোমেটিক্ (automatic) রাইফল্ বলে। যুদ্ধে সাদানলী বন্দুকের ব্যবহার অনেক দিন উঠে গেছে।

সাদানলী আর রাইফল্ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। রাইফ্‌লে ছট্‌রা ব্যবহার করা যায় না। প্রত্যেক ফায়ারে কেবলমাত্র একটি বুলেট্ বা গুলী ছোড়া যায়। সুতরাং রাইফল্ দিয়ে পাখী শিকার—বিশেষতঃ উড়ন্ত পাখী শিকার চলে না। ফায়ার্ করার সময় সাদানলীর নলী-মুখ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি ছট্‌রা বেরিয়ে যত দূরে যায় তত ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে বেশী স্থান জুড়ে ছুটতে থাকে। এই ছত্রাকার স্থানের মধ্যে উড়ন্ত পাখী পড়লে তার গায়ে এক বা ততোধিক ছট্‌রা লাগবার খুব বেশী সম্ভাবনা। একটিমাত্র গুলী যেখানে ছোড়া হয়েছে সেখানে উড়ন্ত পাখীর মতো জীবের গায়ে ঐ গুলীটি লাগবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এই

কারণে পাখী শিকারে সাদানলী বন্দুকই ব্যবহার হয়, রাইফ্‌ল্‌ ব্যবহার হয় না।

সাদানলীতে একটিমাত্র বুলেট্‌ও ব্যবহার করা যায়। বড় জন্তু শিকারের জন্য ঐ রকম গুলী ব্যবহার হয়। কিন্তু সাদা-নলী বন্দুক রাইফ্‌লের মতো শক্তিশালী নয়। আমরা সাধারণতঃ যে সব সাদানলী ব্যবহার করি তার গুলী সত্তর আশী গজের বেশী দূরে শিকারের জন্তুর পক্ষে বড় একটা মারাত্মক হয় না। কিন্তু রাইফ্‌ল্‌ সাদানলীর চেয়ে অনেক গুণে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র। বড় জন্তু শিকারের জন্য তৈরী একটা সাধারণ রাইফ্‌ল্‌ দিয়ে পাঁচ ছয় শত গজ দূর থেকে বাঘ ভালুক সহজে মারা যায় যদি ঠিক মতো লাগাতে পারা যায়। একটা ভালো রাইফ্‌ল্‌ দিয়ে তার চেয়েও অনেক বেশী দূর থেকে মারতে পারা যায়, কিন্তু অতদূর থেকে চলন্ত জন্তুর উপর গুলী লাগান খুব কঠিন। আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে শিকারে দুইশত গজের বেশী দূর থেকে ফায়ার্‌ করা প্রায়ই আবশ্যক হয় না। অধিকাংশ শিকার একশত গজের ভিতরেই হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি বন্দুকের নলার ছিদ্রকে ইংরাজীতে বোর্‌ বলে। আমরা যে সাদানলী বন্দুক বেশী ব্যবহার করি তার বোরের নম্বর হচ্ছে ১২। এই নম্বর নিজে কোন মাপের পরিচায়ক নয়, কেবল বিশেষ বিশেষ মাপের বোর্‌কে বিশেষ বিশেষ নম্বর দিয়ে রাখা হয়েছে, যেমন ফুটবলের নম্বর। ১২ নম্বরের সাদানলীর বোরের ব্যাসের পরিমাণ বা ফাঁদ হচ্ছে এক ইঞ্চিকে চার ভাগ ক'রে তার তিন ভাগ নিলে যতটা হয় তার চেয়ে সামান্য একটু কম। কিন্তু রাইফ্‌লের বোরের কথা

যখন বলা হয়—তখন ঐ রকম মনগড়া নম্বর দিয়ে বলা হয় না। একেবারে বুঝে নেওয়া যায়, তার বোরের ফাঁদ এক ইঞ্চির কত অংশ। যেমন যদি কেউ বলে, "এটা পাঁচশ বোরের রাইফ্‌ল্‌," তখনই বুঝতে হবে তার বোরের ব্যাস এক ইঞ্চিকে এক হাজার ভাগ ক'রে তার পাঁচশত ভাগ নিলে যতটা হয় ঠিক ততটা,—অর্থাৎ আধ ইঞ্চি। সেই রকম "চারশত বোরের রাইফ্‌ল্‌" মানে তার বোরের ব্যাস ঠিক $\frac{৪০০}{১০০০}$ বা $\frac{২}{৫}$ ইঞ্চি।

১২ নম্বর সাদানলীর নলার দৈর্ঘ্য ও বোরের ব্যাস আজকাল শিকারে যে সব রাইফ্‌ল্‌ ব্যবহার হয় তার চেয়ে বড়, কিন্তু ঐরূপ সাদানলীর ওজন ঐসব রাইফ্‌লের চেয়ে কম। তার কারণ, কার্ত্তুস্‌ ফায়ার্‌ হওয়ার সময় যাতে বারুদের বিস্ফোরণের জোরে নলা ফেটে না যায় এরকম দৃঢ় ক'রে নলা তৈরী করতে যতটা ইস্পাতের দরকার হয়, তা সাদানলীর চেয়ে রাইফ্‌লে অনেক বেশী লাগে। আগেই বলেছি রাইফ্‌ল্‌ সাদানলীর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী অস্ত্র। আজকাল বড় জন্তু শিকারের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী (high velocity) রাইফ্‌ল্‌ সাধারণতঃ ৩৫০ থেকে ৫০০ বোরের মধ্যে হয়ে থাকে। ৪০০ বা ৪০৫ বোরের চেয়ে বেশী খুব কম লোকই ব্যবহার করে। তার চেয়ে বড় বোরের রাইফ্‌ল্‌ বিষম ভারী হয় আর তা ব্যবহার করতে খুব শক্তিমান হওয়া দরকার। অধিকাংশ জাতির যুদ্ধের রাইফ্‌লের বোর্‌ এর চেয়ে অনেক ছোট,—৩০০র কাছাকাছি। মানুষ মারতে বেশী বড় বোরের দরকার হয় না, আর কতক বিষয়ে, বিশেষতঃ বুলেটের বেগ বৃদ্ধি করতে এবং তাকে বেশী দূরে চালিত করতে, বড় বোরের চেয়ে ছোট বোরের রাইফ্‌ল্‌ বেশী উপযোগী।

সৈন্যদের মার্চ্ করবার সময় তাদের অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে বন্দুক বয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং যুদ্ধের সময় সর্ব্বদা এই বন্দুক সঙ্গে রাখতে হয় তা তোমরা জান। সেই কারণেই তাদের বন্দুক অত্যধিক ভারী হ'লে চলে না।

রাইফলের নলীর ছিদ্রের গায়ে স্ক্রুএর মতো যে খাঁজকাটা থাকে তাতে প্রধানতঃ কি কাজ হয় শোন। ফায়ার্ করার সঙ্গে সঙ্গে বুলেট্‌টি নলার মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে ঐ প্যাঁচকাটা খাঁজের সঙ্গে ঘর্ষণ পেয়ে মহাবেগে ঘুরতে ঘুরতে নলার মুখ থেকে বা'র হয়, এবং যতদূর যায় ঐ রকম ঘুরতে ঘুরতে সোজা লাইনে ছোটে। ঐ মহাবেগে ঘোরার ফলেই বুলেট্ বহুদূর পর্য্যন্ত আপনার সরল গতিপথ থেকে পাশাপাশিভাবে বিচ্যুত হয় না, কেবল যেতে যেতে পৃথিবীর আকর্ষণে ক্রমশঃ নেমে প'ড়ে মাটীতে আঘাত করে। কোন একটা জিনিষকে দূরে ছুড়ে দেবার সময় যদি তাকে লাট্টুর মত একটা ঘুর্ণিত গতি দেওয়া যায় তাহ'লে সেটা যে শূন্যে আপনার সরল গতিপথ হতে সহজে একপাশে বিচ্যুত হয় না এই ব্যাপারটা আমাদের দেশেও অজ্ঞাত ছিল না। কোল সাঁওতালদের লোহার ফলাযুক্ত তীরগুলির পশ্চাৎভাগে যে পালক দেওয়া থাকে সেগুলি অনেক সময় স্ক্রুএর মতো একটু প্যাঁচালভাবে বসান থাকে। তীর যখন ধনুক থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যপথে চালিত হয় তখন ঐভাবে বসান পালকগুলিতে বাতাসের চাপ প'ড়ে তীরটি ঘুরতে আরম্ভ করে আর সরল গতিতে ছোটে।

শিকারে মেগাজিন্ রাইফ্‌লের চেয়ে জোড়নলী রাইফ্‌ল্ বেশী উপযোগী, এ অনেক শিকারীর মত। তার কারণ এই যে শিকারের জন্তুর উপর থেকে লক্ষ্য না সরিয়ে জোড়নলী বন্দুকে

একটার পর একটা, এরূপ তুইটা ফায়ার্ করা যায়, কিন্তু মেগাজিন্ রাইফ্‌লে তা করা যায় না। মেগাজিন্ রাইফ্‌লে একটা ফায়ার্ করার পর হাত দিয়ে লিভারটি ঠেলতে বা টানতে হয় তা আগেই বলেছি। ঐ কাজটি করার সময় বন্দুকের লক্ষ্য যে শিকারের জন্তুর উপর থেকে স'রে যায় তা তোমরা সহজেই বুঝতে পার। মনে কর তুমি মাটিতে দাঁড়িয়ে একটা বাঘের উপর বন্দুক লক্ষ্য করেছ এবং বাঘও তোমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি একটি ফায়ার্ করলে—হয়ত সেটা বাঘের পক্ষে সাংঘাতিক হ'ল না। জোড়নলীতে তুমি নিমেষ না ফেলতে বাঘের উপর আরেকটি ফায়ার্ করতে পার কিন্তু মেগাজিনে তা পারবে না। তুমি যতক্ষণে হাত দিয়ে লিভারের কাজ শেষ ক'রে আবার বাঘের উপর লক্ষ্য করবে ততক্ষণে বাঘের তোমার উপর লাফ দেবার খুব সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য, অটোমেটিক্ রাইফ্‌লে হাত দিয়ে লিভার্ টানতে বা ঠেলতে হয় না, সুতরাং জোড়নলীর মতো তাতেও জন্তুর উপর হ'তে লক্ষ্য না সরিয়ে একটার পর একটা ফায়ার্ ক'রে যাওয়া চলে। কিন্তু বড় জন্তু শিকারের উপযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী বড় বোরের রাইফ্‌ল্ আজ পর্য্যন্ত অটোমেটিক্ হয় নি। ঐ রকম শক্তিশালী শিকার রাইফ্‌ল্‌কে অটোমেটিক ক'রে তৈরী করতে অনেক বাধা আছে, তা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, আর অটোমেটিক্ বন্দুক না দেখে তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।

বন্দুকের যে বারুদ এবং বুলেট্ ব্যবহার হয় সে সম্বন্ধে তু' একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সাদানলী আর রাইফ্‌ল্ তুয়েতেই কেবল কালো বারুদই ব্যবহার হ'ত। আজ-

কালও যে কালো বারুদ ব্যবহার হয় না, তা নয়। তবে ঐ বারুদের ব্যবহার এখন কমে গেছে। কালো বারুদের ধোঁয়া বেশী হয়। আজকাল সাদানলীতে বেশীর ভাগ স্মোক্‌লেস্ (Smoke-less) বা নির্ধুম বারুদ ব্যবহার হয়। এই বারুদে যে একেবারে ধোঁয়া হয় না, তা নয়, খুব কম ধোঁয়া হয়।

খুব বেশী শক্তিশালী (high velocity) রাইফ্‌লে কালো বারুদ ব্যবহার হয় না। তাতে যে বারুদ ব্যবহার হয় তাকে সাধারণতঃ কর্‌ডাইট্‌ (Cordite) অথবা য়্যাক্‌সাইট্‌ (Axite) বলে ; এই বারুদের বিস্ফোরণ শক্তি অত্যন্ত বেশী ব'লে যে সব রাইফ্‌লে এই বারুদ ব্যবহার হয় তার নলা কালো বারুদ ব্যবহারের উপযোগী রাইফ্‌লের নলার চেয়ে অনেক বেশী পুরু ইস্‌পাতের তৈরী, এবং সেই কারণে ভারীও বেশী। একটা ৪০০ বোরের কর্‌ডাইট্‌ রাইফ্‌ল্‌ একটা ৫০০ বোরের কালো বারুদ রাইফ্‌লের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। একটা ৪০০ বোরের ইংরাজী কর্‌ডাইট্‌ রাইফ্‌লের ক্ষমতা তোমরা এতেই বুঝতে পারবে যে ঐ রাইফ্‌লের বুলেট্‌ (যার ব্যাস আধ ইঞ্চিরও কম) যখন ফায়ার্‌ হয়ে নলার মুখ থেকে বা'র হয় তখন সেটা ৪০০০ ফুট পাউণ্ডের শক্তি বহন করে ;—অর্থাৎ একটা ৪০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫০ মণ লোহার তাল এক ফুট উঁচু থেকে যদি মাটিতে পড়ে, সেই লোহার তাল যতটা জোরে মাটিকে ধাক্কা দেয় এই ছোট বুলেট্‌টি নলা থেকে বেরিয়েই যে জিনিষ বা জন্তুকে আঘাত করবে তাকে তত বড় ধাক্কা দেবে। একটা বড় রয়্যাল্‌ টাইগার্‌ (Royel tiger) আক্রমণ করবার জন্য লাফ দিয়েছে আর তখন তার সম্মুখ দিক থেকে যদি ঐ গুলী তার শরীরে

আঘাত করে তাহ'লে তার লাফের অর্দ্ধপথেই বুলেটের বিষম ধাক্কায় লাফ থেমে যাবে এবং সে মাটিতে প'ড়ে যাবে।

রাইফ্‌লের বুলেট্‌ সাধারণতঃ দুই রকমের হয়। একরকম যার অগ্রভাগ নরম সীসার তৈরী, আর একরকম যার সমস্তটাই নিকেল্‌ বা ঐরকম কঠিন ধাতুর পাত দিয়ে ঢাকা। যে সব জন্তুর চামড়া বেশ নরম আর যাদের আকার অত্যন্ত বৃহৎ নয় সেই সব জন্তুর উপর নরম বুলেট্‌ ব্যবহার হয়। ঐ বুলেট্‌ চামড়া এবং তার নীচের মাংস ভেদ ক'রে জন্তুর মর্ম্মস্থানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বুলেটের নরম অগ্রভাগ ব্যাঙের ছাতার মতো চ্যাপ্‌টা ও বড় হয়ে অথবা খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে মর্ম্মস্থান একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দেয় এবং অতি শীঘ্র মৃত্যু ঘটায়। বাঘের চামড়া নরম, সেইজন্য বাঘের উপর সর্ব্বদা এইরকম বুলেট্‌ ব্যবহার হয়। ভালুকের চামড়া বাঘের মতো অত নরম না হ'লেও খুব বেশী শক্ত নয়, আর আকারেও ভালুক খুব বড় নয়, সুতরাং ভালুক শিকারেও এই বুলেট্‌ই ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট জন্তুর পক্ষে এই বুলেট্‌ উপযোগী। কিন্তু হাতী বা গণ্ডারের পক্ষে এই বুলেট্‌ উপযোগী নয়। এই সব জন্তুর চামড়া অত্যন্ত দৃঢ় এবং তারা আকারেও অত্যন্ত বৃহৎ। তাদের চামড়া এবং মাংসরাশি ভেদ ক'রে যেতে যেতে যে বুলেট্‌ চ্যাপ্‌টা বা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে সে বুলেট্‌ তাদের মর্ম্মস্থানে পৌঁছুতেই পারবে না এবং শীঘ্র মারাত্মকও হবে না। এই জন্য ঐসব জন্তুর উপর কঠিন নিকেলের আবরণ দেওয়া বুলেট্‌ ব্যবহার হয়, যা অত্যন্ত পুরু চামড়া এবং বিপুল মাংসপেশী অথবা হাড়ের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে মর্ম্মস্থানে পৌঁছুতে পারে। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, মেরুদণ্ডের ভিতরের

অংশ, মস্তিষ্ক—এইগুলিকে মর্ম্মস্থান বলা যেতে পারে। পাক-স্থলী, অন্ত্র ইত্যাদিও গুলীর দ্বারা ছিন্ন হ'লে মৃত্যু ঘটে কিন্তু ঐরূপ আঘাতে খুব শীঘ্র মৃত্যু হয় না, শিকারের জন্তু অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এবং অনেকদূর পালাতে পারে।

রাইফ্‌লের বুলেট্ ঠিক গোল নয়, লম্বাটে, আর অনেক সময় তার অগ্রভাগ কতকটা ছুঁচলো হয়; লেড্ পেন্‌সিলের কাটা অগ্রভাগ ঢেকে রাখবার জন্য যে রকম একটা ধাতুর আবরণ ব্যবহার করা হয় প্রায় সেই রকম আকৃতির। সাদানলীর বুলেট্ সাধারণতঃ গোলাকারই হয়। অন্য রকমেরও আছে। কিন্তু আমি যতদূর দেখেছি তাতে আমার মনে হয় গোল বুলেট্ই সাদানলীর পক্ষে বেশী উপযোগী। সাদানলীরও কয়েক রকম বুলেট্ এমনভাবে তৈরী আছে যাতে শিকারের জন্তুর মর্ম্মস্থানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে ভিতরটা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

বন্দুকের লক্ষ্য বা নিশানা করবার কয়েকটা কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ কর্‌ব। তোমরা দেখে থাকবে যে যদি একটা বল্ বা ঢিল নিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ছুড়ে দাও তা খুব জোরে ছুড়লেও এই বল্ বা ঢিল বেশী দূর যেতে না যেতে ক্রমশঃ নেমে প'ড়ে মাটিতে আঘাত করে। কিন্তু যদি সেটাকে ঠিক সমান্তরালভাবে না ছুড়ে ঐরকম জোরেই একটু উপর দিকে ছুড়ে দাও তাহ'লে সেটা আরও অনেকটা বেশীদূর শূন্য পথে গিয়ে তার পরে মাটিতে পড়বে। কে কত বেশীদূর বল্ ছুড়তে পারে তার প্রতিযোগিতায় তোমরা কি মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বল্ ছোড়,—না একটু উপর দিকে ছোড়? সেই রকম আর

কি। বন্দুকের বুলেট্‌কেও বেশীদূরে অবস্থিত লক্ষ্যের উপর চালিত করতে হ'লে তাই করতে হয়, অর্থাৎ বন্দুকের নলার মুখটি সর্ব্বদা লক্ষ্যের উপর রাখতে হবে, অথচ যত বেশী বেশী দূর থেকে নিশানা করবে বন্দুক এমনভাবে ধরতে হবে যাতে নলার মুখ লক্ষ্যের উপর হতে না সরিয়ে নলাটাকে লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে বেশী বেশী ঊর্দ্ধমুখী ক'রে ধরা হয়, যার ফলে বুলেট্‌টি লক্ষ্যতে পৌঁছুবার আগে নেমে প'ড়ে মাটিতে আঘাত না করে, বা লক্ষ্যের নীচে দিয়ে বেরিয়ে না যায়। আমি একটি ছবি দিয়ে জিনিষটা একটু বোঝাতে চেষ্টা করব, তোমরা ১ নম্বর ছবি দেখ।
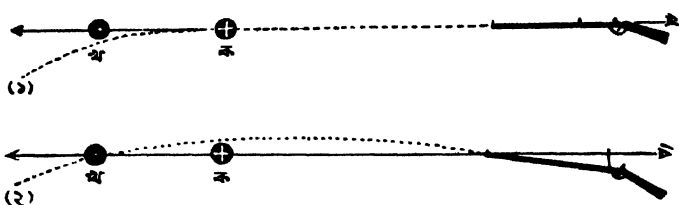
মনে কর একটা বড় সমতল ক্ষেত্রের উপর তুমি রাইফ্‌ল্ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছ। তোমার সম্মুখে 'ক' আর 'খ' দুইটা ছোট লক্ষ্যের জিনিষ রয়েছে এবং দুইটারই মাটি থেকে উচ্চতা দুই ফুট্। 'ক' তোমা হ'তে ২০০ গজ দূরে আর 'খ' ৪০০ শত গজ দূরে আছে, এবং 'ক' ও 'খ' দুইটাই তোমার চোখের সঙ্গে এক লাইনে আছে, অর্থাৎ তুমি যখন 'ক'কে লক্ষ্য করছ তখন 'খ'ও তোমার লক্ষ্যের লাইনের মধ্যে এসে পড়েছে। তুমি 'ক'কে লক্ষ্য ক'রে ফায়ার্ করলে এবং বুলেট্ গিয়ে 'ক'তে ঠিক লাগল। এখন যদি 'ক'কে ঐস্থান হ'তে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তোমার রাইফ্‌ল্

‘ক’কে লক্ষ্য করবার সময় যেমনভাবে ধরেছিলে ঠিক সেইভাবে রেখে ফায়ার্ কর, তা’হলে যদিও এখনও ‘খ’ সোজা তোমার লক্ষ্যের লাইনের ভিতর রয়ে গেছে তবুও ‘খ’তে বুলেট্‌টী আঘাত করবে না, কারণ ৪০০ গজ যেতে যেতে বুলেট্ পৃথিবীর আকর্ষণে তার সরল গতিপথ থেকে মাটির দিকে কতকটা নেমে পড়বে। (১) নম্বর ডটেড্ লাইনে বুলেটের এই গতিপথ দেখান হয়েছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে যদি এই প্যারাগ্রাফ্‌টি পড়, তা হ’লে সহজে বুঝতে পারবে।

কিন্তু তুমি যদি ‘খ’কে লক্ষ্য করবার সময় রাইফ্‌ল্‌কে ঠিক আগের মতো না রেখে তার নলাকে একটু ঊর্দ্ধমুখী ক’রে ধ’রে লক্ষ্য স্থির কর তাহ’লে বুলেট্ নলামুখ থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটু ঊর্দ্ধগামী হয়ে তারপরে নেমে পড়তে পড়তে ‘খ’তে ঠিক আঘাত করবে। (২) নম্বর ডটেড্ লাইনে এই বুলেটের গতিপথ দেখান হয়েছে। উপরে যা বললাম তার মানে যেন বুঝনা যে নলার মুখটা তোমার লক্ষ্যের লাইন থেকে উচু ক’রে ধরতে হয়, বা লক্ষ্যের জিনিষকে ছাড়িয়ে তার খানিকটা ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করতে হয়। লক্ষ্যের লাইন হচ্ছে তোমার চোখ আর লক্ষ্যের জিনিষকে যে সরল রেখা স্পর্শ ক’রে যায় সেইটা। ছবিতে একটা তীরের ফলা দিয়ে এই সরল রেখাকে দেখান হয়েছে। বন্দুকে লক্ষ্য করতে হ’লে নলার মুখ এই লাইন ছেড়ে কখনও উপরে উঠবে না, বা নামবে না, সর্ব্বদা স্পর্শ ক’রে থাকবে। কেবল লক্ষ্যের দূরত্ব যত বেশী হবে নলার পিছনদিকটা ঐ লাইন থেকে বেশী বেশী নীচের দিকে নেমে পড়বে,—যার ফলে নলার মুখ লক্ষ্যের লাইনে স্থির থাকলেও নলা কতকটা ঊর্দ্ধমুখী হবে।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার,—"রাইফ্‌লের নলাটা লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা উর্দ্ধমুখী করতে হয় তা কি করে জানব?" তার উত্তর এই ;—নলার মুখ লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা উর্দ্ধমুখী ক'রে ধরতে হবে তার নির্দ্দেশের উপায় বা যন্ত্র নলার উপরিভাগে তার গায়েই দেওয়া থাকে। নলার মুখের ঠিক উপরেই একটি ছোট ফোর্‌সাইট্ (Foresight) বা মাছি বসান থাকে। এই ফোর্‌সাইট্ নলার গায়ে দৃঢ়-সংলগ্ন, এর নড়ন চড়ন নাই। নলার একেবারে পিছনদিকে ব্যাক্‌সাইট্ (Back sight) বা নিশানা করবার জন্য ইস্‌পাতের ছোট পাত বসান থাকে এবং ঐ পাতের ঠিক মাঝখানে একটা খাঁজ কাটা থাকে। লক্ষ্যকারীর চোখের সঙ্গে লক্ষ্যের জিনিষ, ফোর্‌সাইট্ আর ব্যাক্‌সাইটের খাঁজ এক লাইনে আসলে তবে লক্ষ্য স্থির হয়। রাইফ্‌লের ব্যাক্‌সাইট্ একটা থাকে না, ঐরকম কতক-গুলি একটার পর একটা বসান থাকে। ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি নলার দেহ হতে সমান উঁচু নয়। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যাক্‌সাইট্ তাদের উচ্চতা অনুসারে পর পর সাজান থাকে, ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের জন্য ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যক্‌সাইট্ ব্যবহার করতে হয়। ব্যাক্‌সাইট্‌গুলির গায়েই ঐ সব দূরত্বের নির্দ্দেশক সংখ্যা মুদ্রিত করা থাকে,—যেমন ১০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য যে ব্যক্‌সাইট্ ব্যবহার করবে তাতে ১ লেখা থাকবে, ২০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য ২, ৩০০ গজের জন্য ৩, এই রকম। লক্ষ্য যত বেশী বেশী দূরে থাকবে তত বেশী বেশী উঁচু ব্যাক্‌-সাইট্ ব্যবহার করতে হয়। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, যত বেশী উঁচু ব্যাক্‌সাইট্ ব্যবহার

করা হবে নলার পিছনদিক মাটির দিকে নেমে প'ড়ে নলাকে তত বেশী ঊর্দ্ধমুখী ক'রে দেবে। এই সমস্ত ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি নলার উপর কব্জার দ্বারা সংলগ্ন থাকে যার ফলে কোন জিনিষের উপর রাইফ্‌ল্‌ লক্ষ্য করতে হ'লে সেই জিনিষের দূরত্বের উপযোগী ব্যাক্‌সাইট্‌কে তুলে কব্জার উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এবং পরে তাকে আবার নলার গায়ে শুইয়ে দেওয়া যায়। পরের ছবিতে জোড়নলী বন্দুকের নলার উপরিভাগে সাজান পর পর চারটা ব্যাক্‌সাইট্‌ দেখান হয়েছে।

এই ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি প্রত্যেক রাইফ্‌ল্‌ পরীক্ষা ক'রে বসান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে স্থিরভাবে অবস্থিত লক্ষ্যের উপর ফায়ার্‌ ক'রে দেখে ঠিক করা হয় যে ঐসব দূরত্বে লক্ষ্য ভেদ করতে হ'লে কতটা কতটা উচু ব্যাক্‌সাইট্‌ দিতে হবে। যদি বন্দুক আর কার্ত্তুস্‌ ঠিক এক ছাঁচে এক রকম ক'রে তৈরী করা হয় তাহ'লে একবার ভালো রকম পরীক্ষা ক'রে ব্যাক্‌সাইট্‌ তৈরী করলে ঐ মাপের ব্যাক্‌সাইট্‌ ঠিক ঐ একই ভাবে তৈরী সব বন্দুকেই ব্যবহার করা যায়, প্রত্যেক বন্দুকের জন্য নূতন পরীক্ষা ক'রে ব্যাক্‌সাইট্‌ তৈরী করবার দরকার হয় না। আজকাল প্রত্যেক বড় জাতিকেই লক্ষ লক্ষ যুদ্ধের রাইফ্‌ল্‌ নির্ম্মাণ করতে হয়। এই লক্ষ লক্ষ রাইফ্‌লের প্রত্যেকটির জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্‌সাইট্‌ নির্ম্মাণ করতে হয়, তাহ'লে ব্যাপার কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমান করতে পার। প্রত্যেক জাতির যুদ্ধের রাইফ্‌ল্‌ এক মাপের তৈরী, আর সেগুলির জন্য কার্ত্তুস্‌ও যতটা সম্ভব একভাবে নির্ম্মাণ করা হয়, অর্থাৎ তার বারুদের প্রকার ও পরিমাণ, বুলেটের গঠন ও ওজন, সব এক।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার,—“রাইফ্‌লের নলাটা লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা উর্দ্ধমুখী করতে হয় তা কি করে জানব?” তার উত্তর এই;—নলার মুখ লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা উর্দ্ধমুখী ক'রে ধরতে হবে তার নির্দ্দেশের উপায় বা যন্ত্র নলার উপরিভাগে তার গায়েই দেওয়া থাকে। নলার মুখের ঠিক উপরেই একটি ছোট ফোর্‌সাইট্‌ (Foresight) বা মাছি বসান থাকে। এই ফোর্‌সাইট্‌ নলার গায়ে দৃঢ়-সংলগ্ন, এর নড়ন চড়ন নাই। নলার একেবারে পিছনদিকে ব্যাক্‌সাইট্‌ (Back sight) বা নিশানা করবার জন্য ইস্‌পাতের ছোট পাত বসান থাকে এবং ঐ পাতের ঠিক মাঝখানে একটা খাঁজ কাটা থাকে। লক্ষ্যকারীর চোখের সঙ্গে লক্ষ্যের জিনিষ, ফোর্‌সাইট্‌ আর ব্যাক্‌সাইটের খাঁজ এক লাইনে আসলে তবে লক্ষ্য স্থির হয়। রাইফ্‌লের ব্যাক্‌সাইট্‌ একটা থাকে না, ঐরকম কতকগুলি একটার পর একটা বসান থাকে। ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি নলার দেহ হতে সমান উচু নয়। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যাক্‌সাইট্‌ তাদের উচ্চতা অনুসারে পর পর সাজান থাকে, ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের জন্য ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যক্‌সাইট্‌ ব্যবহার করতে হয়। ব্যাক্‌সাইট্‌গুলির গায়েই ঐ সব দূরত্বের নির্দ্দেশক সংখ্যা মুদ্রিত করা থাকে,—যেমন ১০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য যে ব্যক্‌সাইট্‌ ব্যবহার করবে তাতে ১ লেখা থাকবে, ২০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য ২, ৩০০ গজের জন্য ৩, এই রকম। লক্ষ্য যত বেশী বেশী দূরে থাকবে তত বেশী বেশী উচু ব্যাক্‌সাইট্‌ ব্যবহার করতে হয়। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, যত বেশী উচু ব্যাক্‌সাইট্‌ ব্যবহার

করা হবে নলার পিছনদিক মাটির দিকে নেমে প'ড়ে নলাকে তত বেশী উর্দ্ধমুখী ক'রে দেবে। এই সমস্ত ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি নলার উপর কব্জার দ্বারা সংলগ্ন থাকে যার ফলে কোন জিনিষের উপর রাইফ্‌ল্‌ লক্ষ্য করতে হ'লে সেই জিনিষের দূরত্বের উপযোগী ব্যাক্‌সাইট্‌কে তুলে কব্জার উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এবং পরে তাকে আবার নলার গায়ে শুইয়ে দেওয়া যায়। পরের ছবিতে জোড়নলী বন্দুকের নলার উপরিভাগে সাজান পর পর চারটা ব্যাক্‌সাইট্‌ দেখান হয়েছে।

এই ব্যাক্‌সাইট্‌গুলি প্রত্যেক রাইফ্‌ল্‌ পরীক্ষা ক'রে বসান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে স্থিরভাবে অবস্থিত লক্ষ্যের উপর ফায়ার্‌ ক'রে দেখে ঠিক করা হয় যে ঐসব দূরত্বে লক্ষ্য ভেদ করতে হ'লে কতটা কতটা উচু ব্যাক্‌সাইট্‌ দিতে হবে। যদি বন্দুক আর কার্ত্তুস্‌ ঠিক এক ছাঁচে এক রকম ক'রে তৈরী করা হয় তাহ'লে একবার ভালো রকম পরীক্ষা ক'রে ব্যাক্‌সাইট্‌ তৈরী করলে ঐ মাপের ব্যাক্‌সাইট্‌ ঠিক ঐ একই ভাবে তৈরী সব বন্দুকেই ব্যবহার করা যায়, প্রত্যেক বন্দুকের জন্য নূতন পরীক্ষা ক'রে ব্যাক্‌সাইট্‌ তৈরী করবার দরকার হয় না। আজকাল প্রত্যেক বড় জাতিকেই লক্ষ লক্ষ যুদ্ধের রাইফ্‌ল্‌ নির্ম্মাণ করতে হয়। এই লক্ষ লক্ষ রাইফ্‌লের প্রত্যেকটির জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্‌সাইট্‌ নির্ম্মাণ করতে হয়, তাহ'লে ব্যাপার কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমান করতে পার। প্রত্যেক জাতির যুদ্ধের রাইফ্‌ল্‌ এক মাপের তৈরী, আর সেগুলির জন্য কার্ত্তুস্‌ও যতটা সম্ভব একভাবে নির্ম্মাণ করা হয়, অর্থাৎ তার বারুদের প্রকার ও পরিমাণ, বুলেটের গঠন ও ওজন, সব এক।

অনেক রাইফ্‌লে ব্যাক্‌সাইটের জন্য কতকগুলি ভিন্ন পাত না থেকে একটি মাত্র খাঁজকাটা পাত থাকে, এবং এরূপ একটা বন্দোবস্ত থাকে যাতে পাতটিকে অপর একটা অপেক্ষাকৃত লম্বা, ফুট্‌রুলের মতো দাগ কেটে ভাগ করা, অপরিসর ইস্পাতের ফলকের গায়ে লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে ইচ্ছামত উঁচুতে তুলে দেওয়া বা নীচেতে নামিয়ে দেওয়া যায়। দাগগুলোর মুখে দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যা লেখা থাকে,—যেমন ১০০, ২০০, থেকে আরম্ভ ক'রে ১০০০, ১২০০ পর্য্যন্ত। ফলকটী নলার গায়ে একটা কব্জা দিয়ে আঁটা থাকে, যাতে রাইফ্‌ল্ যখন ব্যবহার করা না হয়, তখন ফলকটাকে নলার গায়ে শুইয়ে রাখতে পারা যায় এবং ব্যবহার করার সময় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। সে সব রাইফ্‌লে (যেমন যুদ্ধের রাইফ্‌ল্) অনেক দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করার বন্দোবস্ত রাখতে হয় তাতে এই রকম ব্যাক্‌সাইট্‌ই ব্যবহার হয় কারণ তা না হ'লে নলার গায়ে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পাত দিতে হয়। শিকারের জন্য বড়-বোর্ রাইফ্‌লে সচরাচর ৫০০ গজের উপরে নিশানা করবার বন্দোবস্ত থাকে না। এমন রাইফ্‌ল্‌ও আছে যার বুলেটের গতিবেগ এত বেশী যে প্রথম ২।৩ শত গজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্‌সাইটের দরকার হয় না, অর্থাৎ ঐ দূরত্ব পর্য্যন্ত বুলেট্ মাটির দিকে নামতে সুরু করে না। এই রাইফ্‌ল্‌গুলি ছোট বোরের বেশী শক্তিশালী রাইফ্‌ল্, এবং তার বুলেটের ওজনও বেশী নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি যা শুনলে তোমরা হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। মনে কর তুমি ৮০০ গজ দূরের

একটা জিনিষকে রাইফল্ দ্বারা লক্ষ্য করছ। লক্ষ্য স্থির ক'রে যে মুহূর্তে ফায়ার্ করতে যাচ্ছ ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মানুষ হঠাৎ তোমা হতে ৪০০ গজ দূরে তোমার লক্ষ্যের লাইনে এসে দাঁড়াল এবং তার মাথাটা তোমার লক্ষ্যের জিনিষকে আড়াল ক'রে ঢেকে দিল, আর তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার্ করলে। সেই লোকটার তখন কি হবে বলতে পার? তোমাদের অনেকেই হয়ত বলবে যে রাইফ্‌লের বুলেট্ লোকটির মাথা ভেদ ক'রে যাবে। আমি কিন্তু বলি যে লোকটির কিছু হবে না। সে অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বুলেট্‌টা তার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে লক্ষ্যের জিনিষে লাগবে। রাইফ্‌লের বাক্‌সাইট্ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বললাম তা একটু ভালো ক'রে ভেবে দেখলেই এটা বুঝতে পারবে। তুমি সোজা লক্ষ্য করছ বটে, কারণ তোমার দৃষ্টি ধনুকের ছিলার মতো সোজা পথেই যায়—ধনুকের বাঁশের মতো বাঁকা পথে যায় না, কিন্তু তুমি ৮০০ গজের জন্য ব্যাক্‌সাইট্ ব্যবহার করায় তোমার রাইফ্‌লের বুলেট্ তখন কতকটা ধনুকের বাঁশের মতো বাঁকা পথ অবলম্বন ক'রে লক্ষ্যের জিনিষে গিয়ে পৌঁছুবে, এবং সেইজন্য তোমার লক্ষ্যের লাইনের অর্দ্ধপথে অবস্থিত মানুষের মুণ্ডকে আঘাত না ক'রে তার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু হাতের কাছে রাইফল্ পেলে এটা ক'রে দেখতে যেয়ো না যেন। ভালো ক'রে রাইফ্‌লের ব্যবহার শিক্ষা না ক'রে তা নিয়ে খেলা করা ভয়ানক বিপদ্‌জনক।

যুদ্ধের কামানের নলাও 'রাইফল্' করা, অর্থাৎ তার ছিদ্রের ভিতরটাতে আগা গোড়া স্ক্রুয়ের মত প্যাঁচালো খাঁজ

কাটা। ঐ কামানের ব্যবহার প্রণালীও ঐরূপ, অর্থাৎ যত বেশী বেশী দূরে লক্ষ্য করতে হবে, কামানের মুখ তত উঁচু ক'রে ধরতে হবে। একাজ হাতে ক'রে করা যায় না, কামানের সঙ্গেই এই কাজের জন্য যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। আমার ইচ্ছা হয় এখনকার কামানগুলোর দুর্দ্ধর্ষ শক্তি, কামান ব্যবহার করবার কি ভয়ানক খরচ ইত্যাদির বিষয় তোমাদের কিছু কিছু বলি, কিন্তু সে সব কথা বলতে গেলে বড়ই পুথি বেড়ে যাবে।

ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে লক্ষ্য করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্‌সাইট্‌ দিয়ে রাইফ্‌লে লক্ষ্যকারীর কাজ সহজ ক'রে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা ছাড়াও তার নিজের করণীয় বিশেষ কিছু বাকী থেকে যায়, এবং সেটা হচ্ছে লক্ষ্যের জিনিষের দূরত্ব অনুমান ক'রে নেওয়া। তুমি শিকার করতে গিয়ে তোমা হতে জন্তুর দূরত্ব মেপে নিয়ে ত আর লক্ষ্য করতে পার না। তোমাকে এই দূরত্ব অনুমান ক'রে নিতে হবে আর সেই অনুযায়ী ব্যাক্‌সাইট্‌ ব্যবহার করতে হবে। এই দূরত্ব অনুমান কাজটা সহজ নয়, রীতিমত অভ্যাস সাপেক্ষ। তোমরা দূরত্ব অনুমানের চেষ্টা ক'রে দেখলেই তা বুঝতে পারবে। দূরত্ব যত বেশী হবে অনুমানে তত বেশী বেশী ভুল করবে।

রাইফ্‌লে খুব দূরে লক্ষ্য ভেদ করতে হ'লে লক্ষ্যকারীর শরীর ও মন সবল এবং স্নায়ু দৃঢ় হওয়া চাই। কারণ লক্ষ্য স্থির ক'রে ফায়ার্‌ করবার সময় এক চুল এদিক ওদিক হ'লে দূরের লক্ষ্যে গুলী লাগবে না, লক্ষ্য থেকে অনেকটা ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। এইজন্য যারা রাইফ্‌লে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তাদের অনেক দিন, অনেক মাস ধ'রে শরীর

ও মনের সংযম শিক্ষা করতে হয়। মন নিরুদ্বেগ আর স্নায়ু ইস্পাতের মতো দৃঢ় হওয়া চাই। তারা সর্ব্ব প্রকার মাদকদ্রব্য এমন কি তামাক পর্য্যন্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে এই সাধনায় রত হয়।

কোন কোন সাদানলী বন্দুকেও ৫০ এবং ৭৫ গজের ব্যাক্‌সাইট্ দেওয়া থাকে। আমার কিন্তু মনে হয় এই বন্দুকে ওরকম ব্যাক্‌সাইটের বিশেষ দরকার হয় না। আগেই বলেছি এই বন্দুকের দৌড় বা পাল্লা বেশী দূর নয়। কোন একটা বন্দুক কিছুদিন ব্যবহার করতে করতেই বুঝা যায় ৬০, ৭০, ৮০ গজ দূর থেকে বুলেট্ দিয়ে মারতে হ'লে ঠিক লক্ষ্য স্থানের কতটুকু ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করলে ভালো হয়। বেশী দামের উৎকৃষ্ট সাদানলী বন্দুকে ব্যাক্‌সাইট্ একেবারেই দেওয়া হয় না। এই বন্দুক যত বেশী উৎকৃষ্ট হয় তত বেশী হালকা হয়।

শিকারের প্রধান অস্ত্র বন্দুক সম্বন্ধে কয়েকটা অত্যন্ত মোটা কথা তোমাদের বললাম। আরো অনেক কথা বলবার রইল। কিন্তু সে সব বলতে গেলে তোমাদের ধৈর্য্য থাকবে না। আর সে সব কথা বোঝাতে হ'লে বন্দুক এবং তার ব্যবহার হাতে কলমে দেখিয়ে দিলে সহজে এবং শীঘ্র বোঝান যায়, শুধু মুখে ব'লে বা লিখে সহজে বোঝান যায় না। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে শীঘ্র এমন দিন আসছে যখন তোমাদের সকলকেই স্বদেশ রক্ষার জন্য বন্দুক ধরতে হবে এবং আরো অনেক যুদ্ধের উপায় শিক্ষা করতে হবে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই তোমাদের আহ্বান করবেন। আমি কামনা করি সেদিন

শীঘ্র আসুক ; আমরা চিরদিন এখনকার মতো নিবীর্য্য ও অসহায় হয়ে থাকব এ চিন্তা কষ্টকর। *

কোল, সাওতাল, ভূমিজ ইত্যাদি ভারতবর্ষের কতকগুলি অনার্য্যজাতির মধ্যে শিকারের জন্য পুরাকালের তীরধনুকের ব্যবহার এখনো প্রচলিত আছে। তাদের তীক্ষ্ণ লোহার ফলাযুক্ত তীর ৩০।৪০ গজ দূর থেকে বেশ কার্য্যকরী, বাঘ ভালুক মারা বেশ চলে। ঐ সম্বন্ধে দু'একটা গল্প যথাস্থানে বলব।

* বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে এটা লেখা হ'য়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইবার শিকার সাধারণতঃ কত রকমে করা হয় অর্থাৎ শিকারের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয় তা মোটামুটি বলতে চেষ্টা করব। এর সঙ্গে জঙ্গলের জানোয়ারের স্বভাব এবং চালচলন ও শিকারে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তাও কিছু কিছু বলব।

বন্য জন্তু শিকার করতে হলে বনেই যেতে হয় একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বনে গেলেই কি এদের দেখতে পাওয়া যায়? বন ত ছোট জায়গা নয় যে সেখানে গিয়ে কোন একটা স্থানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেই তার সবটা দেখে নেবে, আর সেই সঙ্গে সেই বনের জন্তুগুলোকেও দেখে ফেলবে। ছোট ছোট বনে বন্য জন্তু, বিশেষতঃ বড় বন্য জন্তু, প্রায়ই থাকে না। বড় জন্তু শিকার করতে হলে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, যেখানে লোক সমাগম কম হয়, সেইরকম বনই প্রশস্ত। সহজেই বুঝতে পার যে সেরূপ বনে শিকারের জন্তু খুঁজে বা'র করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। তোমরা শুনে থাক যে অমুক বনে (যেমন সুন্দর বনে) অনেক বাঘ আর হরিণ আছে, কিন্তু ঐরকম বন একটা গ্রাম বা একটা সহরের মতো ছোট জায়গা নয়, তার চেয়ে অনেক বড় জায়গা সে সব। আর জন্তুরা ত মানুষের মতো এক জায়গায় ঘর বসতি ক'রে বাস করে না যে একটা কারও সন্ধান পেলে এবং সে কোথায় থাকে কোনমতে জেনে নিতে পারলে ঐ সঙ্গে

আরো অনেকগুলির সন্ধান পাবে। ওরকম জঙ্গলে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালেও অনেক সময় শিকারের সন্ধান পাবে না।

তা হ'লেই বুঝতে পারছ যে তোমাকে এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে তুমি সহজে শিকারের জন্তুর কাছে পৌঁছুতে পার বা তুমি জঙ্গলে একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকলেও সে তোমার কাছে আসতে বাধ্য হয়। "বাধ্য হয়" বলছি এইজন্য যে কতকটা জোর ক'রে ভয় দেখিয়েই তাকে আনা হয়।

তোমরা অনেকে কোন বড় পুষ্করিণীতে বেড়াজাল দিয়ে মাছ ধরা দেখেছ,—এই 'বাধ্য করার' ব্যাপারটা সেই রকমের। পুষ্করিণীর একটা দিকে বেড়া জালকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে দিয়ে জালটাকে সেইভাবে টানতে টানতে পুষ্করিণীর অপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তার ফলে পুষ্করিণীর বড় মাছগুলি জালের আগে আগে চলতে থাকে। জালটা এগিয়ে আসতে আসতে যখন তার সম্মুখের জলভাগ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তখন মাছগুলো ভয় পেয়ে কি রকম লাফাতে থাকে তা দেখেছ। সম্মুখে আর পালাবার পথ না পেয়ে মাছগুলো তখন জালভেদ ক'রে পালাতে চেষ্টা করে এবং জালে আবদ্ধ হয়। জঙ্গলের জন্তুদেরও কতকটা ঐ রকম উপায়ে শিকারীর কাছে তাড়িয়ে আনা হয়। একে চলতি কথায় জঙ্গল "পিটা" বা জঙ্গল "ঝাড়া" বলে। এর ইংরাজী কথা "বিট্" (Beat) করা। এই শিকারের আর এক নাম হচ্ছে "বেড় শিকার"। জঙ্গল ঝাড়া জিনিষটা এইরূপ :—

জঙ্গলের কোন একটা স্থান শিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে শিকারী মাটিতে দাঁড়াবে বা গাছের উপর মাচান ক'রে বসবে। এই স্থান থেকে অনেকটা দূরে একদল লোক ঐ জঙ্গলের এক অংশে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। লাইনটা হবে বেশ বড় আর কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, জেলেরা যেমন বেড়াজাল ছড়িয়ে দেয়। ঐ লাইনের বাঁকানো মুখ তুটো থাকবে শিকারীর দিকে আর যারা লাইন ধ'রে দাঁড়াবে তারা সকলেই শিকারীর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াবে। আমি যেখানে বেশীর ভাগ শিকার করেছি বা দেখেছি সেখানে এই লাইনকে "পন্তা" (পাঁতি ?) বলে এবং লাইন ধ'রে দাঁড়ানকে "পন্তা ধরা" বলে। আমিও তাই বলব এবং লাইনের লোকদের পন্তার লোক বা বিটার্ (Beater) বলব। বিটার্দের সঙ্গে তীর ধনুক টাঙ্গি কুড়ুল লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র, আর নাগরা কাঁসর করতাল ইত্যাদি বাজনা থাকে। শিকারী তার নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবার পর একটা সঙ্কেত করা হয়; তখন বিটার্রা বাজনা বাজাতে বাজাতে আর চীৎকার এবং গাছে লাঠি মেরে খট্খট্ শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে, যার ফলে ঐ জালের মত পন্তার লাইনটি শিকারীর দিকে এগুতে থাকে। এতে বনের ঐ অংশের জন্তুগুলি তাড়া পেয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে শিকারী যেদিকে আছে সেই দিকে চলতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ বেশী ভয় পেয়ে ঐদিকে দৌড়ুতে থাকে। ফলে ঐ জন্তুর কতকগুলি শিকারীর দৃষ্টিপথে এসে পড়ে এবং শিকারী তাদের উপর গুলী চালাবার সুবিধা পায়।

তোমরা ভেব না যে, যে কোন বড় জঙ্গলে এই রকম বেড়

শিকার করলেই শিকার পাওয়া যায়। কোন জঙ্গল বা জঙ্গলের কোন অংশ ঝাড়তে হবে তা বেছে নিতে হয় এবং বেছে নিতে হ'লে অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় লোক, যারা জঙ্গলে কাঠ আনতে বা অন্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে, তাদের সাহায্য নিতে হয়। এই সকল লোকের জানা থাকে যে কোন জঙ্গলে জন্তু বেশী দেখা যায়। জঙ্গলের কোন দিকে ঝাড়তে হবে এবং শিকারী কোথায় বসবে এ সবও প্রায়ই তারাই স্থির ক'রে দেয়। আমরা ভদ্র লোকেরা এই সব লোকদের 'ছোট লোক' ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাকি, কিন্তু তাদের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা, তাদের অভিজ্ঞতা, জঙ্গলের ভিতর নানা রকম চিহ্ন দেখে জানোয়ারেব অবস্থান বা গতিবিধি স্থির করবার ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। আমার শিকার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমি কখন কখন তাদের কথার উপর বেশী আস্থা না রেখে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জঙ্গল বিট্ করাতাম, আর নিজের বসবার স্থান ঠিক ক'রে নিতাম, এবং এই সব শিকারে প্রায়ই কিছু পেতাম না। কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর আমি আর এই সব লোকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতাম না এবং তাতে খুব ভালো ফল পেতাম। একবারকার কথা আমার বেশ মনে আছে। জঙ্গলটায় অনেক ভালুক থাকে লোকেরা বলল। ঝাড়াবার বন্দোবস্ত ক'রে আমি (শিকারী) নিজের স্থান ঠিক ক'রে নেবার সময় তারা আমাকে একটা ছোট পাহাড়ের ঠিক নীচেই বসতে বলল। কিন্তু ঐ স্থান থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে একটা জায়গায় জঙ্গলের গাছগুলো পাতলা হয়ে গেছে দেখে এবং সেখান থেকে চার দিক বেশ দেখা যাবে ভেবে আমি সেইখানেই বসলাম। বিট্ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরে

দেখলাম যে পাঁচ ছয়টা ভালুক একটার পর একটা ঐ ছোট পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত আসল এবং তারপর আর আমার দিকে না এসে পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। ঠিক এইটা ঘটবে তা ঐ স্থানের লোকেরা আমাকে বলেছিল। ঐদিন আমার কাছে রাইফ্‌ল্‌ ছিল না। একটা সাদা জোড়নলী বন্দুক নিয়ে বসেছিলাম, অতদূর থেকে ফায়ার্‌ ক'রে একটাও ভালুক মারতে পারলাম না। সেদিন বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে এই সব লোকেরা জন্তুর গতি বিধির উপর লক্ষ্য রাখতে কত দক্ষ। আমি অনেক দিন ঐ সব লোকদের মধ্যে বাছাই করা লোক সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলাম, এবং যদিও এইরূপে ক্রমশঃ অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, কিন্তু কখনও তাদের সমকক্ষ হতে পারিনি। অতি সামান্য সামান্য চিহ্ন দেখে তারা অনেক কিছু বুঝতে পারত এবং আমাকে তা বুঝিয়ে দিত। জঙ্গলে বেড়াবার সময় বা শিকার করবার সময় তাদের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশতাম, একত্র ব'সে গল্প করতাম, এমন কি অনেক সময় পাশাপাশি ব'সে খেতাম। এতে আমি সহজে তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পেরেছিলাম। আমি শাসন বিভাগে কাজ করতাম। একবার ঐ দেশে কোল সাঁওতালেরা কোন বিশেষ কারণে একটা ভয় পেয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে ধনুক তীর টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লুণ্ঠন নরহত্যা ইত্যাদি আরম্ভ করে। ঐ সময়ে আমি অবিচলিত থেকে আমার এলাকাধীন স্থানে শান্তিরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং আমার বিশ্বাস, সেই সফলতার মূলে আমি এই সব প্রজাদের যে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস অর্জ্জন করতে

পেরেছিলাম সেইটাই বিশেষভাবে কাজ করেছিল। তখনও শিকারের অছিলায় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে, অকপটভাবে কথাবার্ত্তা কয়ে তাদের বিপথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করার সাহস আমার ছিল। ঐ রাজ্যে আমার এলাকাধীন অংশের বাহিরে গুরুতর অশান্তি ঘটেছিল এবং বিদ্রোহ বহু কষ্টে ও বহু সংঘর্ষের পর নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু এসব শিকারের কথা নয়। আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে যা শারীরিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এমন সব পুরুষোচিত খেলা শিকার প্রভৃতিতে মানুষে মানুষে উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান কত সহজে দূর হয়ে তাদের ভিতর একটা সখ্য ও প্রীতি জন্মাবার সম্ভাবনা হয় সেইটার একটু আভাস দেওয়া।

বড় বেড় শিকারে একজন মাত্র শিকারী থাকলে শিকারের সুবিধা হয় না। ঐরূপ শিকারে পত্তার লাইন অনেক দূর বিস্তৃত হয় এবং তাতে বড় বড় জঙ্গল ঘেরাও হয়ে যায়, ফলে অনেক জানোয়ার তাড়া পেয়ে ছুটে আসতে থাকে। এর কয়েকটা মাত্র একজন শিকারীর দৃষ্টিপথে পড়া সম্ভব, অপরগুলো তার দৃষ্টির বা'র দিয়ে চলে যায়। এই রকম শিকারে একাধিক, এমন কি ১০।১২ জন শিকারী আসন গ্রহণ করে। যতগুলি শিকারী ততগুলি মাচান খানিক দূর অন্তরে অন্তরে প্রায় এক লাইনে তৈরী হয় এবং শিকারীরা প্রত্যেকে এক একটি মাচানে বসে। এতে বিট্ করার সময় জানোয়ারেরা যে পথে দৌড়োয় তার অনেকটা বিস্তার শিকারীদের দৃষ্টিপথে পড়ে, সুতরাং বেশী জানোয়ার শিকার করবার সম্ভাবনা থাকে।

বড় বেড় শিকারে আমি বহুবার যোগ দিয়েছি, আর দু'একটা

কথায় তারি একটু আভাস দিই। পন্তার লাইন খানিকটা এগিয়ে আসার পর থেকেই জানোয়ারের সাড়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ জঙ্গলের ভিতর তাদের চলা ফেরার এবং দৌড়ুবার শব্দ শোনা যায়। তার পরেই তারা শিকারীদের দৃষ্টিপথে আসে। জানোয়ার বেশী থাকলে শিকারীদের ঘন ঘন বন্দুকের ফায়ার্ চলতে থাকে, তার সঙ্গে পন্তার লাইন থেকে চীৎকার, এবং নাগরা ও ভারী করতালের বাজনা, শিঙ্গার শব্দ, সব এক হয়ে ক্রমশঃ তুমুল হয়ে ওঠে, এবং মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর, ধনেশ পাখী, বন মুরগী ইত্যাদি জঙ্গলের পাখী ভয় পেয়ে উড়ে যেতে থাকে। বুঝতেই পারছ এটা শিকারীদের পক্ষে বেশ একটা উত্তেজনার সময়।

বেড় শিকার বৎসরের সব সময় হয় না। বর্ষা বা শরৎ কালে এমন কি হেমন্ত কালের প্রথমটাতেও বেড় শিকারের সুবিধা থাকে না। কারণ তখন ছোট গুল্ম ও লতার নীচু ঝোপ জঙ্গল এত ঘন হয় যে পন্তার লাইন তার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত ভাবে চলতে পারে না এবং জন্তুরাও ঐ জঙ্গলের মধ্যে অতি সহজে আত্ম-গোপন করতে পারে। শীতের সময় যখন ঝোপগুলোর পাতা ঝরে প'ড়ে সাফ্ হয়ে যায়, তখন জঙ্গলের বড় গাছগুলির নীচে দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়, এবং জন্তুগুলো সম্পূর্ণ-ভাবে লুকোতে পারে না, ফলে বিটার্রা পন্তার লাইন বজায় রেখে নির্ভয়ে এগুতে পারে।

এক সুন্দরবন ছাড়া বাঙ্গলাদেশের সমতল অংশে খুব বিস্তীর্ণ জঙ্গল নাই বললেই হয়। কিন্তু তোমরা শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবে যে ঐ অংশের অনেক পল্লীগ্রামে বর্ষার পরে গ্রামবাসীদের

বসতির আশে পাশে, বাগানে বা পতিত জমিতে এত ভয়ানক ঘন ঝোপ গজিয়ে ওঠে যে সেরকম ঘন ঝোপ পাহাড় ও জঙ্গলপ্রধান দেশে বর্ষার পরেও সচরাচর দেখা যায় না। কখন কখন বাঙ্গলার ঐ রকম বনে ঢুকে দেখেছি যে সে সব স্থানে দিনের বেলায়ও প্রায় রাত্রির মতো অন্ধকার। জঙ্গলের বা'র থেকে মনে হয় যেন এত জমাট যে একটা কাঠিও বুঝি তার ভিতর ঢুকান যাবে না। ঐ সব জঙ্গল কিন্তু বেশী বড় নয়, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, আর তাদের চারদিকে মানুষের বসতি, সেইজন্য এই সব বন বড় এবং অধিকসংখ্যক জন্তুদের আশ্রয় দিতে পারেনা,—তাই রক্ষা। তবুও এই সব বনে অনেক সময় চিতা বাঘ আশ্রয় গ্রহণ ক'রে গ্রামের গরু ছাগল ধ্বংস করে। বুনো শূয়োরও প্রায়ই ঐ সব বনে দেখা যায়।

আমার শিকার জীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার ময়ূর-ভঞ্জ রাজ্যে কেটেছে। এই রাজ্য, খানিকটা অংশ ছাড়া, প্রধানতঃ পাহাড় জঙ্গলের দেশ। একটা পর্ব্বতশ্রেণী রাজ্যের মাঝখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বীভাবে অবস্থিত আছে, ঐ পর্ব্বতের নাম 'শিমলিপাল'। শুধু এই পর্ব্বত শ্রেণীরই আয়তন ৯৪০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ৬৩ মাইল লম্বা এবং ১৫ মাইল চওড়া। এর প্রায় সবটাই বিশাল বনভূমি। এ ছাড়া ঐ রাজ্যের সমতল ভূমিতে আরো অনেক ছোট ছোট পাহাড় এবং জঙ্গল আছে। আমি অধিকাংশ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং শিকারের উদ্দেশ্যে অনেক জঙ্গলে বেড়িয়েছি, কিন্তু বাঙ্গলাদেশের বর্ষাকালের ঐ রকম দুর্ভেদ্য ঝোপের মতো ঝোপ আমার চোখে বড় বেশী পড়েনি।

বেড় শিকার বেশী বড় হওয়া উচিত নয়। বেশী বড় হ'লে প্রায়ই শিকার ভালো হয় না। পন্তার লাইন অতিরিক্ত লম্বা হ'লে জঙ্গল ঝাড়বার সময় বিটার্‌দের পক্ষে ঐ লাইন ঠিক বজায় রেখে শিকারীদের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এইরকম বড় শিকারে এত বেশী বিটার্ সংগ্রহ করতে হয় যে তাতে তাদের লাইন ঠিক রেখে চালাবার জন্য অনেক অভিজ্ঞ নায়কের বা চালকের দরকার হয়, এবং এইরূপ নায়কের অভাবে লাইন নষ্ট হয়ে গিয়ে শিকার একেবারে পণ্ড হয়ে যায়। এইরকম একটা বড় বেড় শিকারের গল্প বলি।

একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের বড় একটা অংশ ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ঐ অংশের ব্যাস ৩ মাইলেরও বেশী অর্থাৎ তার পরিধি প্রায় ১১ মাইল। প্রায় আড়াই হাজার বিটার্ সংগ্রহ করা হয়েছিল। তারা রাত্রিতে এসে জঙ্গল থেকে খানিক দূরে ক্যাম্প্ করল, তার মানে খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে, শুয়ে ব'সে, গল্প ক'রে রাত কাটিয়ে দিল। জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ্ তৈরী ক'রে সকাল বেলা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সেই বিটার্‌দের দলে দলে পন্তা দিতে পাঠান গেল,—বলে দেওয়া হ'ল কোন দল কার অধীনে পন্তার লাইনের কোন অংশ দখল ক'রে দাঁড়াবে। বিটার্‌রা আপন আপন স্থানে পৌঁছে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাত খেয়ে বেলা বারটার সময় যাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় এরূপ বন্দোবস্ত করা হ'ল। পন্তার লাইন প্রায় ৫ মাইল লম্বা হয়েছিল, অর্থাৎ জঙ্গলের পরিধির প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে লাইন ধ'রে বিটার্‌রা দাঁড়াল। বারটার

সময় বন্দুক ফায়ার্ ক'রে সঙ্কেত করা হ'ল বিট্ আরম্ভ করবার জন্য। অত বড় লাইনের মাঝে মাঝে নাগরা রাখা হয়েছিল, সঙ্কেতটা নাগরা বাজিয়ে সমুদয় লাইনে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

যেমন হয়ে থাকে সেইরকম পন্তার লাইনের সম্মুখ দিকে, ঘেরাও করা জঙ্গলের পরিধির মধ্যে জনকয়েক শিকারীর জন্য মাচান করা হয়েছিল। একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে খানিকটা ফাঁক ছিল, মাচানগুলি সেইখানেই করা হয়েছিল। ঐ ফাঁকের দুই দিকেই পাহাড়শ্রেণীটি অনেকটা দূর পর্য্যন্ত গোল হয়ে পন্তার লাইনের দিকে বিস্তৃত ছিল। পাহাড়ের উপরে স্থানে স্থানে লোক রাখা হয়েছিল, যাদের কাজ হবে পাহাড়ের উপর দিয়ে জন্তুদের পালানতে বাধা দেওয়া। পন্তার লাইন ঠিকমত চলেছে কিনা দেখবার জন্য আট দশ জন পুলিশ এবং ফরেষ্ট্ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীকে লাইনের উপর খানিক দূর অন্তরে অন্তরে পরিদর্শক হিসাবে রাখা হয়েছিল। মোট কথা যেরকম বন্দোবস্ত হয়েছিল তাতে শিকারটি অত্যন্ত সফল হবার কথা।

এত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও কিন্তু সেদিনকার শিকার একেবারে নষ্ট হয়েছিল। সেদিন আমার কি খেয়াল হ'ল, আমি সঙ্কল্প করলাম যে শিকারীর মাচানে না ব'সে আমি বিটার্দের সঙ্গে পন্তার লাইনে যাব এবং দেখব কি রকম বিট্ হচ্ছে। এইটা করাতে আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম কি ক'রে সেদিনকার শিকারটা নষ্ট হ'ল।

আমার সঙ্গে একটা হাতী ছিল। তার উপর চড়ে আমি বিটার্দের লাইনের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। প্রথমটা লাইন বেশ

অটুটভাবে এগিয়ে চলল। এইখানে বলে রাখি যে জঙ্গল ঝাড়ার সময় বিটার্‌রা কখন দ্রুত চলে না, খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ঘণ্টায় একমাইলও চলে কি না সন্দেহ। দ্রুত চললে লাইন ঠিক রাখা যায় না এবং জঙ্গলের জানোয়ারগুলো অতি হঠাৎ তাড়া পেয়ে সামনে শিকারীদের দিকে না গিয়ে বিটার্‌দেরই লাইন ভেদ ক'রে যেতে চেষ্টা করে। আর দ্রুত চলতে গিয়ে বিটার্‌দের, যে সব হিংস্র জন্তু ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের মুখে অতর্কিতে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিটার্‌দের সঙ্গে একঘণ্টা চলার পর আমার সম্মুখের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখতে ইচ্ছা হ'ল কি রকম জন্তু চলাফেরা করছে। খুব খানিক দূর ঢুকে কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু শব্দে বুঝতে পারলাম যে কয়েকটা বড় জানোয়ার ধীরে ধীরে যেদিকে মাচান হয়েছে সেদিকে যাচ্ছে। তখন হাতী থেকে নেমে মাহুতকে সেখানে দাঁড়াতে বলে রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে খানিক অগ্রসর হতেই দেখলাম প্রায় ৭।৮টি হাতী দলবদ্ধ হয়ে চলেছে। তার ভিতর একটি বড় দাঁতাল পুরুষ হাতী, অপরগুলি হস্তিনী ও কয়েকটি বাচ্ছা। সব চেয়ে বড় হস্তিনীটি আগে আগে যাচ্ছে এবং অপরগুলি তার পিছনে চলেছে। এইটাই হয়ে থাকে। হাতীর দল চলবার সময় একটী হস্তিনী সর্ব্বদা লিডার্ (leader) বা নেত্রী হয়ে দলের আগে আগে চলে। দাঁতাল পুরুষ হাতী কখনও দলের পরিচালক হয় না, কিন্তু সে রক্ষক বটে। বিপদের সময় সে হস্তিনী ও বাচ্ছাগুলিকে পশ্চাতে রেখে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। হরিণের দলেও দেখেছি যে চলবার পথে কোন একটী হরিণীই সর্ব্বাগ্রে চলে, পুরুষ হরিণ তার পিছনে চলে। এই হাতীর দলে

বাচ্ছাগুলি একবার ক'রে তাদের মা'দের পেটের তলে চলে যাচ্ছিল, আবার বেরিয়ে এসে একটু এদিক ওদিক ক'রে বেড়াচ্ছিল। দেখলাম হাতীগুলি একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এদিকে সেদিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিচ্ছে আর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করছে। আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাদের দেখতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে তারা আমার দৃষ্টির বাহিরে চলে গেল।

এইরকম খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ৪।৫টা বড় সম্ভর হরিণ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারা মাচানের দিকে না গিয়ে পন্তার লাইনের প্রায় সমান্তরালভাবে দৌড়ে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই বিটার্‌দের চীৎকার অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল, যেন তাদের মধ্যে একটা কি ঘটেছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘেরাও করা জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে পন্তার লাইনে এসে দেখি যে বিষম কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। লাইন ভেঙ্গে গেছে, বিটার্‌রা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জোট পাকিয়ে ছুটোছুটি করছে, এবং সম্ভরগুলোকে তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করছে। দু'একটা সম্ভর পড়েছেও দেখলাম। বুঝলাম এরা শিকার পেয়ে পাগল হয়ে গেছে এবং আপাততঃ শাসনের বাহিরে চলে গেছে, কোন কথাই শুনবে না। এও বুঝতে পারলাম যে তাদের এই উত্তেজনা লাইনের সব অংশেই সংক্রামিত হবে, এবং হ'লও তাই। সব লাইন নষ্ট হয়ে গেল আর বনের মধ্যে সে এক তাণ্ডব লীলা চলল। এই রকম প্রায় ১ ঘণ্টা চলে যখন বিটার্‌রা আর হাতের কাছে কোন জন্তুকে পেল না, তখন শান্ত হ'ল। তখন প্রত্যেক নিহত জন্তুকে কয়েকজন বিটার

আগলে ব'সে রৈল এবং পুলিশ ও ফরেষ্ট্ কর্ম্মচারীদের আদেশে বাকী লোকেরা আবার পন্থা ধরবার চেষ্টা করল। তা'ও সফল হ'ল না। তারপর কোনমতে ঐ সব লোককে যেমন তেমন ক'রে চালিত ক'রে সন্ধ্যার সময় মাচানের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল। সেই হাতীর দল ছাড়া আর কোন জন্তুই মাচানের শিকারীরা দেখতে পেলেন না। এই শিকার শেষ হবার পর যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম তখন দেখলাম যে বিটার্‌রা ছয় সাতটা সম্বর, প্রায় ততগুলি চিতল বা চিত্র হরিণ, অনেকগুলো কুটারি বা ছোট জাতির হরিণ এবং বুনো শূয়োর মেরেছে। তারা তখন মাংস ভাগ করতে বসে গেছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন সাধারণের পক্ষে জঙ্গলের জন্তু মারা নিষেধ থাকলেও যাদের বিট্ করবার জন্য ডাকা হত তাদের কতকটা "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" গোছের অনুমতি দেওয়া হত যে তারা পন্থার লাইনের উপর যে সব জন্তু গিয়ে পড়বে, সেইগুলির দু'একটাকে মারুক। আজকাল কড়াকড় আইনে এটা একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এটা না হ'লে শিকার পণ্ড হয় এবং জঙ্গলের জানোয়ারের অযথা হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। 'অযথা' বলছি এইজন্য যে বিটার্‌রা মাংসের লোভে হরিণ বা ঐ জাতীয় জন্তু পেলেই হত্যা করবে, তা সে জন্তু পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক। কিন্তু যথার্থ শিকারীরা কখনও স্ত্রী হরিণ শিকার করে না, অন্ততঃ করা উচিত নয়। তার কারণ এ নয় যে "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে নেই।" ভালুকী বা বাঘিনী পেলে শিকারীরা ছাড়ে না। কিন্তু যে সব নিরীহ জন্তু সচরাচর দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলে চরে, যেমন হরিণ, তাদের দলে যদি একটা পুরুষও থাকে তাহ'লে

ঐ জাতের বংশবৃদ্ধি বা বংশরক্ষার বাধা থাকে না। কিন্তু স্ত্রী জন্তুদের হত্যা ক'রে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিলে ঐ জাতের বংশলোপের না হোক বংশবৃদ্ধি কমে যাবার সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। সেইজন্য হরিণী মারা শিকারের নিয়ম-বহির্ভূত।

যাক্, যে কথা বলছিলাম। আমি ঐদিন ক্যাম্পে ফিরে এসে একটু তদন্ত ক'রে জানতে পারলাম যে পন্তার লাইন চলতে আরম্ভ করার প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে লাইনের দুই মুখ একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে, যে পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে শিকারীদের মাচান তৈরী হয়েছিল, প্রায় তার দুই দিকের শেষ সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, এবং এতে জঙ্গলের অধিকাংশটাই একরকম ঘেরা পড়েছিল। ফলে হরিণগুলো একদিকে তাড়া পেয়ে অন্য দিকের বিটার্‌দের উপর গিয়ে পড়ছিল এবং সেখান থেকে তাড়া পেয়ে আবার অপর দিকে পন্তার লাইন পর্য্যন্ত দৌড়ে আসছিল। দু'-একবার এই রকম হওয়ার পর বিটার্‌রা আর লোভ সামলাতে না পেরে নিজেরাই শিকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। অত্যন্ত বেশী লোক থাকায় এবং তাদের ভালো ক'রে চালিত করার জন্য নায়কের অভাবে এইটা ঘটেছিল।

ঐ দিন আর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যখন সন্ধ্যার সময় প্রায় ২০০০ বিটার্ শিকারীর মাচানের কাছাকাছি পৌঁছুলো তখন পাহাড়শ্রেণীর ঠিক সম্মুখে তারা দাঁড়িয়ে গেল। তখন তারা চীৎকার করছে এবং অনেকগুলো নাগরা একত্র বাজছে, আর তাতে ভীষণ শব্দ হচ্ছে। পন্তার লাইন তখন আর নাই, ঐ ২০০০ বিটার্ দলবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়েছে। তখনও মাচান একটু দূরে রয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে না। আমি

বিটার্‌দের ভিড় থেকে সরে একটা পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়েছি, আমার চার পাশেও অনেক লোক। সেই সময় ঘন ঘন দুইটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এক মিনিট যেতে না যেতে আমার পাশের লোকেরা চীৎকার ক'রে উঠল এবং প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে যেতে যেতে অনেক লোক পড়ে গেল। তখন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতী মাচানের ঠিক পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ইঞ্জিনের মতো আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তোমরা হয়ত মনে কর যে হাতী যেরকম থপ্‌ থপ্‌ ক'রে চলে তাতে তারা বেশী জোরে দৌড়ুতে পারে না, কিন্তু মোটেই তা নয়। তারা যখন প্রাণভয়ে বা ক্রুদ্ধ হয়ে দৌড়োয় তখন অত বড় জানোয়ার যে কত বেগে ছুটতে পারে তা না দেখলে বুঝতে পারবে না। নিমেষের মধ্যে হাতীটা আমা হতে ১০ গজ মাত্র দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর সোজা বিটার্‌দের ভিড়ের দিকে ছুটল। বিটার্‌রা হাতী আসছে দেখে দু'ধারে দৌড়ে গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিতে চেষ্টা করবার সময় অনেক লোক পড়ে যেতে লাগল। হাতী তাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হ'ল। আমি তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করলাম হাতীর পায়ের চাপনে কেউ মরেছে কিনা এবং কেউ মরেনি জেনে আশ্বস্ত হলাম। তবে অনেক লোক যে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে তা জানতে পারলাম। ভাগ্যে কারও হাত-পা ভাঙ্গেনি।

যে শিকারী ঐ হাতীর উপর গুলী চালিয়েছিলেন তিনি ভালো করেননি। তদন্তে জানলাম যে হাতী কোনও মাচান আক্রমণ করেনি। অত বড় শিকারে কোন জন্তু পেলেন না দেখে শিকারী বোধ হয় শেষটা ক্ষুব্ধ হয়ে হাতী হাতীই সই ব'লে তার উপর

গুলী চালিয়েছিলেন। এই রকম শিকারে হাতীকে গুলী করা শিকারের নিয়ম-বহির্ভূত। হাতী মারা সব রাজ্যেই নিষিদ্ধ। কেবল যখন কোন পুরুষ হাতী দুষ্ট-প্রকৃতি বলে ঘোষিত হয় এবং তার ধ্বংসের জন্য শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বাহির হয় তখনই সেই হাতীটাকে মারা যেতে পারে।

ঐ রকম দুষ্ট প্রকৃতির হাতীকে "রোগ্" (Rogue) বা গুণ্ডাহাতী বলে। "রোগ্" কথাটা ইংরাজী। পুরুষ হাতী কি ক'রে "রোগ্" হয়ে দাঁড়ায় তা বলি। দলে একাধিক পুরুষ হাতী থাকলে তার মধ্যে যে পুরুষ হাতীটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান সেইটি দলপতি বা যূথপতির স্থান অধিকার করে। দলের আর সব হাতীই তাকে সম্ভ্রম ক'রে চলে, কেহই তাকে বিরক্ত করতে সাহস করে না। এই অবস্থায় স্বদলে কোন পুরুষ হাতী পূর্ণ-বয়স্ক হয়ে, বা অপরদলের কোন পুরুষ হাতী এসে যদি যূথপতিত্ব দাবী করে তাহ'লে ঐ দুই হাতীর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ কোন হস্তিনীকে নিয়েই এই সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই রকম যুদ্ধ একবার আরম্ভ হ'লে যতক্ষণ না একটা হত হয় বা পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয় ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলে। কখন কখন দিনের পর দিন এই যুদ্ধ হতে থাকে এবং এই যুদ্ধ যেখানে ঘটে সেই স্থানের গাছপালা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যে হাতী পরাজিত হয়ে দল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় সে যদি অপর দলে আশ্রয় না পায় তাহ'লে তাহাকে সর্ব্বহারার মতো একা একা বেড়াতে হয়। অপর দলে আশ্রয় পাওয়াও তার পক্ষে কঠিন, কারণ সেই দলের পুরুষ হাতীগুলো নবাগতকে সহজে দলে ঢুকতে দেবে না। এই রকম পরাজিত একক হাতীগুলোর

স্বভাব রাগে ও ক্ষোভে অতি ভীষণ হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃ হাতীদের প্রকৃতি হিংস্র নয়, কিন্তু এই "রোগ্" গুলো অত্যন্ত হিংস্র হয় এবং বিনা কারণে মানুষকে আক্রমণ করে ও অনেক সময় গ্রামে ঢুকে ঘরবাড়ী নষ্ট ক'রে দেয়। তখন এই হাতীকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না এবং তখনই এটা শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা "রোগ্" বলে ঘোষিত হয়। আমার এলাকার মধ্যে একটী পাহাড়ের উপত্যকায় গভীর বনে একবার ছুই তিন দিন ধ'রে ছুইটি পুরুষ হাতীর মধ্যে এইরকম যুদ্ধ হওয়ার পরে একটি হত হয়। যুদ্ধের সময় আমি সংবাদ পাইনি। প্রায় পনের ষোল দিন পরে যখন মৃত হাতীটার প্রকাণ্ড দাঁত ছুইটা আমার কাছে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রজারা পুরস্কারের লোভে এনে দিল তখন তাদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছিলাম। এত বড় ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম না বলে আফ্‌শোষ্ রয়ে গেছে। হাতীর দাঁত আনতে পারলে গবর্ণমেণ্ট বা ষ্টেট্ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। হাতীর দাঁত জঙ্গলে পড়ে থাকলেও তা গবর্ণমেণ্টের বা ষ্টেটের সম্পত্তি,—যে লোক ঐ দাঁত জঙ্গলে কুড়িয়ে পায় তার নয়।

যে বড় বেড় শিকারটার কথা বলছিলাম তাতে বলবার মত আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। শিকারের পর ক্যাম্পে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করতে রাত্রি দশটা হ'ল। শোবার উদ্‌যোগ করছি এমন সময় সংবাদ পেলাম যে একজন পুলিশ সাব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টার্, যিনি পন্তার লাইনে ছিলেন, ক্যাম্পে ফিরে আসেন নি। তখনি আমি ক্যাম্পে ভালো ক'রে তদন্ত করায় ছু'একজন বলল যে তারা দেখেছিল হাতী বিটার্‌দের দলের

ভিতর দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় ঐ সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার্‌ হাতীর পাশেই পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোলমাল থেমে যাওয়ার পর তারা আর তাঁকে দেখতে পায় নি। তারা তাঁর আর কোন খোঁজ করেনি, কারণ তারা ভেবেছিল যে তিনি উঠে সেখান থেকে সরে গিয়েছেন। এই শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, কারণ যে বনে শিকার হয়েছিল সেটা হিংস্র জন্তুতে ভরা বলে জানা ছিল। ক্যাম্পে এসে শুনেছিলাম যে বিটার্‌রা দু'একটা বাঘও দেখতে পেয়েছিল। একে সেই দুর্গম বন তাতে আবার শীতকালের অন্ধকার রাত্রি, সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার্‌ অক্ষত দেহে থাকলেও তাঁকে সেই বনে রাত্রি কাটাতে হ'লে তাঁর অতিশয় বিপদের সম্ভাবনা বুঝে আমার বড় ভাবনা হ'ল। অপর কয়েক-জন পুলিশ কর্ম্মচারী ক্যাম্পে ছিল, আমি তাদের একজনকে ডেকে বললাম সে যেন তখনি অন্ততঃ ৫০।৬০ জন লোক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টারের খোঁজ করে। সঙ্গে কতক-গুলো হারীকেন লণ্ঠন আর বড় মশাল নিয়ে যেতে বললাম। যেখানে হাতীর সম্পর্কে ঘটনা ঘটেছিল সে স্থান ক্যাম্প্‌ থেকে চার মাইল দূরে। রাত্রিতে সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা লাগবে। যতক্ষণ এই লোকগুলি ফিরে না আসে ততক্ষণ জেগে বসে থাকব এই স্থির করলাম, কারণ সেদিন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেও আমি জানতাম যে উদ্বেগে আমার শীঘ্র ঘুম আসবে না। একঘণ্টা বসে থাকার পর ভাবলাম যে জেনে আসি কখন ঐ পুলিশ কর্ম্মচারী লোকজন নিয়ে জঙ্গলে রওনা হয়েছে। আমার তাঁবুর বাহিরে খানিক দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম যে কেউ সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার্‌কে খুঁজতে যায় নি।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। যেখানে সেই কর্ম্মচারী আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পর সে বেরিয়ে এল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল যে কোন লোক তার সঙ্গে রাত্রিতে জঙ্গলে যেতে রাজী হ'ল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে এ কথা আমাকে তখনি কেন জানাল না, কিন্তু তার কোন উত্তর পেলাম না। আমার মন তখন ঘৃণায় ভরে গেল, এবং বুঝতে পারলাম যে এইরকম লোককে জোর ক'রে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েও কোন লাভ নাই,—তাতে কাজ হবে না। আমি তখন বিটার্‌দের ক্যাম্পে গিয়ে ৬।৭ টি গ্রামের প্রধানদের ডেকে, ক্যাম্পে উপস্থিত তাদের নিজ নিজ গ্রামের প্রজাদের নিয়ে আমার সঙ্গে জঙ্গলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলাম। তখনি প্রায় ১০০জন প্রজা তাদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রধানদের সঙ্গে ক্যাম্প্ থেকে বেরিয়ে এল, আমি তাদের মশাল তৈরী করতে বললাম। ঐ সব জঙ্গল এলাকার লোকেরা এক অতি সহজ উপায়ে মশাল তৈরী করে। শুকনো কাঠের রলাগুলোকে ৫।৬ হাত লম্বা ক'রে কেটে তার আগা-গোড়া কুড়ুল দিয়ে থেঁতো ক'রে চিরে, অর্থাৎ যাতে ভিতর পর্য্যন্ত ফেটে যাবে কিন্তু ফাটা অংশগুলো খসে পড়বে না এই ভাবে চিরে, ঐ রলার একদিকে আগুন ধরিয়ে দেয় আর সেটা জ্বলে ওঠে। এতে কাজ চলার মত বেশ আলো হয়। কোন মশালের আলো নিভে গেলে তাকে বার কতক দুলিয়ে দিলেই জোরে বাতাস লেগে আবার জ্বলে ওঠে। লোকগুলি মশাল তৈরী করতে আরম্ভ করল দেখে আমি পোষাক বদলাবার এবং বন্দুক আনবার জন্য তাঁবুতে ফিরে গেলাম। পোষাক বদলাচ্ছি

এমন সময় একজন লোক এসে বলল যে তখনই সাব্-ইন্স্পেক্টার্ ক্যাম্পে ফিরে এলেন। তাঁর বড় আঘাত লেগেছে, এবং তিনি ভাল চলতে পারছিলেন না। দু'জন লোকের উপর ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে চলছিলেন বলে তাঁর ফিরতে এত দেরী হয়েছে। তার পর সাব্ইন্স্পেক্টার্কে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আহত হাতীটা একেবারে ঠিক তাঁর সামনে এসে পড়েছিল এবং তিনি দৌড়ে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে ভারী আঘাত পান আর প্রায় অচেতন হয়ে যান। নিকটে একজন কনষ্টেবল্ ছিল, গোলমাল একটু কমলে সে কয়েকজন বিটারের দ্বারা তাঁকে এক দিকে বহে নিয়ে গিয়ে ঐ লোকদের সাহায্যে তাঁর শুশ্রূষা করে। যখন আর সব লোকেরা সেখান থেকে ক্যাম্পে ফিরতে সুরু করল তখনও তাঁর চলবার মত অবস্থা হয় নি। খানিক পরে যখন চলবার ক্ষমতা হ'ল তখন তিনি ঐ লোকদের সাহায্যে ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন।

এই ঘটনা থেকে অনেক চিন্তাই মনে উদয় হয়। সেগুলো আমি আর বললাম না, তোমাদেরই ভাবতে দিলাম। শুধু এইটা আশা করি যে তোমরা বিপদের সময় তোমাদের সাথীদের বা যে কোন লোকের যতটুকু সাহায্য করতে পার তা করতে কুণ্ঠিত হবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেড় শিকারে যদিও শিকারী মাচানে বসেই শিকার করে তবুও সময়ে সময়ে তার অত্যন্ত বিপদ ঘটে যায়। আমি জঙ্গলের জানোয়ারের আক্রমণে শিকারীর যে বিপদ উপস্থিত হয় তার কথা বলছি না, কারণ সে রকম বিপদ বেড় শিকারে খুবই কম ঘটে এবং ঐরূপ বিপদ অন্যরকম শিকারে (যার কথা পরে বলব) বেশী ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। বেড় শিকারে কোনও শিকারীর যে বিপদ অন্য শিকারীর কাছ থেকে আসতে পারে তার কথাই এখানে বলছি। এই বিপদ অধিকাংশ সময়ে শিকারীর নিজের অবিবেচনার অথবা অন্য শিকারীর শিকারের নিয়মের অজ্ঞতা বা অতিলোভের ফলে ঘটে থাকে। শিকারের একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে যে শিকারী কখনও অন্য শিকারীর মাচানের নিকটবর্ত্তী স্থানে গুলী করবে না। তার কারণ, গুলী কঠিন মাটিতে বা গাছে লেগে প্রতিহত হয়ে, ঊর্দ্ধ দিকে এবং অন্য পথে চালিত হয়ে অপর শিকারীর মাচানের দিকে ছুটতে পারে, বা পাথরে লেগে খণ্ড খণ্ড হয়ে খণ্ডগুলি চার দিকে ছিট্‌কে গিয়ে অপর শিকারীকে আঘাত করতে পারে। এই জন্য বেড় শিকারের নিয়ম এই যে প্রত্যেক শিকারী তার নিজের মাচানে বসবার আগে তার ছু'দিকেই ভাল ক'রে দেখে নেবে অপর শিকারীর মাচান কোন লাইনে এবং কতদূরে অবস্থিত, এবং ঐ ছু'দিকে কখনও গুলী চালাবে না। এইজন্যই মাচানগুলো যথা সম্ভব এক লাইনে তৈরী করা হয়। এই রকম বিপদের ছু'একটা গল্প বলি।

শিকারের কথা

একবার একটা বড় বেড় শিকারে আমি আমার পূজনীয় অগ্রজ অধুনা পরলোকগত ৺সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মাচান থেকে দুইটা মাচানের পর তৃতীয় মাচানে বসেছিলাম। আমার দাদা উড়িষ্যার বাঙালীদের মধ্যে একজন প্রধান ও বিখ্যাত শিকারী ছিলেন, এবং আমার শিকারের সর্ব্ব প্রথম হাতে-খড়ি তাঁর কাছেই হয়। যেদিনের কথা বলছি সেদিন প্রায় সন্ধ্যার সময়, যখন অল্প অন্ধকার হতে আরম্ভ হয়েছে তখন পন্তার লাইন শিকারীদের মাচানের কাছে পৌঁছুল। আমি কোন জানোয়ার সেদিন দেখতে পেলাম না। বিটার্‌রা আমার মাচানের কাছে পৌঁছে যাবার পর আমি মাচান থেকে রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে নেমে পড়লাম এবং বিটার্‌দের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে কয়েক জন বিটার্‌ বলল, "বাবু, একটু আগে আমরা একটা চিতাবাঘকে আমাদের আগে আগে চলতে দেখেছি।" তখনও বিটার্‌রা অন্য মাচানগুলির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমি তাদের লাইন ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর প্রায় চল্লিশ গজ এগিয়ে গেলাম এবং সতর্ক হয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম, উদ্দেশ্য যদি চিতাবাঘটাকে দেখতে পাই তা হ'লে গুলী করব। অল্পক্ষণ চলার পর আমি পিছনের দিকে চেয়ে পন্তার লাইনের লোকদের সম্বোধন ক'রে চেঁচিয়ে কি একটা কথা বললাম। তৎক্ষণাৎ আমি শুনতে পেলাম দাদা উচ্চৈঃস্বরে বলছেন,—"অক্ষয় নাকি?" আমি উত্তর দিলাম,—"হ্যাঁ।" তিনি আমা হতে খানিক দূরে অবস্থিত তাঁর মাচান থেকে বললেন,—"এদিকে এস।" আমি তাঁর কাছে পৌঁছুতেই তিনি মাচান থেকে নেমে পড়লেন। দেখলাম যে তাঁর মুখখানি

একেবারে সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে। তিনি আমাকে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন,—"অক্ষয়, আজ এখনই আমাদের মা (তখন আমাদের পিতা জীবিত ছিলেন না) একসঙ্গে দুটি ছেলেই হারাতেন। তুমি এই সময়ে বিটার্‌দের লাইন ছেড়ে কালো কোট্ পরে একলা মাচানের দিকে এগিয়ে আসছ, এমন হতভাগা বুদ্ধি তোমার কি ক'রে হ'ল? ভালুক ভেবে আমি রাইফ্‌ল্ দিয়ে তোমাকে লক্ষ্য ক'রে যে মুহূর্ত্তে ফায়ার্ করব ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তোমাকে গুলী ক'রে আমিও যে তখনি বন্দুকে আত্মহত্যা করতাম।" দেখলাম অত্যন্ত উত্তেজনায় তাঁর শরীর তখনও থর থর ক'রে কাঁপছে। বাস্তবিকই অতি হতভাগা বুদ্ধি আমার সেদিন হয়েছিল। আমি একেবারে শিকারের নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষ আমার।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই রকমই একটা ব্যাপারে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও প্রাণ হারিয়েছিলেন। বেড় শিকারে মাচানে ব'সে তিনি ভালুককে গুলী করেন। ভালুকটা আহত হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। মহারাজা ভালুককে অনুসরণ ক'রে মারবার জন্য মাচান থেকে নেমে পড়েন। তাঁর সঙ্গে তাঁর একজন ভৃত্যও মাচান থেকে নামে। মহারাজার গায়ে কালো পোষাক ছিল। তিনি মাচান থেকে নামার পর তাঁকে ভালুক ভ্রমে পরবর্ত্তী মাচানের শিকারী গুলী করেন। ফলে চাকরটি সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে পড়ে যায় এবং একটি বুলেট্ খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে তার এক খণ্ড মহা-

রাজার হাতের তালুতে বিদ্ধ হয়। মহারাজার এই আঘাত তখনকারমত সাংঘাতিক হয়নি বটে, কিন্তু আঘাতের জন্য অস্ত্র-চিকিৎসা হওয়ার অল্প কয়েক দিন পরে শরীরের ঐ ক্ষত স্থানটি বিষিয়ে গিয়ে তাঁর দেহান্ত ঘটে। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা ও কর্ম্মচারী সত্যকারের গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মতো সর্ব্বপ্রকার রাজগুণে অলঙ্কৃত রাজা উড়িষ্যার এমন কি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে বেশী ছিলেন না বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

আমি আর একবার অন্য শিকারীর বন্দুকে কি রকম বিপন্ন হয়েছিলাম সেটাও বলি। এই অপর শিকারী আমারই পুত্র। তখন তার বয়স আন্দাজ সতের বৎসর। তার পূর্ব্বেই সে শিকারে অভ্যস্ত হয়েছিল এবং কয়েকটা চিতা বাঘ ও ভালুক শিকার করেছিল। নূতন শিকারীর উৎসাহ তখন তার প্রচুর। একদিন কাছারি করছি এমন সময় একজন প্রজা এসে বলল যে সেখান থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে তাদের গ্রামের কাছে একটা ছোট জঙ্গলে সেইদিন প্রাতে দুইটা বেশ বড় ভালুক দেখতে পেয়ে গ্রামের লোকেরা জঙ্গলটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে, আর আমাকে যেতে অনুরোধ করবার জন্য ঐ লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার যেতে তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার পুত্রও ঐ সংবাদ শুনতে পেয়ে আমাকে অনুরোধ করায় তাকে এবং একজন পিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ঐ গ্রামে উপস্থিত হলাম। গ্রামটি একটি মোটর রাস্তার উপরেই ছিল, সুতরাং পৌঁছুতে দেরী হ'ল না। আমরা পৌঁছুতেই গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এসে জঙ্গলের সীমানায় পন্তা ধরল। জঙ্গলটা সমতল ভূমিতে, কিন্তু তার একটা দিক অল্পপরিসর

হয়ে একটা জঙ্গলে ঢাকা ছোট এবং নীচু পাহাড়ের গায়ে ঠেকেছে। এর বিপরীত দিক থেকে বিট্ সুরু হ'ল। মাচান করবার আর সময় ছিল না। ছেলেকে আর পিয়নকে জঙ্গলের সেই অপরিসর স্থানে পাহাড়ের ঠিক উপরেই একটি সুবিধামত গাছ দেখে তার দুই ডালের উপর বসিয়ে দিলাম। তাদের দু'জনের হাতে দুইটা সাদা জোড়নলী বন্দুক দিলাম এবং ঐ বন্দুকের কার্ত্তুস্গুলি ছেলেকে দিয়ে দিলাম। আমি রাইফল্ নিয়ে সেই গাছ থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে মাটিতে দাঁড়ালাম। ছেলেকে এবং পিয়নকে আমার দাঁড়াবার স্থান দেখিয়ে দিলাম।

বিট্ সুরু হওয়ার প্রায় পনের মিনিট পরেই বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছেলে চেঁচিয়ে বলল একটি ভালুককে সে ফেলেছে। তার পাঁচ মিনিট পরেই আর একটি বেশ বড় ভালুককে আমা হতে প্রায় চল্লিশ গজ দূর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। তখন ভালুকটা আমার আর অপর শিকারীর (পুত্রের) গাছের লাইনের উপর এসে পড়েছে। আগেই বলেছি যে ঐ লাইনের উপর কোন জন্তুকে গুলী করা শিকারের নিয়ম-বিরুদ্ধ। ভালুকটা ঐ লাইন পার হয়ে পাহাড়ের দিকে খানিকটা পথ যাওয়া মাত্রই আমি ফায়ার্ করলাম। বুঝতে পারলাম যে ভালুক আহত হ'ল, কিন্তু পড়ল না, দৌড়ুল। আমিও তার পিছনে দৌড়ুলাম। আমার কাছে ঐ গ্রামের একজন লোক টাঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে ও আমার সঙ্গে ছুটল। খুব খানিকটা দৌড়ে যাওয়ার পর সঙ্গের লোকটি দেখিয়ে দিল যে ভালুকের রক্তের দাগ পাশেই একটা ঝোপ পর্য্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়েছে। সেই ঝোপ ভালো ক'রে লক্ষ্য করায় ভালুকটাকে

দেখতে পেলাম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তৎক্ষণাৎ ফায়ার্ করায় সে ঐ খানেই পড়ল আর উঠল না।

ইতি মধ্যে আমার ছেলে ও পিয়ন তাদের বন্দুক দুইটা হাতে ধরে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। ভালুকটা পড়েছে দেখে তারা আশ্বস্ত হ'ল। তখন পিয়ন বলল—"আমার বন্দুকটাতে কার্ত্তুস্ ছিল না, আমি ফায়ার্ করতে পারিনি, এই দেখুন হুজুর।" এই বলে যেমন সে তার বন্দুকের ঘোড়া টিপেছে, অমনি আমার কাণ থেকে এক ফুটের মধ্যে সেই বন্দুক ফায়ার্ হয়ে গেল আর আমার কাণ খানিকক্ষণের জন্য কালা হয়ে গেল। আমরা সকলেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গের সেই টাঙ্গি-হাতে লোকটি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে বলল—"কি সর্ব্বনাশই এখনি হয়েছিল।" আমি তার পিঠ চাপড়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"ভয় কি; আমি ত মরিনি, ওঠ।" আমার ছেলের আর পিয়নের অবস্থা তখন প্রায় তদ্রূপ।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ—আমার পুত্র আর পিয়ন গাছে বসবার পরই পুত্র তার বন্দুকের দুইটা নলাতেই কার্ত্তুস্ ভরে দেয়। ঠিক সেই সময় বিট্ আরম্ভ হওয়ায় দুই জনেই জঙ্গলের দিকে নজর রেখে বসে যায়, পিয়নের বন্দুকে কার্ত্তুস্ ভরতে কারো মনে ছিল না। তারপর ছেলের একটা ফায়ারে যখন প্রথম ভালুকটা পড়ল তখন সে আর দ্বিতীয় ফায়ার্ করেনি। আমার রাইফল্-ফায়ারের পর যখন দ্বিতীয় ভালুকটা পালাল এবং অমি তার পিছনে ছুটলাম তখন ছেলের কথায় পিয়ন আগে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া মাত্র সে পিয়নকে তার নিজের হাতের বন্দুকটা

ধরিয়ে দিয়ে, বেশী উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েই, পিয়নের হাত থেকে একটা বন্দুক নিয়ে আমার কাছে পোঁছুবার জন্য ছুটেছিল। এই সময়টা তাড়াতাড়িতে তাদের দু'জনের বন্দুক বদল হয়ে গিয়েছিল। ছেলের কার্তুস্-ভরা বন্দুক পিয়নের হাতে রয়ে গেল, আর ছেলে পিয়নের খালি বন্দুকটা নিয়ে ছুটেছিল। তার ফলে এই ঘটনা। যখন দ্বিতীয় ভালুকটা পালায় তখন পিয়ন তার নিজের খালি বন্দুক ফায়ার্ করতে চেষ্টা করে সফল হয়নি, তাতেই সে আমাকে দেখাচ্ছিল যে তার বন্দুকে কার্তুস্ ছিল না। এই পিয়ন বন্দুকের ব্যবহার কিছু কিছু জানত; সেইজন্যই তার হাতে বন্দুক দিয়ে ছেলের সঙ্গে বসতে দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে ছেলের আমি বিশেষ দোষ দিই না, কারণ যে সময় বন্দুক বদল হয়েছিল সে সময় সে আমার বিপদ বুঝতে পেরে খুব বিচলিত হয়েছিল এবং শীঘ্র আমার কাছে পোঁছুবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। সেদিনকার দুইটা ভালুকই খুব বড় ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুইটাই পুরুষ ভালুক ছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। আমার প্রথম ফায়ারের বুলেট্‌টা ভালুকের অন্ত্র ভেদ ক'রে যায়, সেইজন্য সে সেখানেই পড়েনি।
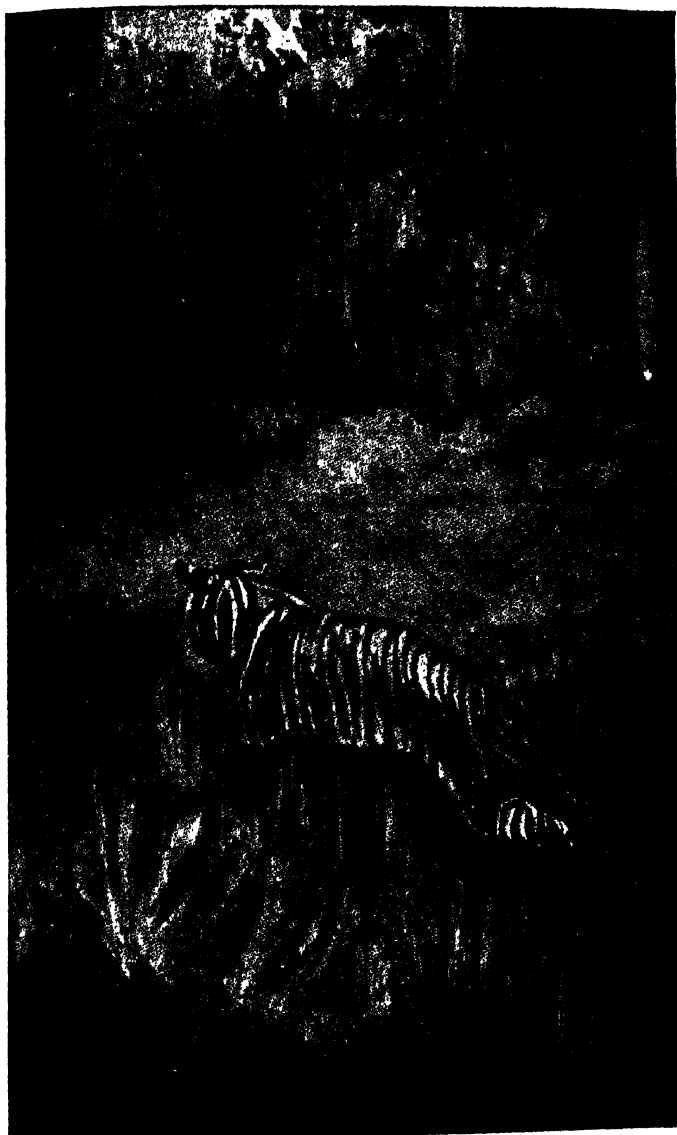
রয়্যাল্ টাইগার্ অতি সন্তর্পণে তার শিকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (৫৩ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে বেড় শিকারের কথা এতক্ষণ বললাম তাতে পন্তা ধরার প্রণালী বিশেষ ক'রে বিটার্‌দের শেখাতে হয় না। কতকগুলি লোক সংগ্রহ ক'রে তাদের পন্তা ধরিয়ে দিয়ে চালিত করলেই হ'ল। কিন্তু এক রকম বেড় আছে তাতে বেশ নিয়ম-বদ্ধ উপায়ে পন্তা ধরতে হয় এবং পন্তার লাইন চালিত করতে হয়। এই শিকারে বিটার্‌দের মধ্যে এমন অনেকগুলি লোক থাকা দরকার যারা এ কাজ করতে অভ্যস্ত হয়েছে। এই প্রণালী বিশেষ ক'রে বড় বাঘ (Royal Tiger) শিকারেই অবলম্বন করা হয়। আমার শিকার জীবনের অধিকাংশ সময় যেখানে কেটেছে, অর্থাৎ ময়ূরভঞ্জে, আমি এইরূপ বেড় শিকার কখনও দেখিনি। এই শিকারে বেশী বিটারের দরকার হয় না, একশ' দেড়শ' লোক হ'লেই হয় এবং এতে খুব বড় জঙ্গল ঘেরা হয় না। জঙ্গলের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশই ঘেরা হয়ে থাকে।

যে জঙ্গলে বড় বাঘ আছে জানা গেছে, প্রথমে সেই জঙ্গলে মহিষ বা ঘোড়া অত্যন্ত শক্ত দড়া দিয়ে, না হয় শিকল দিয়ে, বেঁধে রেখে আসা হয়। বাঘ এসে সেই মহিষ বা ঘোড়াকে মেরে তার রক্ত এবং হয়ত খানিকটা মাংসও খেয়ে রেখে যায়; কিন্তু শক্ত ক'রে বাঁধা থাকাতে মৃতদেহটাকে সেখান থেকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বাঘ দ্বারা নিহত মানুষের বা জন্তুর দেহকে ইংরাজীতে কিল্ (Kill) বলে এবং দেশী চলতি ভাষায় "মড়ি"

বলে, আমিও একে মড়ি বলব। বাঘের স্বভাব হচ্ছে যে রক্তপান করার পর সে মড়ি থেকে বেশী দূরে যায় না। রক্তপান করার পর তার তৃষ্ণা হয় এবং সে জঙ্গলে কোন নালায় বা ঝরণায় জলপান ক'রে মড়ির নিকটে এসে কোনখানে লুকিয়ে থেকে বিশ্রাম করে, ক্ষুধার্ত্ত হ'লে পুনরায় এসে মড়ির মাংস খাবে। সেইজন্য টাটকা মড়ি দেখে অনুমান ক'রে নেওয়া যায় যে বাঘ নিকটের জঙ্গলেই আছে। তখন ঐরকম বিশেষ ভাবে শিক্ষিত বিটার্‌দের ডাকা হয়। অধিকাংশ সময়ে তারাই বলে দেয় কোনখানে শিকারীর আসন গ্রহণ করা উচিত। মৃদু তাড়া পেলে বাঘ সাধারণতঃ জঙ্গলের ভিতর যে সব স্থানে নীচু ঝোপ থাকে সেই স্থান দিয়ে গুপ্তভাবে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। জঙ্গলের ভিতর নালার বা সোঁতার ধারে সচরাচর এই রকম ঝোপ গজিয়ে থাকে, সেইজন্য ঐ সব নীচু জায়গা দিয়েই বাঘের যাওয়ার বেশী সম্ভব। শিকারীকেও ঐরূপ কোন স্থানে নিজের জায়গা স্থির ক'রে নিতে হয়। এই রকম শিকারে শিকারীর মাচানে না বসে মাটিতে কতকটা আত্মগোপন ক'রে দাঁড়ান বা বসাতেই বেশী সুবিধা, কারণ বাঘকে লক্ষ্য ক'রে গুলী চালানর জন্য তাকে যদি ঐ স্থান থেকে একটু সরে যেতে হয় সে পারবে, কিন্তু মাচানে বসে থাকলে তা পারবে না। শিকারীর নিজের জায়গায় বসার পর বিট্ আরম্ভ হয়। বেশী জঙ্গল ঘেরাও না ক'রে কেবল মড়ির নিকটবর্ত্তী খানিকটা জঙ্গলে পন্তা দিয়ে সেই পন্তা শিকারীর দিকে চালিত করা হয়। বাজনা বাজিয়ে বা বেশী চীৎকার ক'রে বিট্ করা হয় না। বিটার্‌দের হাতে দুইটা ক'রে কাঠ থাকে। পন্তার লাইন চলবার সময় তারা বেশী চীৎকার এবং গোলমাল

না ক'রে কেবল এই দুইটা কাঠে ঠকাঠক্ শব্দ করতে করতে এবং সাধারণভাবে কথা-বার্ত্তা বলতে বলতে ধীরে ধীরে শিকারীর দিকে এগিয়ে যায়। এতে বাঘ বেশী তাড়া পায় না, যেটুকু তাড়া পায় তাতে ত্রস্ত না হয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। এই ঠক্ ঠক্ শব্দের ভিতর কয়েক রকমের সঙ্কেত থাকে, তাতে যারা এই রকম শিকারে অভ্যস্ত তারা বুঝতে পারে বিটার্‌রা বাঘ দেখতে পেয়েছে কি না, এবং পেয়ে থাকলে পস্তার কোন্ অংশের লোকেরা বাঘ দেখতে পেয়েছে বা পাচ্ছে। এতে পস্তার সমস্ত লোকেরা এবং অভ্যস্ত শিকারীও বুঝতে পারে যে বাঘ কোন্ পথ ধরে চলেছে। তাতে শিকারীর ভারী সুবিধা হয়।

বলেছি যে ময়ূরভঞ্জের প্রজারা এইরূপ বেড় শিকারে অভ্যস্ত নয়। আমার এলাকাধীন স্থানে একবার ঠিক এই প্রণালীতে না হোক, কতকটা ঐ ধরণের উপায় অবলম্বন ক'রে একটা শিকার করতে চেষ্টা করায় কি রকম অকৃতকার্য্য হয়েছিলাম সেই গল্পটা শোন। একদিন প্রাতে সংবাদ পেলাম যে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসস্থানের ৭ মাইল দূরে একটি গ্রামের একজন বৃদ্ধ আর জনকয়েক রাখাল বালক গ্রামের অদূরে পাহাড়ের ধারে গরু চরাচ্ছিল। পাহাড়টা নিতান্ত ছোট নয় এবং জঙ্গলে ভরা। অন্ধকার হতে আরম্ভ হয়েছে এবং রাখালরা ঘরে ফিরে আসবার জন্য গরুগুলিকে জড়ো করছে। এমন সময় দুইটা রয়্যাল্ টাইগার্ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসল এবং তার মধ্যে একটা ঐ বৃদ্ধকে ধরল। রাখাল ছেলেরা চীৎকার ক'রে পালাতে লাগল। গোলমাল শুনে গ্রামের লোকেরা দৌড়ে এল এবং সকলে মিলে চীৎকার করায় বাঘ সেই বৃদ্ধকে

ছেড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। তখন বৃদ্ধ আর জীবিত নাই। লোকেরা মৃতদেহটাকে সেখান থেকে গ্রামে নিয়ে এল।

এই সংবাদ পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং পাহাড়ের ধারে যেখানে এই ঘটনা ঘটেছিল সেই জায়গাটা দেখলাম। আমার ধারণা হ'ল যে বাঘ খুব সম্ভব তখনও সেই পাহাড়ে আছে। তখনই ঐ জঙ্গল বিট্ করবার বন্দোবস্ত করলাম। প্রায় ৪০০ বিটার্ সংগ্রহ করা হ'ল। ইতিমধ্যে আমি একটু বেড়িয়ে দেখলাম যে জঙ্গলটি পাহাড় থেকে নেমে সরু হয়ে খানিকদূর গিয়ে অন্য একটি বড় জঙ্গলে মিশেছে, অর্থাৎ ঐ বড় জঙ্গল আর পাহাড় এই দুয়ের মাঝখানে যে জঙ্গল, সেটা অপরিসর। অপরিসর হ'লেও তার বিস্তার ৩০০ গজের কম নয়। দেখলাম এই খানেই আমাকে মাচানে বসতে হবে। কিন্তু আমি একজন মাত্র শিকারী, এই ৩০০ গজের সবটা ত আগলাতে পারব না, বিশেষতঃ যখন সেখানে ছোট ছোট ঝোপের অভাব ছিল না। যোজক জঙ্গলটির একধার দিয়ে একটা শুক্‌নো নালা পাহাড় থেকে নেমে এসে বড় জঙ্গলটা পর্য্যন্ত পৌঁছেছে, দেখে মনে হ'ল যে বাঘ সম্ভবতঃ ঐ নালার পথ ধরবে। আমি ঐ নালার ধারে নিজের বসবার জন্য মাচান তৈরী করালাম। তা ছাড়া আমার মাচান থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় ৬০।৭০ গজ দূরে দূরে এমনভাবে আরো ৫।৬ টা ছোট ছোট মাচান তৈরী করালাম যাতে সব মাচানগুলি ঐ যোজক জঙ্গলের সমস্ত বিস্তারটা আগুলে থাকে। ঐ মাচানগুলির প্রত্যেকটার উপর একজন ক'রে লোককে বসিয়ে দিলাম, এবং প্রত্যেক লোককে দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে বলে দিলাম যে সে যদি দেখতে

পায় বাঘ তার মাচানের দিকে আসছে তা হ'লে সে যেন গোলমাল না ক'রে কাঠ দু'খানা বাজায়। বাঘ যখন একটু দূরে আছে তখন এইটা করলে বাঘ অন্যপথ ধরবে, এবং যারই মাচানের দিকে যাবে সে লোক যদি এই উপদেশমত কাজ করে, তা হ'লে বাঘের পক্ষে আমার মাচানের পথ ধরার খুব সম্ভাবনা থাকবে। জঙ্গলের ঐ অংশে মাটিতে লোক দাঁড় করিয়ে না দিয়ে মাচান ক'রে বসাবার মানে এই যে আমি জানতাম যে বড় বাঘ (Royal tiger) তার দিকে আসছে দেখলে কোন লোকই সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাঠ বাজাতে সাহস করবে না, এবং সে সাহস করাও উচিত নয়।

এই সব করতে বেলা প্রায় ৩টা বাজল। তখন আমি আমার মাচানে বসলাম এবং বিট্ আরম্ভ হ'ল, আর যেমন হয়ে থাকে, বিটার্‌দের চীৎকার ও নাগরার শব্দ দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। প্রায় দুই ঘণ্টা বসে থেকে একটিও জন্তু দেখতে পেলাম না। বাঘ ছাড়া অন্য জন্তু দেখতে পেলেও সেদিন ফায়ার্ করতাম না কারণ বাঘ শিকারই উদ্দেশ্য ছিল; বাঘ অদৃশ্যভাবে মাচানের নিকটবর্ত্তী হয়েছে এমন সময় মাচান থেকে বন্দুকের আওয়াজ হ'লে আর সেদিকে আসবে না। এইভাবে বসে থাকার পর যখন বেলা ৫টার সময় পন্তার লাইন ক্রমশঃ এগিয়ে মাচান থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরে এসে পৌঁছুল এবং চীৎকার ও নাগরার শব্দ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠল, তখন একটা বিরাট গর্জ্জন ও তার সঙ্গে একটা বড় জানোয়ারের লাফ দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল শব্দটা আমার ঠিক পরবর্ত্তী মাচানের তলা থেকে

আসল। মাঝখানে কতকগুলো বড় গাছ থাকায় ঐ মাচানটা আমার মাচান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। পুনরায় আর কোন শব্দ হয় কি না এবং আমার মাচানের দিকে কোন জানোয়ার আসছে কি না দেখবার জন্য মাচানে আর খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর অল্প দূরে বিটার্‌দের লাইন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি তখন মাচান থেকে নেমে পড়ে পরবর্ত্তী মাচানের নীচে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে যা দেখলাম তাতে প্রথমটা আমার চক্ষু-স্থির হয়ে গেল। দেখলাম মাচানে কোন মানুষ নাই এবং একটি তীর মাচান থেকে প্রায় ২০ হাত দূরে মাটিতে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার লোহার ফলা সমস্তটা মাটিতে ঢুকে গেছে আর শর কাঠির পিছন দিকটা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারলাম যে ঐ মাচানের লোকটি বাঘকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছেড়েছিল এবং সে তীর বাঘকে ভালো ক'রে আঘাত না ক'রে সম্ভবতঃ তার গায়ে আঁচড়ে দিয়ে মাটিতে গিয়ে লেগেছিল। "আঁচড়ে" দিয়েছিল বলছি এইজন্য যে ওরূপ অবস্থায় ঐ রকম একটা কিছুতে শরীর স্পর্শ না করলে বাঘ সাধারণতঃ নিঃশব্দে চলে যায়,—গর্জ্জন করে না। সে যাই হোক, কিন্তু লোকটার কি হ'ল? তাকে কি বাঘে নিয়ে গেল? এই ভাবছি এমন সময় বিটার্‌রা সেখানে পৌঁছে গেল এবং সেই সঙ্গে অপর দিক হতে আমার সহিস ও জনকয়েক লোক আমার ঘোড়া নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মাচানে বসবার আগে সহিসকে মাচানের পিছন দিকে এক পাশে জঙ্গলের ঠিক বাহিরে একটা খোলা জায়গায় ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে

৪।৫ জন লোকও দিয়েছিলাম। সহিস আমার কাছে পৌঁছে বলল—"হুজুর, ঐ গর্জ্জন আমরাও শুনে চমকে উঠেছিলাম। তার পরেই দেখলাম আপনার ঘোড়ার মতো বড় একটা বাঘ মস্ত লাফ দিতে দিতে ঠিক জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ছুটেছে। ভয়ে আমি চোখ বুজেছিলাম।" সহিসের সঙ্গের লোকেরাও তাই বলল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে তারা কি ঠিক লক্ষ্য করেছে যে বাঘ একটি মানুষ মুখে ধরে দৌড়ুচ্ছে কি না? উত্তরে তারা সকলেই একবাক্যে 'না' বলল। একজন লোককে মাচানে উঠে দেখতে বললাম যে সেখানে কোন জিনিষ বা কাপড় পড়ে আছে কি না, সে মাচানে উঠে বলল যে কিছুই নাই। তারপর যে পথে বাঘ গিয়েছিল আমি সেই পথ ধরে তার থাবার দাগ অনুসরণ ক'রে খুব খানিকদূর দেখতে দেখতে গেলাম কোথাও রক্তের দাগ বা ভারী জিনিষ মাটিতে ঘসড়ানর চিহ্ন আছে কি না, অথবা ধনুকটা মাটিতে পড়েছে কি না। বাঘের পায়ের দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে তখন আশ্বস্ত হলাম যে বাঘ ঐ লোকটিকে নিয়ে যায় নি। এও বুঝতে পারলাম যে লোকটি—"অকর্ম্ম করেছি, এখনি বাবু এসে তিরস্কার করবে", এই ভয় ক'রে, আমি তার মাচানের নীচে পৌঁছুবার আগেই মাচান থেকে নেমে তার ধনুক নিয়ে পালিয়েছে। এর পরে আমি আরো ভাল ক'রে অনুসন্ধান করেছিলাম যে, যে সব গ্রাম থেকে বিটার্‌রা এসেছিল সেই সব গ্রামের কোন লোক এই ঘটনার পর ঘরে ফিরে যায়নি, এমন হয়েছিল কি না। সেরূপ কোন সংবাদ আমি পাইনি।

কি ঘটেছিল কতকটা অনুমান করা যেতে পারে। বাঘটাকে সোজা আসতে দেখে লোকটি বোধ হয় ভয়ে কাঠ বাজায়নি। তার পর যখন বাঘ নিতান্ত কাছে এসে পড়ল এবং লোকটির ভয় হ'ল যে এইবার বুঝি মাচানের উপরে লাফাবে তখন সে নিতান্ত বিচলিত হয়ে প্রাণের দায়ে তীর ছেড়েছিল। অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল বলে সে ভালো ক'রে লক্ষ্য স্থির করতে পারেনি, না হ'লে অত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বিটার্‌রা পৌঁছে যাওয়ার পর তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল যে তাদের আগে আগে দুইটা বাঘকেই তারা মাঝে মাঝে চলতে দেখেছিল। তখন অপর বাঘটা কোথায় গেল জানবার জন্য মাচানগুলোর লাইন ধরে মাটিতে চিহ্ন পরীক্ষা করতে করতে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম যে আগেকার মাচান থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে আর একটা বড় বাঘের লাফানর স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কোন মাচানের লোকই কাঠ বাজায়নি, এবং যখন এই সব পরীক্ষা করছিলাম তখন একটা মাচানেও লোক ছিল না।

ঐ দিনের আর একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। বিট্ আরম্ভ হওয়ার খানিকক্ষণ পরে দেখলাম দু'টি প্রাণী পাহাড়ের দিক থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাচানের দিকে আসছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি কি আসছে, কারণ মাচানের সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছোট ছোট ঝোপ ছিল। একটু নিকটে আসলে বুঝতে পারলাম যে প্রাণী দু'টি জঙ্গলের জন্তু নয়, দুইটি মানুষ। দুই জনেই শীর্ণ-দেহ কৌপীন-সর্ব্বস্ব পুরুষ। মাচান থেকে তাদের অনুচ্চস্বরে ডাকা মাত্র তারা চমকে উঠল এবং আমাকে দেখতে

পেয়ে নিতান্ত কুণ্ঠিতের মতো তাকিয়ে রৈল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারা জঙ্গলে কি করছিল। উত্তর পেলাম—"আলু তাড়্‌তে আসিথিলি বাবু", অর্থাৎ "আলু খুঁড়তে এসেছিলাম।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তারা কি জানেনা যে এই বনে তুইটা বাঘ এসেছে আর গত সন্ধ্যায় ঐ বাঘে মানুষ মেরেছে? তারা বলল যে তাও জানে। যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে এই জানা সত্ত্বেও কি সাহসে তারা এই জঙ্গলে ঢুকল, তখন খুব এক গাল অপ্রতিভের হাসি হেসে তাদের ভাষায় উত্তর দিল, "কি করব বাবু 'ভখা নোক' (ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র লোক), ভুখে ত মরব, না হয় বাঘে খাক্।" উত্তরটা যেমন করুণ তাদের ঐ সময়ে দাঁত বা'র ক'রে হাসবার ভঙ্গীও তেমনি হাস্যকর। এদেশে জঙ্গলই বহু দরিদ্রলোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির আশ্রয় স্থল। যা খাওয়া যায় এমন কয়েক রকম মূল জঙ্গলে জন্মায়, এবং সেগুলোকে এরা আলু বলে। নানা প্রকার জঙ্গলের ফলও এদের খাদ্য। আমের সময় জঙ্গলে একরকম ছোট আম প্রচুর পরিমাণে ফলে, যাকে এরা "সুরি আম" বলে এবং যা পাকলেও খুব টক থাকে। ঐ আমের সময়ে যখন চাষবাসের কাজ বড় একটা থাকে না, গ্রামের লোকেরা মেয়ে পুরুষে দলে দলে জঙ্গলে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসে, আম খাবে ব'লে। ইচ্ছা করে এদের অনেক আচার ব্যবহারের কথা তোমাদের বলি, তা শুনতেও হয়ত তোমাদের ভালো লাগত; কিন্তু তা ত শিকারের কথা হবে না।

আর একরকম বেড় শিকারের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এ শিকারে মানুষে পন্থা ধরে না, হাতী দিয়ে পন্থা

ধরান হয়। হাতীগুলিও শিকারে শিক্ষিত হওয়া চাই। অশিক্ষিত হাতী নিয়ে শিকার করতে গেলে কি বিপদ ঘটে তার গল্প পরে বলব।

এই বেড় শিকারে শিকারের স্থানটি কতকটা সমতল হওয়ার দরকার। পাহাড় পর্ব্বত হ'লে সুবিধা হয় না, তবে পাহাড়ের ভিতর সমতল উপত্যকাতে করা চলে। সচরাচর উঁচু ঘাসের জঙ্গলে ভরা (যেমন উলু খড়ের বন) সমতল ভূমিতে বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে এই রকম বেড় করা হয়। বাঘ ঐ রকম কোন বনে আশ্রয় নিয়েছে জানতে পারলে গুটিকয়েক হাতী দিয়ে ঐ জঙ্গল বিট্ করা হয়। শিকারীরা বন্দুক নিয়ে হাতীর উপর বসেন এবং মাহুতেরা হাতীগুলিকে এক লাইনে পন্তা ধরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চালনা করে। এইরূপে চলতে চলতে হাতীগুলি বাঘের নিকটবর্ত্তী হ'লে বাঘও ঘাস-বনের ভিতরে চলতে থাকে। বাঘের গতিতে ঘাসগুলো নড়তে সুরু করে, তাই দেখে শিকারীরা বাঘের গতিপথ বুঝতে পারেন এবং প্রস্তুত হয়ে থাকেন বাঘকে দেখা গেলেই গুলী করবেন। অনেক সময় অভিজ্ঞ শিকারী ঘাসবনের উচ্চতা ও বাঘের চলার ভঙ্গী ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আন্দাজ ক'রে নিয়ে ফায়ার্ করেন এবং তাতেই কৃতকার্য্য হন। এই শিকারে শিকারের নিয়মগুলি বিশেষভাবে পালন করা আবশ্যক, না হ'লে অপর শিকারীর সমূহ বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনও সময়ে সময়ে ঘটে যে বাঘ কোনঠেসা হয়ে বা শিকারীর গুলীতে আহত হয়ে ফিরে দাঁড়ায় এবং লাফ দিয়ে হাতীকে অথবা তার উপরে অবস্থিত শিকারী বা মাহুতকে আক্রমণ করে। এই সঙ্কট

সময়ে হাতীর অবিচলিত হয়ে ঐ আক্রমণ সহ্য বা প্রতিহত করার দরকার এবং এই স্থৈর্য্য হাতীর শিক্ষার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বিচলিত এবং সেই হেতু চঞ্চল হয়ে উঠলে তার উপরে অবস্থিত শিকারীর পক্ষে বাঘকে গুলী করা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য শিকারীও সহজে গুলী করবার সুযোগ পান না, কারণ এই সময়ে বাঘকে গুলী করলে বাঘের গায়ে গুলী না লেগে আক্রান্ত হাতী বা মাহুত কিংবা শিকারীকে আঘাত করতে পারে। এমন কথা শুনেছি যে বাঘ লাফিয়ে প'ড়ে শিকারে শিক্ষিত হাতীর মাথার কাছে শুঁড়ের গোড়ায় কামড়ে ধরেছে, আর তখন মাহুতের আদেশে হাতী স্থির হয়ে শিকারীর যে সব-শেষ কার্ত্তুস্‌টি মাটিতে পড়ে গেছে সেইটি শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে শিকারীর হাতে দিয়েছে, এবং শিকারী সেই কার্ত্তুস্‌ ফায়ার্‌ ক'রে বাঘকে শেষ করেছেন। যিনি নিজের চোখে দেখেছেন তেমন লোকের কাছ থেকে আমি এ গল্প শুনিনি, কিন্তু শিক্ষিত হাতীর পক্ষে এ অসম্ভব বলে মনে করি না। হাতীর ঐরূপ আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু ঘোড়ার কতকটা ঐরকম আচরণ দেখেছি। এমন ঘটেছে, অন্ধকারে ঘোড়ায় যেতে যেতে আমার ঘোড়াটি সম্মুখদিকে পথের পাশে অবস্থিত বড় কালো পাথর বা ঐরূপ কিছু দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে নাক বিস্ফারিত করে ভয়সূচক শব্দ করছে এবং ফিরে পালাবার চেষ্টা করছে, আর সেই সময় আমি জোর ক'রে রাশ ধ'রে আগের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে কঠিন স্বরে আদেশ দেওয়ায় সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও আদেশ পালন ক'রে তার পক্ষে ভয়াবহ সেই জিনিষের পাশ দিয়ে চলে

গেছে। এ আমি একাধিকবার দেখেছি! আমার এই ঘোড়াটি পূর্ব্বে অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিল এবং এই শিক্ষা সম্ভবতঃ সে সেখানেই পেয়েছিল।

এ কথা বলা বাহুল্য যে এইরূপ হাতী দিয়ে জঙ্গল বিট্ ক'রে শিকার রাজা-রাজড়াদের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ লোকের নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জঙ্গলের জন্তুকে কি ক'রে শিকারীর কাছে আসতে বাধ্য করা হয় তার একটা আভাস দিলাম। এখন শিকারী কি উপায় অবলম্বন ক'রে সমস্ত জঙ্গল না বেড়িয়েও সহজে শিকারের জন্তুর সন্ধান পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতে পারে সেই কথা বলব।

জলাশয়ে জাল ফেলে মাছ ধরার কথা এর আগেই বলেছি। কিন্তু জাল দিয়ে মাছ ধরা ছাড়া অন্য উপায়েও যে মাছ ধরা হয় সে কথা তোমরা সকলেই জান। ছিপ ও সূতা বড়শী দিয়ে মাছ ধরার কথা তোমাদের আর বলে দিতে হবে না। প্রাণীদের আহার অনুসন্ধান করার প্রবৃত্তিকেই এই রকম মাছ শিকারে কাজে লাগান হয়। তোমরা মাছ ধরবার জন্য চার ক'রে, অর্থাৎ জলাশয়ের কোন একটা স্থানে মাছ যে সব জিনিষ খায় সেই রকম জিনিষ জলে ফেলে দিয়ে, বড়শীতে টোপ গেঁথে সেখানে ফেলে, বসে থাক,—কখন মাছ এসে তেমার টোপ শুদ্ধ বড়শী গিলবে! অনেক সময় চার না ক'রেও শুধু টোপ গাঁথা বড়শী ফেলে বসে যাও। জঙ্গলের জন্তুর শিকারেও শিকারী ঐরূপ সব উপায় অবলম্বন করে। যখন শিকারী সন্ধান পায় যে কোন জন্তু কোথাও তার আহার অনুসন্ধান করবার জন্য আসছে বা আসতে পারে তখন সে সেখানে উপস্থিত হয়ে লুকিয়ে বসে থাকে, জন্তু সেখানে আসলেই তাকে শিকার করবে। কখন কখন শিকারী নিজেই জঙ্গলের মধ্যে জন্তুর খাদ্য কোথাও রেখে দিয়ে জন্তুর আগমন অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে ;—ঠিক টোপ গাঁথা বড়শী জলে

ফেলে জলাশয়ের ধারে বসে থাকার মতো। জল পান করবার জন্য জন্তু কোন বিশেষ জলাধারে বা ঝরণায় বরাবর আসছে জানতে পারলে শিকারী সেখানেও বসে যায়। এমন কখন কখন সন্ধান পাওয়া যায় যে জঙ্গলে কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ জাতীয় জন্তু অনেক সময় চলাফেরা করছে, সে সব স্থানও শিকারের জন্য অপেক্ষা করবার পক্ষে প্রশস্ত। এই ধরণের যত রকম উপায় হতে পারে সেই গুলোকে অবলম্বন ক'রেই শিকারী সহজে শিকারের জন্তুর নিকট উপস্থিত হতে চেষ্টা করে, এবং এই উপায়গুলিই শিকারে বেশী ব্যবহৃত হয়, কারণ বেড় শিকারের সৌভাগ্য কম শিকারীর অদৃষ্টেই ঘটে। আর বলতে কি, বেড় শিকার অপেক্ষা এই সব শিকারেই যে সকল গুণ থাকলে যথার্থ শিকারী হওয়া যায় তার বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ বন্দুক চালনায় দক্ষ হ'লেই বেড় শিকারে ব'সে শিকার করা সহজ হয়, কিন্তু অন্যরূপ শিকারে শিকারীর শারীরিক দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সাহস, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব এবং নানাবিধ অবস্থায় নানাবিধ সমস্যার দ্রুত সমাধানের ক্ষমতা বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ শিকারে কৃতকার্য্য হতে গেলে বিশেষ ক'রে জঙ্গল সম্বন্ধে এবং জন্তুদের স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানেরও বড় প্রয়োজন। এইরূপ দক্ষ শিকারীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এত বেশী যে তিনি যদি ঐ ভাণ্ডার তোমাদের কাছে খুলে দেন তা হ'লে দিনের পর দিন তোমরা তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনে যাবে, তোমাদের ক্লান্তি আসবে না।

শিকারের যোগ্য বড় জন্তুদের ঐরূপে সন্ধান করতে হ'লে

বিশেষ বিশেষ জন্তুর জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমে ভালুকের কথা বলি।

ভারতবর্ষের ভালুক (হিমালয় পর্ব্বতের বরফাচ্ছন্ন অংশ ছাড়া) মাংসাশী নয়, কিন্তু কীট-ভুক্ বটে। ফলমূলই এদের প্রধান খাদ্য হ'লেও এরা পোকা মাকড় খায়, বিশেষ করে উই এদের অতি প্রিয় খাদ্য। মাটির নীচে উইএর বাসা এরা মাটির উপরে শুঁকে জানতে পারে এবং নখ দিয়ে খুঁড়ে ঐ বাসা বা'র ক'রে উই পোকা খায়। ঐ গর্ত্তগুলো এক একটা ৭।৮ ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ফুট থেকে আড়াই ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয় দেখেছি। সাবল দিয়ে গর্ত্ত করলে যেমন হয় সেই রকম গর্ত্ত। শক্ত মাটিতে অল্প সময়ের মধ্যে নখ দিয়ে ঐ রকম গর্ত্ত যে জন্তু করতে পারে তার পায়ের আর নখের শক্তি কত তা অনুমান করতে পার। যেখানে ভালুক থাকে সেই বনে এবং তার নিকটবর্ত্তী স্থানে এইরূপ গর্ত্ত প্রায়ই দেখা যায় এবং এই গর্ত্ত দেখে বনে না ঢুকেও বলা যায় যে ঐ বনে ভালুক থাকে।

ফাল্গুন মাসে যখন মহুল ফুল ফোটে সেই সময়ে ভালুকেরা গাছের তলায় তলায় বেড়িয়ে মহুল ফুল খায়। ঐ সময় ভালুকের সন্ধান করতে জঙ্গলে যেতে হয় না। জঙ্গলের নিকট-বর্ত্তী গ্রামের পতিত জমিতে যে সব মহুল গাছ থাকে, সেই গাছের কাছে রাত্রিতে অপেক্ষা ক'রে থাকলে প্রায়ই ভালুক দেখা যায়। জঙ্গলের বা তার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন বট ফল বা জাম বা কুল পাকে, ভালুক একবার ঐ পাকা ফলের সন্ধান পেলে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতে ফল খেতে গাছের তলায় আসে।

কখন কখন এই সব ফল খাবার জন্য গ্রামের ভিতর পর্য্যন্ত ঢুকে যায়। আখ খেতে ভালুক অতিশয় ভালোবাসে এবং আখের ক্ষেতের সন্ধান পেলে রাত্রিতে সেখানে আসতে আরম্ভ করে সেই জন্য ঐ সব স্থানের চাষীরা তাদের আখের ক্ষেতের ভিতর কুঁড়ে বেঁধে রাত্রিতে পাহারা দেয়। যেখানে বেশী ভালুক থাকে সেখানে এই সমস্ত ক্ষেতে কখন কখন অনেকগুলো ভালুককে একত্র আসতে দেখা যায়। ফলের সময় আম কাঁটালের বাগানও বাদ যায় না। জঙ্গলে একরকম বড় ডুমুর হয়, সেইগুলো পাকবার সময় ভালুকেরা গাছে উঠে পাকা ফল খায়। যে গাছে ভালুক চড়ে সে গাছ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। গাছের গুঁড়িতে এবং ডালে ভালুকের নখের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। যে সব গাছে মোটা ডাল থেকে ফল বা'র হয়—যেমন ডুমুর, কাঁটাল,—সেই সব গাছেই ভালুক ফল খাবার জন্য চড়ে। যে সব গাছে ডালের আগায় পাতার ভিতর ফল থাকে, সচরাচর ভালুক যে সব গাছে না চ'ড়ে গাছের তলা থেকেই ঝরে পড়া ফলগুলি খেয়ে চলে যায়, কারণ সরু ডাল ভালুকের ভার সহ্য করতে পারে না। জঙ্গলে মৌচাক ভেঙ্গে মধু খাওয়ার জন্যও ভালুক গাছে ওঠে।

যা বললাম তা থেকে বুঝতে পারছ কি উপায়ে সহজে ভালুকের দেখা মেলে। ঐ সব জায়গায় রাত্রিতে ব'সে বহুবার ভালুক শিকার করেছি। তাতে গল্প বলবার মত ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। ভালুক আসল, গুলী করলাম, সেইখানে পড়ল বা একেবারে সাংঘাতিকরূপে আহত না হ'লে পালিয়ে গেল,— এতে গল্প বলবার কি আছে? তবু দু'একটা ঘটনার কথা

বলি, না হ'লে তোমাদের মধ্যে নিছক যারা গল্প শুনতে চাও তাদের আশা-ভঙ্গ হবে।

মফঃস্বলে বেরিয়েছি, এক জায়গায় খবর পেলাম নিকটে একটা জঙ্গলের ধারে বটগাছে ফল পেকেছে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে কয়েকটা ভালুক সেই গাছের নীচে এসে ফল খেয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, সন্ধ্যার একটু পরেই আমি সেই বট গাছে উঠে মাটি থেকে ছয় সাত হাত উঁচু একটা মোটা ডালে রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে বসলাম। এমন জায়গায় বসলাম যেখানে পিঠের দিকে অন্য একটা ডালে একটু ঠেস দিয়ে বসা যায়। এটা দরকার এইজন্য যে ফায়ার্‌ করার সময় বন্দুক পিছন দিকে যে ধাক্কাটা দেয় সেই ধাক্কায় স্থানচ্যুত হয়ে শিকারী ডাল থেকে যেন হঠাৎ না খসে পড়ে, কারণ ফায়ার্‌ করার সময় তার দুই হাতই বন্দুকের উপর থাকবে, ডাল ধরবার জন্য সে একটা হাতও ব্যবহার করতে পারবে না। এই রকম অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে রাত্রি গভীর হয়ে এল, আর আমার ঘুম পেতে লাগল। পিঠের দিকে ঠেস দেওয়ার জায়গাটা পেয়ে বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছিলাম একটু। হঠাৎ শুকনো পাতার ভিতর চলবার সড়্‌সড়্‌ শব্দে আর একটা ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দে চমকে উঠলাম। নীচের দিকে চেয়ে দেখি একটা বড় আর দুইটা ছোট ভালুক মুখ নীচু ক'রে শুঁকতে শুঁকতে ফল খেয়ে বেড়াচ্ছে। বুঝতে পারলাম যে একটা ভালুকী আর তার দুইটা বাচ্ছা। বাচ্ছা দুইটা তখন বেশ বড় হয়েছে কিন্তু তাদের মা'র সঙ্গ ছাড়েনি। ভাবলাম মারি কি না। এই ভাবছি এমন সময় বোধ হয় আমি একটু নড়ে ওঠায় একটা সামান্য শব্দ হ'ল, আর তাতেই

ভালুকীটা খাওয়া বন্ধ ক'রে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। আমার জানা ছিল বাচ্ছাওয়ালা ভালুকী অতি ভয়ানক জানোয়ার, মানুষ তার কাছে গেলেই মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে। আমি যে রকম নীচু ডালে বসেছিলাম, তাতে সে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আমাকে দেখতে পেলে গাছের উপর উঠে এসে আক্রমণ করা অসম্ভব নয়, এই ভেবে ফায়ার্ করলাম। ভালুকী সেইখানেই পড়ল আর একটু ছট্‌ফট্ করেই মরে গেল। বাচ্ছা দুইটা প্রথমটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আমি গাছ থেকে নামব ভাবছি এমন সময় সে দুইটা ফিরে এসে ভালুকীর কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল। আমি নেমে পড়া মাত্র তারা আবার পালাল। সেই রাত্রিতে মরা ভালুকীটাকে সেখান থেকে সরান হয়নি। গ্রাম সেখান থেকে এক মাইল, আমি যতক্ষণ না গ্রামে এসে পৌঁছুলাম ততক্ষণ শুনলাম সেই বাচ্ছা দুটো চীৎকার করছে। চক্রবাক শিকারের যে গল্পটা তোমাদের প্রথমেই বলেছি কতকটা সেই রকমের নয় কি?

এ ছাড়া আরও কয়েকবার বাচ্ছাওয়ালা ভালুকী মেরেছি। যখনই ঐরূপ ভালুকীর সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেছে বা দেখা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে তখনই তাকে আক্রমণ করার অবসর না দিয়ে আগেই আঘাত করেছি। শিকার বল, যুদ্ধ বল, সকল ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার মূল নিয়মই এই। আততায়ীকে আক্রমণের সুবিধা না দিয়ে তাকে আগেই আঘাত ক'রে তার বল হরণ করতে চেষ্টা করবে, এই নিয়ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলেছে। শিকারও ঠিক যুদ্ধ নয়। শিকারের জন্তুকে অতর্কিতেই আঘাত করা হয়। এ না করতে পারলে জন্তু পালাবে অথবা হিংস্র

জন্তু হ'লে আক্রমণ করবে। শিকারী পারত পক্ষে এই আক্রমণের অবসর দেয় না, কিন্তু তাকে সর্ব্বদা ঐরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

আমার পক্ষে খুব একটা স্মরণীয় দিনে এই রকম বাচ্ছাওয়ালা আর একটা ভালুকীকে শিকার করেছিলাম। আগেই বলেছি যে ঐ রাজ্যে একবার অনার্য্য প্রজারা কোন বিশেষ কারণে শঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহী হয়েছিল। ঐ সময়ে একদিন সংবাদ পেলাম যে আমার এলাকার মধ্যে এক গ্রামে বিদ্রোহীরা রাত্রিতে প্রায় ৩।৪ হাজার লোক একত্র হয়ে এক প্রকাণ্ড বৈঠক বা মিটিং ক'রে স্থির করেছে যে তারা আমার হেড্‌কোয়ার্টার্ আক্রমণ ক'রে ট্রেজারি বা খাজনাখানা লুঠ করবে এবং সেখানকার রাজকর্ম্মচারীদের পর্য্যন্ত হত্যা করবে। আরও সংবাদ পেলাম যে তারা কোনরূপ আমোদ উৎসবে যে তাদের চিরকালের প্রথা এবং অভ্যাসানুযায়ী নাগরা ও মাদল বাজায়, তা বন্ধ করেছে, এবং সমস্ত গ্রামে প্রচার ক'রে দিয়েছে যে নাগরা বা মাদল কোন গ্রামে বেজে উঠলেই তারা সকলেই যেন বুঝতে পারে যে ঐ গ্রামে তাদের আশঙ্কার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে,—এবং তখনি যেন আশপাশের সমস্ত গ্রামের লোক সশস্ত্র হয়ে ঐ গ্রামে ছুটে আসে। এই সংবাদ পেয়ে আরও একটু ভালো ক'রে অনুসন্ধান করার পর তৃতীয় দিন প্রাতে আমি কেবল মাত্র আমার সহিস ও একজন বিশ্বাসী পিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেই গ্রামে উপস্থিত হলাম। সেখানে একটা নালার ধারে গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বর প্রজাদের ডেকে পাঠালাম, তারা একে একে এসে আমার কাছে দাঁড়াল।

আমি তাদের বললাম যে আমি তাদের কাছে একা এসেছি, তারা ইচ্ছা করলে আমাকে আটক করতে বা মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয়েক কথা তাদের শুনতে হবে। তখন সেই বৃদ্ধেরা আমার সম্মুখে বসে গেল এবং আমি তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ অত্যন্ত মন খুলে কথাবার্ত্তা কয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তারা যে ভয়ে শঙ্কিত হয়েছে তা নিতান্ত অমূলক। আমার মনে হ'ল তারা ক্রমে আমার কথা বিশ্বাস করল, এবং শেষে স্পষ্ট ক'রে বলল যে তাদের ভয় দূর হয়েছে। তখন আমি তাদের বললাম যে আমি তাদের এই এথা বিশ্বাস করব, যদি তারা তখনি আমার সঙ্গে শিকারে যোগ দেয় এবং শিকারে নাগরা বাজায়। নাগরা বাজানর কথাতে প্রথমে খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে তার পর আমার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ক'রে শেষে নাগরা বাজাতে সম্মত হ'ল। তখন তারা গ্রামের মধ্যে গিয়ে নিজেদের নাগরা বাজিয়ে দিল। ঐ নাগরা বাজবার পরেই শুনলাম নিকটের গ্রামগুলোতে একটার পর একটা নাগরা বেজে উঠল, এবং দেখলাম যে আধ ঘণ্টার মধ্যে দলে দলে লোক তীর ধনুক, টাঙ্গি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে "কুল্‌কুলি" দিতে দিতে সেই গ্রামে উপস্থিত হ'ল। "কুল্‌কুলি" দেওয়া ঐ দেশের একটা কথা, এর মানে একটু সরু আওয়াজে একরকম তীব্র চীৎকার করা, কতকটা আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের উলু দেওয়ার মতো, কেবল তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র। এরা ঐ রকম শব্দ ক'রে পরস্পরকে উত্তেজিত করে। প্রায় ৩০০।৪০০ লোক অতি অল্পসময়ের মধ্যে জড়ো হ'ল। তখন

তাদের "মুখিয়ারা" (প্রধান ব্যক্তিরা) আমাকে এসে বলল যে তারা প্রস্তুত হয়েছে। আমি গ্রাম থেকে তুই মাইল দূরে একটি জঙ্গল দেখিয়ে দিয়ে তাদের শিকারে আহ্বান করলাম। বেলা তুইটার সময় শিকার আরম্ভ হ'ল। মাচান করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে বলে আমি জঙ্গলে ঢুকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়ালাম, আর জঙ্গলের ধার থেকে লোকেরা পন্তা ধরল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা বড় শিঙ্গাল্ হরিণকে ছুটে আসতে দেখে গুলী করলাম। সে যেরকম বেগে পালাল তাতে মনে হ'ল যে হয়ত গুলী লাগল না। অল্পক্ষণ পরে দেখলাম যে একটা ভালুকী তুইটা বাচ্ছা পিঠে নিয়ে সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি একেবারে তার সামনে না দাঁড়িয়ে গাছটার পিছনে গিয়ে গাছের পাশ দিয়ে দেখতে লাগলাম। ভালুকী যেমন গাছের এক পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, তখনই অপর পাশ থেকে গুলী চালাবার অবসর পেয়ে ফায়ার্ করায় সে পড়ে গেল, এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হ'ল, কারণ গুলী তার হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্ছা তু'টো পিঠ থেকে নেমে চীৎকার ক'রে উঠল। আমি একটাকে ধরতে গেলাম, আর সে কামড়াবার জন্য হাঁ ক'রে ছুটে আসল। তাকে পা দিয়ে ধাক্কা দেওয়ায় সে খানিক দূরে ছিট্‌কে পড়েই উঠে পালাল এবং অপর বাচ্ছাটাও তার সঙ্গে দৌড়ুল। আমি ভাবলাম যে বাচ্ছা তুইটার একটাকেও পাব না, কারণ পন্তার লোকেরা তাদের মেরে ফেলবে। শিকার শেষ হওয়ার পরে তুইজন বিটারের হাতে বাচ্ছা তুইটার মৃতদেহ দেখতে পেলাম।

বিটার্‌রা বলল যে হরিণটা অল্প দূরে বন্দুকের গুলীতে মরে পড়ে রয়েছে। আমি তাদের ঐ হরিণের মাংস সবটাই নিয়ে যেতে অনুমতি দিলাম। শিকারের পর আমি ঐ সমস্ত লোককে একত্র ক'রে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে আবার তাদের সঙ্গে কথা কয়ে তাদের ভয় দূর করতে চেষ্টা করায় তারা আশ্বস্ত হ'ল বলে আমার মনে হ'ল, আর আমিও অনেকটা আশ্বাস এবং তৃপ্তি লাভ করলাম। আমার কথাতেই তারা নাগরা বাজান বন্ধ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করল দেখে আমার মন বড় খুসী হয়ে উঠেছিল। এতে বুঝতে পেরেছিলাম তারা আমাকে কতটা বিশ্বাস করে। প্রজাদের এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক ব্যাপার ঘটেছিল। সে সব হয়ত তোমাদের শুনতে ভালো লাগত এবং আমারও বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু তা শিকারের প্রসঙ্গে বলবার কথা নয়।

তোমরা হয়ত ভালুকী বাচ্ছাকে পিঠে নিয়ে বেড়ায় শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছ। মা ভালুক তাই করে। বাচ্ছা যতদিন ছোট থাকে ও মা'র সঙ্গে সমানে চলতে না পারে ততদিন দ্রুত চলবার সময় মা তার নিজের পিঠে বাচ্ছাদের তুলে নেয় এবং বাচ্ছারা মা'র পিঠের লোম নখ দিয়ে চেপে ধ'রে এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে বসে থাকে। একটু দূর হতে মনে হয় বুঝি ভালুকীর পিঠের পিছন দিকের অংশ খুব ফুলে উঠেছে। বাঘিনী বিড়ালের মতো তার ছোট বাচ্ছার ঘাড়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় তা বোধ হয় তোমরা জান।

বাঘের কতগুলো নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস বা স্বভাব আছে যা জানা থাকলে অনেক সময় বোঝা যায় কোন বিশেষ অবস্থায় তার

কি রকম আচরণ হওয়ার সম্ভাবনা। ভালুক কিন্তু বাঘের চেয়ে একটু বেশী মানুষ-ঘেঁসা হ'লেও তার স্বভাব বা মেজাজ বাঘের চেয়ে বেশী অনিশ্চিত বলে আমার ধারণা। ভালুক যদিও মাংসাশী নয় তবুও কখন কখন বিনা কারণে হিংস্র হয়ে ওঠে এবং মানুষকে তেড়ে এসে আক্রমণ করে। বাঘ স্বভাবতই হিংস্র কারণ তার খাদ্যই হ'ল রক্ত আর মাংস। তা হ'লেও যে বাঘ "ম্যান্-ইটার্" (Man-eater) বা নরখাদক নয় সে বাঘ মানুষের দ্বারা উত্যক্ত না হ'লে মানুষকে বড় একটা আক্রমণ করে না। এই জানোয়ার বেশীর ভাগ লুকিয়ে থাকতে চায়, সহজে মানুষের চোখে পড়তে চায় না। যে বনে বাঘ আছে অথচ জানা আছে যে ঐ বাঘ ম্যান্-ইটার্ নয়, আমি সে বনে একা বন্দুক নিয়ে ঢুকতে সাহস করব। কিন্তু যে বনে এক জোড়া বড় ভালুক আছে জানি, সে বনে একলা ঢুকতে ইতস্ততঃ করব। এই "ম্যান্-ইটার্" বা নরখাদক কথাটা যখন বাঘের বিশেষণ হয় তখন এ একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঘ মাংসাশী ব'লে এবং বাঘদের শাস্ত্রে নরমাংস ভক্ষণের নিষেধ না থাকায় এক হিসাবে বাঘ মাত্রই নরখাদক। তবুও ম্যান্-ইটার্ বলতে এক বিশেষ স্বভাবের বাঘকে বোঝায় যার কথা এর পরে বলব। যেখানে ম্যান্-ইটার্ বাঘ আছে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে ঐ ভয়ঙ্কর জানোয়ারটি নাই সেখানে বৎসরে যত লোক বন্যজন্তু দ্বারা হত বা আহত হয় তার মধ্যে ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত লোকের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। জঙ্গলে ভালুকের সংখ্যা বাঘের অপেক্ষা বেশী, এটাও এর একটা কারণের মধ্যে বলতে হবে, কিন্তু ভালুকের

অনেক সময় মানুষের প্রতি অকারণ বিদ্বেষও যে একটি কারণ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

আক্রমণ করার সময় ভালুক প্রায়ই তার পিছনের পা দুইটার উপর ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ওঠে এবং গর্জ্জন করতে করতে নখ দিয়ে ছুলে ও দাঁত দিয়ে বিদীর্ণ ক'রে দেয়। তখন তার আকৃতি দেখতে যেমন ভীষণ, গর্জ্জনও তেমনি ভয়াবহ। আমাকে কয়েকবার ভালুকে আক্রমণ করেছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, স্পর্শ করার পূর্ব্বেই তাকে মারতে পেরেছি। যারা ভালুক নাচিয়ে পয়সা নেয় তাদের ভালুক তোমরা সকলেই দেখেছ। জঙ্গলের একটা পূর্ণ-বয়স্ক ভালুক তার চেয়ে অনেক বড় হয়। দাঁড়িয়ে উঠলে তার মুখ আমার মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, এমন ভালুক আমি দেখেছি এবং মেরেছি। আমার শিকারের সকলের চেয়ে বড় ভালুকটার চামড়া আমি কলিকাতার একটি বিখ্যাত বিলাতী দোকানে "কিওর" (cure) বা পরিষ্কার ক'রে তৈরী করতে দিয়েছিলাম, তারা ঐ চামড়া দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কোথায় ঐ ভালুক মারা হয়েছে এবং বলেছিল যে অত বড় ভালুকের চামড়া তারা ভারতবর্ষে তার পূর্ব্বে আর পায়নি বললেই হয়।

ভালুকে এইরূপ দাঁড়িয়ে উঠে আক্রমণ করে ব'লে ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত অনেক লোকের নাক মুখ ক্ষত বিক্ষত হয় এবং তারা জন্মের মত কাণা বা বিকৃত-মুখ হয়ে যায়। মাথায় মুখে শুকিয়ে যাওয়া পুরাণো ক্ষত-চিহ্ন-যুক্ত এবং ঐ কারণে বিকৃত-মুখ লোক ঐ অঞ্চলে নিতান্ত বিরল নয় এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাওয়া যায় যে তারা কোন সময়ে জঙ্গলে ভালুকের

দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ভালুকের এই স্বভাব ভারতের মহাকবি কালিদাস জানতেন। তাই তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে মহারাজ দুষ্মন্তের ভীরু বয়স্যের মুখে ভালুকের বর্ণনার সময় "নরনাসিকালোলুপ" কথাটি ব্যবহার করেছেন।

একবারকার ভালুকের আক্রমণের গল্প বলি। এর মধ্যে হাসির ব্যাপারও কিছু আছে। ক্যাম্পে আছি, এক প্রাতঃকালে সংবাদ পেলাম একটা ছোট পাহাড়ে সেই দিন ভোরের বেলায় একটা খুব বড় ভালুককে দেখে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাকে তাড়া না দিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভালুকটা বড় শুনে আমি অসুস্থ অবস্থাতেও চার মাইল পথ হেঁটে সেই গ্রামে উপস্থিত হলাম। দেখলাম গ্রামের একদিকে বসতির সঙ্গে সংলগ্ন ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়টি বনে ঢাকা, বনে অনেক মহুল গাছ। তখন মহুল ফুলের সময়। খুব ভোরে যখন গ্রামের কয়েকজন স্ত্রীলোক মহুল ফুল কুড়ুতে পাহাড়ে উঠেছিল, তখন তারা কিছু দূরে একটা গাছের তলায় ভালুক দেখতে পেয়ে চুপচাপ পালিয়ে এসে গ্রামে সংবাদ দেয়। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলল যে তখনও ভালুকটা পাহাড়েই আছে, কারণ পাহাড়ের অপর দিকে সমতল ভূমিতে যে বড় বন আছে সেই বনে যাতে সে চলে যেতে না পারে সেইজন্য গ্রামের অধিকাংশ লোক সেই দিকটা পাহারা দিচ্ছে। আমি সেই দিকে গিয়ে দেখলাম যে পাহাড়ের তলা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সেই বড় বনটা আরম্ভ হয়েছে এবং মাঝখানের এই পঞ্চাশ গজের ভিতর দু'একটা বড় গাছ ছাড়া আর কোন গাছ নাই। পাহাড়ের অপর কোন দিকেও নিকটে বন নাই, সুতরাং বোঝা

গেল যে তাড়া পেলে ভালুক পাহাড় থেকে ঐ ফাঁকা জমির উপর দিয়ে গিয়ে বড় বনে ঢুকবে। সেখানে যারা অপেক্ষা করছিল তাদের প্রায় সকলেরই হাতে কোন না কোন অস্ত্র আছে দেখলাম। তাদের কেউ কেউ বলল যে তারা একবার নীচে থেকে পাহাড়ের উপরে ভালুকটাকে দেখতে পেয়েছিল, ভালুকটা খুব বড়।

আমি ঐ সব লোকদের বলে দিলাম তারা যেন পন্থা ধ'রে তাদের গ্রামের দিক থেকে পাহাড়ে ওঠে। তখন অধিকাংশ লোকই চলে গেল, কেবল ৭।৮ জন আমার কাছে রয়ে গেল। তাদেরও যখন যেতে বললাম তখন তারা বলল যে তারা আমার কাছে থাকতে চায়, পাছে আমার কোন বিপদ ঘটে সেইজন্য। আমি বুঝলান যে তারা ঐ অছিলায় শিকার দেখতে চায়। আমি বনের ধারে দাঁড়ালাম একটা মেগাজিন্ রাইফল্ নিয়ে, আর একটা সাদা জোড়নলীতে দুইটা কার্ত্তুস্ ভরে দিয়ে আমার সঙ্গের একজন সাহসী পিয়নের হাতে দিলাম, সে আমার কাছে দাঁড়াল। গ্রামের ঐ ৭।৮ জন লোক আমার পিছনে জঙ্গলের ভিতর দাঁড়াল। বিট্ আরম্ভ হ'ল। খানিক পরে দেখলাম যে ভালুকটা পাহাড়ের উপর থেকে বনের দিকে নেমে আসছে। ঘন গাছের ভিতর দিয়ে নামছে, বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে না বলে মনে করলাম যে ভালুক নীচে নেমে খোলা জায়গায় এসে পড়লে ফায়ার্ করব। নেমে এসে যখন প্রকাণ্ড ভালুকটা আমার কাছ থেকে প্রায় ৪০ গজ দূর দিয়ে বনের দিকে মুখ ক'রে যাচ্ছে, তখন পাশ থেকে গুলী করবার সুবিধা পেয়ে ফায়ার্ করলাম, সে পড়ে গিয়ে একটা দীর্ঘ আর্ত্তনাদ ক'রে চুপ

করল, ভাবলাম মরে গেল। ঠিক সেই সময় সে হঠাৎ উঠে গর্জ্জন করতে করতে আমার দিকে ছুটে আসল। আমি তখন রাইফ্‌লের কুঁদোয় মাটির উপর ভর দিয়ে নলাটা ধ'রে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভালুকের পড়ার ধরণ দেখে মনে করিনি যে আবার উঠে আক্রমণ করতে পারবে। এমন কি দুর্বুদ্ধি বশতঃ আমার প্রথম ফায়ারের পর মেগাজিনের দ্বিতীয় কার্ত্তুস্ পর্য্যন্ত রাইফ্‌লের নলায় ভরিনি। যখন ভালুক ছুটে আসছে সেই সময়ে আমার চমক ভাঙ্গল। আমি রাইফ্‌ল্ তুলে দ্বিতীয় কার্ত্তুস্ ভরে লক্ষ্য করবার সময়ের মধ্যে সে আমার কাছ থেকে প্রায় পনের গজ মাত্র দূরে পৌঁছে গেছে, আর ছুটে আসতে আসতে এক এক বার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ানক গর্জ্জন করে হাওয়ায় থাবা মারছে। ইতিমধ্যে সেই পিয়ন তার বন্দুকের দুটো কার্ত্তুস্‌ই একসঙ্গে ফায়ার্ ক'রে দিয়েছে, কিন্তু সে তখন বিষম বিচলিত হয়ে পড়েছিল, একটা গুলীও লাগাতে পারল না। যখন ভালুক মাত্র দশ গজ দূরে আছে এবং সোজা দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই সময় আমি দ্বিতীয় ফায়ার্ করলাম বুকের মাঝখানটা লক্ষ্য ক'রে। ভালুক সেইখানে উল্‌টে পড়ে গেল, আর উঠল না।

তার পর পিছন দিকে চেয়ে দেখি একটি লোকও আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নাই, সব গাছের উপর উঠে পড়েছে। এই রকম ক'রে তারা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করত আর কি! আমি যখন হাসতে হাসতে তাদের সেকথা বললাম তারাও হেসে উত্তর দিল,—"বেড্ডে ডরলি বাবু," অর্থাৎ "বড় ভয় পেলাম বাবু।"

এই ঘটনা থেকে তোমরা যেন বুঝে নিও না যে ঐ দেশের

অনার্য্য লোকেরা সকলেই ভীরু। সময়ে সময়ে আমি তাদের অসাধারণ সাহসের পরিচয় পেয়েছি। সে গল্পও যথাস্থানে বলব। ভয় বা সাহস জিনিষটা অনেক সময় সংক্রামক। ভালুকে আক্রমণ করার সময় যদি ঐ লোকদের ভিতর দু'এক জন প্রথমেই এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াত, আমার বিশ্বাস তাদের ভিতর একটা লোকও তা হ'লে আর পালাতে চেষ্টা করত না। প্রথমেই ঐ দলের কোন লোক পালিয়ে যাছে ওঠায় অন্য লোকেরাও তাই দেখে ঐরূপ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

ভালুকের আর্ত্তনাদ শুনতে কতকটা মানুষের আর্ত্তনাদের মতো, আর সেটা শাঁক বাজানর মতো দীর্ঘ একটা শব্দ। ঐ শব্দ আমাকে অনেক সময়ে বিচলিত করত। কতকটা সেই কারণে ভালুক শিকারে শেষা-শেষি আমার আগ্রহ ছিল না।

আহত ভালুকের আর একটা আচরণ আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আহত ভালুক যদি গুলীর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে না যায় এবং জানতে না পারে যে কে তাকে আঘাত করল, আর যদি সে সময় তার কাছে অন্য ভালুক থাকে, তা হ'লে সে তৎক্ষণাৎ ঐ অপর ভালুককে কামড়ে দেয়, এমন কি যদি অপর ভালুকটা তার নিজের বাচ্ছাও হয়। সে ভাবে যে ঐ ভালুকই বুঝি তাকে আক্রমণ ক'রে আঘাত করেছে।

একদিন একটা ভালুকের আচরণে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের ধারে একটা ডুমুর বনের ভিতর রাইফ্‌ল্ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য্য কেবল মাত্র অস্ত গেছে, আর নিস্তব্ধ বনে অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে। দেখলাম দুইটা ভালুক পাহাড় থেকে ডুমুর বনে নেমে আসল। তার

মধ্যে যেটা বড় সেটা ভালুক, অপরটা ভালুকী। একটা গাছের আড়াল থেকে পুরুষ ভালুকটাকে গুলী করলাম। তৎক্ষণাৎ সে গর্জ্জন ক'রে পাশের ভালুকীকে কামড়ে দিল। ভালুকীটা একটা ছোট আর্ত্তনাদ ক'রে দু'চার হাত সরে গেল, তার পর আবার দৌড়ে এসে ভালুকের পাশে দাঁড়াল এবং যে দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল সেই দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। আমি আর দ্বিতীয় ফায়ার্ করলাম না। তখন ভালুকী যে ভাবে পুরুষ ভালুকটাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ভিতর চলে গেল তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। বেশ বুঝতে পারলাম যে ভালুকী বুঝেছিল যে ভালুক আহত হয়েছে এবং সে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে চায়। খানিকটা এগিয়ে যায় আবার ফিরে এসে ভালুকটার পাশাপাশি চলতে থাকে আর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন বলতে চায়—"ওরে শীঘ্র চলে আয়, পালাই, বড় ভয়ের জায়গা এ।" এই রকম ক'রে সে দেখতে দেখতে ভালুককে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের উপর বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি এমন তন্ময় হয়ে এই ব্যাপার দেখছিলাম যে দ্বিতীয়বার ফায়ার্ করার ইচ্ছাও আমার মনে উদয় হ'ল না। এ ও হতে পারে যে ভালুক দুইটা সতর্ক হয়ে উঠেছে, আর সন্ধ্যার সময় আমি একা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, পূর্ণবয়স্ক বড় একজোড়া ভালুককে এক সঙ্গে মারতে পারব না, এবং একটাকে মারতে মারতে অপরটা আমাকে দেখতে পেয়ে আক্রমণ করবে, এই আশঙ্কা অজ্ঞাতভাবে আমার মনে উদয় হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি যে একটা বড় ভালুক একটা বাঘের চেয়ে কম ভয়ানক নয় যদি বাঘ ম্যান্-ইটার্ না হয়। মাটিতে দাঁড়িয়ে একত্র একজোড়া

বড় ভালুক শিকার করতে গিয়ে অভিজ্ঞ শিকারীরও জীবন অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছে, এমন ঘটনা আমার ভালোরকম জানা আছে।

বনের হিংস্র বড় জন্তুদের মধ্যে ভালুকের প্রাণ অন্য জন্তুদের চেয়ে বেশী কঠিন ব'লে আমার বিশ্বাস। শরীরের স্থান বিশেষে সংঘাতিক ভাবে আহত হ'লে বাঘের যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ভালুকের মৃত্যু তার চেয়ে বিলম্বে হয় এই আমার অভিজ্ঞতা। আমি দেখেছি যে বুলেট্ ফুস্‌ফুস্ ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাবার পর বাঘ প্রায়ই আর বেশীদূর যেতে পারে না, শীঘ্র মাটিতে প'ড়ে তার মৃত্যু হয়, কিন্তু বড় ভালুক ঐরূপ আহত হয়েও মাটিতে পড়বার আগে অনেকদূর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে পারে। ভালুক ঐরূপ আহত হয়ে প্রায় এক মাইল দৌড়ে যাবার পর মানুষকে অক্রমণ করেছে এরূপ ঘটনা আমি জানি। বাঘের ক্ষিপ্রতা ভালুকের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা বাঘের চেয়ে ভালুকের বেশী, এ আমার দৃঢ় ধারণা। অবশ্য, একটা বড় বাঘের (Royal Tiger) দৈহিক শক্তি একটা বড় ভালুকের চেয়ে অনেক বেশী এবং এই দুই জানোয়ারের যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে শেষ পর্য্যন্ত ভালুকেরই মৃত্যু ঘটে থাকে। বড় বাঘ ক্ষুধার্ত্ত হ'লে ক্বচিৎ কখন ভালুক শিকার ক'রে তার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে, এবং তখনই এইরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। একটা মৃত রয়্যাল্ টাইগারের শবচ্ছেদ করবার সময় তার অন্ত্রের মধ্যে একটা ভালুকের বেশ বড় নখ পেয়েছিলাম। নখটা অন্ত্রের মধ্যে এক জায়গায় আটকে ছিল। নিশ্চয়ই ঐ বাঘ কোন সময়ে ভালুকের মাংস খেয়েছিল এবং খুব সম্ভব ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাকে ঐ খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

যে বাঘটার কথা এখনি বললাম তার বড় অদ্ভুত উপায়ে মৃত্যু ঘটেছিল, সেটা এখানেই বলি। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে খড়িয়া নামে এক জাতি আছে, এরা জঙ্গলের মানুষ বললেই হয়। এদের ভাষা ও চালচলন কোল সাঁওতাল হতে অত্যন্ত বিভিন্ন। বনজাত দ্রব্যের উপরই এদের জীবিকা নির্ভর করে। পর্ব্বত ও জঙ্গল হতে মধু, মোম, ধূনা, ময়না ও টিয়া বা চন্দনা পাখীর বাচ্ছা এবং বনজাত শটি বা পালো ইত্যাদি আহরণ ক'রে গ্রামে নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করা এদের প্রধান উপজীবিকা। জঙ্গলে এই সব জিনিষ সংগ্রহ ক'রে বেড়াবার সময় এরা পাহাড়ের গুহার মধ্যে, বা দল বেঁধে পাহাড়ের উপরে অল্পদিনস্থায়ী পাতার ছোট ছোট ঘর তৈরী ক'রে, বাস করে। জঙ্গলের কোথায় কি আছে তার সমস্ত সন্ধান এদের কাছে পাওয়া যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ ১০।১২ জন খড়িয়া ঐ রয়্যাল্ টাইগারের মৃতদেহ আমার বাসায় বয়ে নিয়ে এল। বাঘটা লম্বায় প্রায় ৯½ ফুট ছিল। খড়িয়াদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল যে আমার বাসস্থান থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে পাহাড়ের মধ্যে একটা নালার ধারে বাঘের মৃতদেহ তারা ঐ দিনই প্রাতে পেয়েছিল। আরও বলল যে পূর্ব্বদিন বৈকালে জঙ্গলে বেড়াবার সময় তারা বাঘকে ঐ খানেই শুয়ে ধীরে ধীরে লেজ নাড়তে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল, এবং পরদিন প্রাতে দূর থেকে গাছে উঠে দে'খে বুঝতে পেরেছিল যে বাঘটা মরে গেছে। এই কথা শুনে আমি মৃত বাঘের কাছে যেতেই ভয়ানক পচা গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। যেদিক থেকে বাতাস বয়ে আসছিল বাঘের সেই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নাকে রুমাল দিয়ে ভালো ক'রে

দেখতে লাগলাম। দেখলাম যে বাঘের শরীরের সম্মুখের দিকটা বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত, একটা মৃতদেহ পচে ফু'লে উঠলে যেমন হয়, সেই রকম ফুলেছে। মাথা আর মুখটা, অনেক দিনের পচা মাংসে যে রকম বড় বড় পোকা বা ম্যাগট্ (maggot) জন্মায়, সেই রকম পোকায় একেবারে আচ্ছন্ন, লোম পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বুক আর সুমুখের পা দু'খানার উপরেও অনেক পোকা চলে বেড়াচ্ছে। এই দেখে আমি খড়িয়াদের কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না যে তারা পূর্ব্বদিন বৈকালে ঐ বাঘকে জীবিত দেখেছে, কারণ কোন মৃতদেহে এক দিনের মধ্যে ঐ রকম বড় পোকা জন্মাতে পারে না। বাঘটার কি ক'রে মৃত্যু হ'ল তা জানবার জন্যও আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছিল। তখন একজন ডোমকে ডেকে তাকে নিয়ে বাঘের শরীর চিরতে বসে গেলাম। চামড়াটা শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিতেই বোঝা গেল কি ক'রে বাঘের মৃত্যু ঘটেছে। আরও বুঝতে পারলাম যে খড়িয়াদের কথা মিথ্যা নয় যে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় তারা বাঘকে জীবিত দেখেছে। চামড়া ছাড়ানতে দেখা গেল যে বাঘের মাথায়, মুখে, নাকে, সম্মুখের পা দু'খানায় ও বুকে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র হয়েছে এবং ঐ ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটার মধ্যে একটা ক'রে সজারুর কাঁটা ভেঙ্গে গিয়ে মাংসের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে রয়েছে, আর ঐ সব ক্ষতগুলোর মধ্যে পোকা কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে। মাংস কুরে কুরে খেতে খেতে পোকাগুলো নাকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ও তালুর ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথার খুলির ভিতর পর্য্যন্ত ঢুকে প্রায় মস্তিষ্ক স্পর্শ করেছে। বুকে ও

সম্মুখের পা দু'খানাতে যে সব ক্ষত ছিল সেগুলোর অবস্থাও ঐরূপ। সব ক্ষতগুলোই পচে উঠেছে এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়েছে। বেশ বোঝা গেল বাঘটা কোন বড় সজারু শিকার করেছিল এবং যখন সজারুর উপর লাফিয়ে পড়েছিল সেই সময় সজারু তার শরীরের কাঁটাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ায় অনেকগুলো কাঁটা বাঘের মুখে, বুকে এবং সামনের পায়ে ঢুকে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। ঐ সব ক্ষততে মাছি ব'সে পোকা জন্মেছিল আর পোকাগুলো ক্রমশঃ বড় হয়ে ক্ষতগুলোর ঐ ভীষণ অবস্থা ঘটিয়েছিল। বুঝতেই পারছ যে কতদিনে কত অকথ্য যন্ত্রণা পেয়ে তিল তিল ক'রে ঐ বাঘের মৃত্যু ঘটেছিল। তার শেষ অবস্থায় নালাতে জল খেতে গিয়ে সেখান থেকে আর উঠতে পারেনি এবং ঐ অবস্থায় খড়িয়ারা তাকে দেখতে পেয়েছিল। চামড়া ছাড়ানতে বাঘের বুক থেকে আরম্ভ ক'রে শরীরের নীচের অংশ বেশ ভালো অবস্থাতেই আছে দেখা গেল। ঐ অংশে কোন ক্ষত ছিল না বা পচার কোন লক্ষণ ছিল না, এমন কি অন্ত্রেও পচার চিহ্ন ছিল না। এতেই বোঝা যায় যে বাঘের জীবিত অবস্থাতেই তার শরীরের সম্মুখের অংশের ক্ষতগুলোতে পোকা হয়ে ঐ অংশ পচে উঠেছিল। সজারু শিকার করতে গিয়ে একটা রয়্যাল্ টাইগারের মৃত্যু হওয়া খুব একটা অদ্ভুত ঘটনা বটে। চোখে না দেখলে আমি এ বিশ্বাস করতে পারতাম না।

একটা প্যান্থার্ বা চিতাবাঘ কখনও ইচ্ছা ক'রে একটা পূর্ণ-বয়স্ক ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। সে শক্তি চিতাবাঘের নাই,—যদিও একটা পূর্ণ-বয়স্ক চিতাবাঘ

সহজে ভালুকের চেয়ে আকৃতিতে বড় একটা গরু মেরে ফেলতে পারে।

একদিন একজন সাঁওতাল সর্দ্দার (সর্দ্দার মানে যে অনেকগুলি গ্রামের প্রধানদের উপর কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা পেয়েছে) সংবাদ দিল যে তার নিজের গ্রামের কাছে একটা পাহাড়ে বোধ হয় তুইটা ভালুক যুদ্ধ করছে, কারণ দিনের বেলাতেই সেই পাহাড় থেকে তুইচার বার ঘন ঘন ভালুকের গর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেছে। সর্দ্দার বলল যে সে সেই পাহাড় এবং তার খুব নিকটস্থ আর একটা পাহাড়ের মাঝখানে মাচান তৈরী করবার জন্য এবং পাহাড় বিট্ করবার জন্য লোকের বন্দোবস্ত ক'রে এসেছে। সংবাদ পেয়ে আমি আমার একজন পরমাত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। তুইটা মাচান করা হয়েছিল, আমরা তুইজনে তুইটা মাচানে বসলাম। বিট্ আরম্ভ হওয়ার পর প্রথমে একটা ভালুক পাহাড় থেকে নেমে আমার মাচানের সম্মুখে খানিকদূরে খোলা জায়গায় দাঁড়ান মাত্রেই তাকে মারলাম। তার অল্পক্ষণ পরে একটা চিতা বাঘ নেমে এসে প্রায় সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার গুলীতেই পড়ল। তারপর বিটার্‌রা পৌঁছে গেল। পাহাড়ে বেশী ঘন বন ছিল না। বিটার্‌দের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল যে ঐ ভালুক আর বাঘ ছাড়া আর কিছু তারা দেখেনি। অন্য ভালুক থাকলে তাকেও নিশ্চয় সেদিন দেখা যেত। আমার বোধ হয় সর্দ্দারের গ্রামের লোকেরা ভালুকের যে গর্জ্জন শুনেছিল তা ভালুকে ভালুকে যুদ্ধের নয়। খুব সম্ভব ঐদিন পাহাড়ে বাঘে ভালুকে দেখা হতে ভল্লুকরাজ একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' বলে গর্জ্জে উঠেছিলেন এবং বাঘ

মহাশয় ব্যাপার বড় সুবিধা হবে না ভেবে আস্তে আস্তে সরে পড়েছিলেন।

ঐদিন দুইটা জানোয়ারই আমার গুলীতে পড়ল এবং আমার আত্মীয় একটিও শিকার পেলেন না, এতে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, কারণ তিনি সহরে থাকেন, প্রধানতঃ শিকার দেখা এবং শিকার করার উদ্দেশ্যেই আমার কাছে কয়েকদিনের জন্য এসেছিলেন।

ভালুক শিকারের আরও অনেক গল্প তোমাদের বলতে পারতাম, কিন্তু সে সব কতকটা একই ধরণের হবে সেইজন্য তা আর শোনাব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইবার বাঘের কথা বলব। এর আগেই বাঘের স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলেছি। এখন ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে চাই। গল্প করতে করতে সেগুলো বলতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা আগে বলে নেবার দরকার মনে করি।

বাঘ সাধারণতঃ দুইরকমের হয়ে থাকে। একরকম হচ্ছে বড় বাঘ বা রয়্যাল্ টাইগার্। এই বাঘের গায়ে কালো কালো লম্বা ডোরা দাগ থাকে। আর একরকম—চিতাবাঘ, যার গায়ে ডোরা দাগ থাকে না, সোনালী হল্‌দে জমির উপর কালো পশমের গোল ফুল কেটে দিলে যেমন হয় সেই রকমের দাগ থাকে। এদের ইংরাজী নাম লেপার্ড্ (leopard) বা প্যান্থার্ (panther)। কারো কারো মতে লেপার্ড্ এবং প্যান্থার্ ঠিক এক জাতির বাঘ নয়। তাঁদের মতে পার্ব্বত্য প্রদেশের চিতাবাঘ সচরাচর প্যান্থার্ জাতীয় আর সমতল প্রদেশের চিতাবাঘ লেপার্ড্ জাতীয় হয়ে থাকে, এবং তাঁরা বলেন যে প্যান্থারের মাথাগুলো লেপার্ডের মাথার চেয়ে অপেক্ষাকৃত একটু বড় এবং আকৃতিতে একটু বিভিন্ন হয়, আর প্যান্থারের রং লেপার্ডের চেয়ে বেশী হল্‌দে এবং সোনালী হয়। আমি যতগুলো চিতা-বাঘ মেরেছি তার সবগুলোই ঐ প্যান্থার্ জাতীয়, সেইজন্য শিকারের গল্পে আমি প্যান্থার্ কথাটাই ব্যবহার করব। চিতা-বাঘ রয়্যাল্ টাইগারের চেয়ে আকৃতিতে ছোট ও শক্তিতে অনেক

কম। ইংরাজীতে টাইগার্ বলতে রয়্যাল্ টাইগার্কেই বোঝায়, লেপার্ড্ বা প্যান্থার্কে নয়। কখন কখন কালো রঙের চিতা-বাঘ দেখা যায়। এইরূপ চিতাবাঘ অত্যন্ত বিরল। আলিপুরের চিড়িয়া খানায় সময়ে সময়ে ঐরূপ কালো রঙের বাঘ দেখেছি। ভালোরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায় যে ঐ বাঘের কালো চামড়ার উপরে তার চেয়ে বেশী ঘন কালো গোল গোল ফুলকাটা দাগ আছে।

একটা পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল্ টাইগার্ ন' ফুট থেকে সাড়ে দশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয় ও তার উচ্চতা তিন ফুট থেকে সওয়া তিন ফুট পর্য্যন্ত হয়। এর চেয়ে বড় টাইগার্ অত্যন্ত কম পাওয়া যায়,—আজকাল আর নাই বললেই হয়।

পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ সাধারণতঃ সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত ফুট লম্বা এবং তুই ফুট থেকে আড়াই ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। আমি পুরা আট ফুট লম্বা প্যান্থার্ও দেখেছি।

বাঘ কতখানি লম্বা তা মাপবার বিশেষ নিয়ম আছে। মাপ নিতে হ'লে মৃত বাঘকে মাটিতে কাত ক'রে এবং বেশ টান ক'রে শুইয়ে দেওয়া হয়। তার পর একটি টেপ্ বা ফিতা বাঘের নাকের আগা হতে লেজের শেষ সীমা পর্য্যন্ত মাথা ও পিঠ স্পর্শ ক'রে টেনে ধরলে যে মাপ পাওয়া যায় সেইটাই হচ্ছে বাঘের লম্বার মাপ। লেজ বাদ দিয়ে বাঘের লম্বার মাপ নেওয়া হয় না। একটা পূর্ণ-বয়স্ক রয়্যাল্ টাইগারের লেজ বাদ দিয়ে শুধু শরীরটা সাড়ে ছয় হতে সাত ফুটের বেশী লম্বা প্রায় হয় না।

বাঙ্গলা ভাষায় "বাঘ" কথাটার ব্যবহার অনেক সময় ঠিক

ভাবে করা হয় না। আমরা wolfকে নেকড়ে বাঘ আর Hyaenaকে হুঁড়ার বাঘ বলি। কিন্তু ঐ সব জন্তু টাইগার্ বা চিতাবাঘ যে জাতীয় জন্তু সে জাতিরই নয়। এদের শরীরের গঠন বাঘের চেয়ে বরং বেশীর ভাগ কুকুরের অনুরূপ।

আর একরকম জানোয়ারও আছে যাদের চলতি কথায় "চিতা" বলে কিন্তু "চিতাবাঘ" বলে না। এই চিতা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাদেশে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিমাংশে এই জন্তুর বাস। এদেরও শরীরের গঠন অনেকটা কুকুরের মতো। গায়ে কালো কালো গোল দাগ আছে এবং আকার প্রায় প্যান্থারেরই মতো বড়, কিন্তু পা'গুলো কতকটা কুকুরের পায়ের মতো সরু এবং নখ কুকুরের নখের মতো, অর্থাৎ কুকুরের নখ যেমন সর্ব্বদা আঙ্গুলের মাথায় বা'র হয়ে থাকে, ইচ্ছামত আঙ্গুল গুলোর মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে অদৃশ্য করা যায় না, সেই রকম। এরা সহজে পোষ মানে এবং এদের হরিণ শিকারে সাহায্য করতে শেখান হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে বাঘ জানোয়ারটি নিছক মাংসাশী। রক্ত মাংস ছাড়া আর কিছু এদের খাদ্য নয়। সেইজন্য জঙ্গল বিট্ করা ছাড়া অপর উপায়ে বাঘ শিকার করতে হ'লে এদের ঐ মাংসাহারের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেই শিকারের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। বাঘ যেখানে কোন জন্তু মেরে রেখে গেছে তার সন্ধান পেলে শিকারী তার নিকটে লুকিয়ে বসে থাকে, বাঘ পুনরায় সেই মড়ির মাংস খেতে আসলে তাকে শিকার করবে। অথবা জঙ্গলে কোন গৃহপালিত জন্তু, যেমন মহিষ, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি, বেঁধে দিয়ে তার নিকটেও লুকিয়ে ব'সে অপেক্ষা

করে, কখন বাঘ এসে ঐ জন্তুকে আক্রমণ করবে। কোন জীবিত জন্তু বেঁধে সেখানে বাঘের জন্য অপেক্ষা করলে কিন্তু অনেকটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ জঙ্গলেও বাঘ গণ্ডায় গণ্ডায় বেড়ায় না যে তাদের কোনটা না কোনটার নজরে অতি শীঘ্র ঐ জন্তু পড়বেই। যদি কোন বাঘ ঐ পথে বেড়াতে বেড়াতে এসে বাঁধা জন্তু দেখতে পায় তবেই তাকে আক্রমণ করবার সম্ভব। রাত্রির পর রাত্রি আমি ঐ রকম জন্তু বেঁধে বাঘের অপেক্ষায় বসে থেকে অনেক সময় নিষ্ফল হয়েছি। কিন্তু বাঘে মারা মড়ির কাছে বসে অধিকাংশ সময়ে বাঘ শিকারে সাফল্য লাভ করেছি, কারণ বাঘের স্বভাবই এই যে কোন জন্তু মেরে তাকে তখনই সম্পূর্ণ না খেতে পারলে তার নিকটে কোনখানে বিশ্রাম করে এবং পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত হ'লে এসে ঐ মড়ির মাংস খায়। এ কথা আমি তোমাদের আগেই বলেছি।

রয়্যাল্ টাইগারে মারা জন্তুর মৃত-দেহ বা মড়ি জঙ্গলের মধ্যে বা জঙ্গল-সংলগ্ন পতিত জমিতেও দেখা যায়, কিন্তু গ্রামের বসতির মধ্যে ঐরূপ মড়ি পাওয়ার কথা কখন শুনিনি। কিন্তু চিতাবাঘের মারা গৃহপালিত জন্তুর মড়ি গ্রামের বসতির মাঝ-খানে, এমন কি অনেক সময়ে গৃহস্থের গোহালে বা ঘরের ভিতরেও দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ এই যে রয়্যাল্ টাইগারের লোকালয়ে প্রবেশ করা স্বভাব নয়, কিন্তু চিতাবাঘ সর্ব্বদাই চোরের মতো রাত্রিবেলায় জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঢুকে মানুষের গৃহপালিত জন্তু আহারের জন্য হত্যা করে। জঙ্গল-প্রধান দেশে এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

গরু মহিষ ঘোড়া ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু ছাড়া পেয়ে চরতে চরতে যখন লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের ধারে বা জঙ্গলের মধ্যে চলে যায় তখনই রয়্যাল্ টাইগারের দ্বারা তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, যতক্ষণ গ্রামের মধ্যে থাকে ততক্ষণ নয়। কিন্তু ছোট গৃহপালিত জন্তু গ্রামের ভিতরে থেকেও অনেক সময় রাত্রিকালে চিতাবাঘের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। গ্রামের বসতির মাঝখানে মড়ির কাছে রাত্রিতে বসে আমি কয়েকবার চিতাবাঘ শিকার করেছি। ঐ রকম শিকারে অতিশয় সতর্ক হয়ে গুলী চালাতে হয়, যাতে গুলী নিকটের গৃহস্থদের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দুর্ঘটনা না ঘটায়। বসবার আগেই চারিদিক দেখে সতর্ক হয়ে এমন ভাবে বসতে হয় যাতে মড়ির দিকে লক্ষ্য ক'রে ফায়ার্ করলে গুলী কোন লোকের ঘরের দিকে চালিত না হয়। চিতাবাঘ গোহালে ঢুকলে একটি মাত্র জন্তু মেরে প্রায়ই ক্ষান্ত হয় না, একেবারে কয়েকটা মেরে রেখে যায়। তবে গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে যেগুলি খুব বৃহদাকার সেগুলিকে চিতাবাঘ প্রায়ই আক্রমণ করে না, যেহেতু তা চিতাবাঘের সামর্থ্যে কুলোয় না। একটা পূর্ণ-বয়স্ক মহিষকে চিতাবাঘে আক্রমণ করেছে এ আমি কখন শুনি নি। বড় জাতের পূর্ণ-বয়স্ক ষাঁড়ের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। একবার একটা বড় জাতের গাই গোয়ালের ভিতর একটি মাঝারি আকারের চিতাবাঘকে মেরেছিল এ আমার জানা ঘটনা। বাঘটা রাত্রিতে গোহালে ঢুকে ঐ গাই-এর বাছুরকে ধরে। গাই তেড়ে গিয়ে বাঘকে শিঙ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে চেপে ধরে। তখন বাঘের গোঙানিতে আর গোহালের ভিতর ছুটোপাটি

শব্দে বাড়ীর লোকেরা জেগে উঠে গোহালে এসে ঐ ঘটনা দেখে বাঘকে মেরে ফেলল।

রয়্যাল্ টাইগারের শক্তির সঙ্গে চিতাবাঘের শক্তির তুলনাই হয় না। রয়্যাল্ টাইগারের শক্তি এত বেশী যে তাদের কার্য্য-কলাপ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একটা পূর্ণ-বয়স্ক রয়্যাল্ টাইগার্ একটা বড় মহিষের শরীরের কোন অংশ কামড়ে ধ'রে তাকে আংশিক ভাবে পিঠে বহন ক'রে একটা পাহাড়ের নীচে থেকে পাহাড়ের মাথায় অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। রয়্যাল্ টাইগার্ মারবার উদ্দেশ্যে মাচানে বসতে হ'লে সে মাচানের উচ্চতা চৌদ্দ ফুটের কম হওয়া উচিত নয়। চিতাবাঘ মারবার জন্য মাচান আমি কখনও দশ ফুটের বেশী উঁচু করি নি।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের ম্যান্-ইটার্ বা নরখাদক বাঘের কথা বলেছি এবং এও বলেছি যে "ম্যান্-ইটার্" কথাটা বাঘের পক্ষে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। "ম্যান্-ইটার্" কথাটায় ঠিক কি বোঝায় তা এইখানে বলি। "ম্যান্-ইটার্" বাঘ মানে কোন বিশেষ জাতির বাঘ নয়। যে কোন বাঘ অবস্থা বিশেষে ম্যান্-ইটার্ হয়ে পড়তে পারে। ম্যান্-ইটার্ মানে যে বাঘ মানুষ ধ'রে খেতে "অভ্যস্ত" হয়েছে। বাঘ সচরাচর মানুষের সামনে বড় আসতে চায় না, আর জঙ্গলের কোন্ জানোয়ারই বা তা নয়? এ সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার পুত্র যখন নিতান্ত বালক তখন থেকে তাকে বন্দুকের ব্যবহার শিখিয়েছিলাম। ঐ সময়ে একদিন আমরা দু'জনে দুইটা বন্দুক নিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। একটা শিয়াল দৌড়ে যাচ্ছে দেখে ছেলে গুলী ক'রে তাকে মারল। তখন সে হৃষ্টপুষ্ট মৃত

শিয়ালটার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখে বলল,—"মানুষের চেয়ে ভয়ানক জীব আর নাই।" বেশ বুঝতে পেরেছিলাম কথাটা সে বই-পড়া থিয়েটারী কথা বলল না, মানুষের মনেও সংহারের প্রবৃত্তি যে কত বদ্ধমূল তা বড় গভীর-ভাবে অনুভব করেই বলেছিল। যাক্, যা বলছিলাম। জঙ্গলের ভিতর মানুষের সঙ্গে বাঘের দেখাদেখি হ'লে বাঘ অধিকাংশ সময়ে মানুষকে আক্রমণ না ক'রে সরে যায়, যদি সেই বাঘ ম্যান্-ইটার্ না হয়, একথা আমি পূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু যে বাঘ একবার মানুষের রক্ত ও মাংসের আস্বাদ পেয়েছে তার মানুষ ধরে খাওয়ার লোভ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং সে ক্রমশঃ ঐ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে প্রধানতঃ মানুষ শিকার করেই তার উদর-পূর্ত্তি করে, এবং সর্ব্বদা মানুষ শিকার করবার সুবিধা খুঁজে বেড়ায়। এইরূপ বাঘকেই ম্যান্-ইটার্ বা নরখাদক বলা হয়। এর মতো মানুষের পক্ষে ভয়ানক জঙ্গলের জানোয়ার আর নাই বললেই হয়। এই ম্যান্-ইটার্দের চতুরতা এত বেশী যে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের মানুষ শিকার করতে হয় কিনা! এদের চতুরতার গল্প ক্রমশঃ বলছি।

যতদূর জানা গেছে তাতে অনুমান হয় যে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বাঘ মানুষ-শিকারে অভ্যস্ত হয়। বাঘ যখন বৃদ্ধ হয় তখন তার ক্ষিপ্রতা ও সামর্থ্য কতকটা কমে যায় এবং তাদের নখ ও দাঁতের তীক্ষ্নতা কমে গিয়ে অনেকটা ভোঁতা হয়ে পড়ে, সুতরাং তখন তার পক্ষে জঙ্গলের জানোয়ার, যেমন হরিণ ইত্যাদি, শিকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় ক্ষুধার জ্বালায়

বেড়াতে বেড়াতে মানুষের নিকটস্থ হ'লে তাকে আক্রমণ ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার ইচ্ছা তার প্রবল হয়ে ওঠে এবং একবার মানুষ শিকার ক'রে খাওয়ার পর সে বুঝতে পারে যে মানুষ শিকার করা তার পক্ষে কত সহজ, কারণ মানুষ না পারে জঙ্গলের জানোয়ারের মতো দ্রুত পালাতে, না পারে শুধু হাতে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তখন থেকে তার কেবল চেষ্টা হয় কোথায় কেমন ক'রে মানুষ ধরবে। আমি সর্ব্বপ্রথমে যে ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্-টাইগার্ দেখেছিলাম তার বড় চারটা দাঁতই ক্ষয়ে গিয়ে খুব ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। সে জ্যান্ত থাকতে আমি অবশ্য তাকে হাঁ করিয়ে তার দাঁত দেখিনি, সে শিকারীর গুলীতে হত হওয়ার পর দেখে-ছিলাম। এই শিকারী আমার অগ্রজ, যাঁর কথা ইতিপূর্ব্বে তোমাদের বলেছি।

ঐ বাঘ শিকারের গল্পটি এইখানেই বলি। আমার দাদা তখন ছিলেন ময়ূরভঞ্জের সেট্ল্মেণ্ট্ অফিসার্। একটা বড় সাব্‌ডিভিসানের বন্দোবস্তের কাজ চলছিল। তার একটা অংশ জঙ্গল ও পাহাড়ে ভরা, যদিও ঐ জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম ছিল। বন্দোবস্তর আমিনেরা প্রত্যেক গ্রামে কাজ করছিল। ঐ সময়ে এই বাঘের উৎপাত আরম্ভ হয়। দুই চারিদিন অন্তর আজ এ গাঁয়ের কাছে, কাল সে গাঁয়ের কাছে বাঘে মানুষ ধরার সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল। ক্রমশঃ এমন হ'ল যে ঐ সমস্ত গ্রামের লোকদের জঙ্গলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। গ্রামের কাছে জঙ্গলের ধারে গরু ছাগল চরানও প্রায় বন্ধ হয়ে আসল, কারণ রাখালরাও একে একে ঐ বাঘের মুখে যেতে আরম্ভ করেছিল। আমিনেরা যে জঙ্গল-সংলগ্ন মাঠে

গিয়ে জরীপ ইত্যাদি করবে তাও বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল, যেহেতু গ্রামবাসীরা তাদের সঙ্গে যেতে সাহস করছিল না। এই খবর পেয়ে সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ অফিসার্‌ ঐ এলাকায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এক গ্রামে তাঁবু ফেললেন। গ্রামটির নাম আমার এখনও মনে আছে, —'চম্পাঝর'। তিনি প্রচার করে দিলেন যে বাঘের খবর পেলেই যেন তাঁকে জানান হয়। একদিন প্রায় দুই প্রহরে সংবাদ পেলেন যে পরবর্ত্তী 'কিরকিচ্‌-পাল' নামক গ্রামের একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঐ দিন সকাল বেলায় গ্রামের ধারেই জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি তখনই জনকয়েক স্থানীয় লোক নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন যে স্ত্রীলোকটির কাপড়খানা লম্বা হয়ে পড়ে আছে আর মাটিতে রক্তের দাগ রয়েছে। তাঁরা রক্তের দাগ অনুসরণ ক'রে অনেকটা দূর গিয়ে দেখলেন যে জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের উপরে ঐ দাগ চলে গেছে। পাহাড়ে উঠে একটু খোঁজার পরই বৃদ্ধার মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার খানিকটা মাংস বাঘে খেয়ে গেছে। তখনি সেই মড়ির কাছে একটা গাছে মাচান ক'রে শিকারী জোড়নলী রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে বসলেন। সঙ্গে একজন সাঁওতাল প্রধান বসল, বাকী লোকেরা গ্রামে ফিরে গেল। বসে থেকে থেকে যখন বেলা পড়ে এল, সূর্য্য যখন প্রায় অস্ত যাচ্ছে, তখন বাঘ ধীরে ধীরে সেই মড়ির কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। প্রথমে একটা পাথর খসার শব্দে শিকারী বুঝতে পারলেন যে বাঘ আসছে এবং তখনই বেশ সতর্ক আর একেবারে নিঃশব্দ হয়ে বসলেন। একটু পরেই বাঘকে দেখতে পেলেন, সন্তর্পণে চারদিক দেখতে দেখতে আসছে। সূর্য্যের শেষ

কিরণ বাঘের মসৃণ সোণালী গায়ের উপর পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল, তাতে তার সর্পিল গতিভঙ্গীকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। সে এসে মড়ির একেবারে কাছে ব'সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে তারপর তার শিকারের দিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে নিজের জিভ বা'র করে ঠোঁট চাটল। ঠিক সেই সময় শিকারী মুহূর্ত্তের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটা ফায়ার্‌ করলেন। বাঘ প্রথমে গুলীর আঘাতে পড়ে গেল এবং পরক্ষণে উঠেই ঘস্‌ড়াতে ঘস্‌ড়াতে গিয়ে অল্প কয়েক হাত দূরে একটা ঢিবির মত জায়গার সে-পাশে শিকারীর দৃষ্টি হতে অপসৃত হয়ে গেল। শিকারী পুনরায় রাইফ্‌লে কার্ত্তুস্‌ ভরে ফায়ার্‌ করবার সময় পেলেন না। এদিকে বন্দুকের শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা সকলে একত্র হয়ে হল্লা করতে করতে সেই পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হ'ল। শিকারী তাঁর মাচান থেকে, যেদিকে বাঘ অদৃশ্য হয়েছে তার বিপরীত দিক দিয়ে ঐ লোকদের চ'লে আসবার জন্য বললেন। তারা আসবার পর শিকারী মাচান থেকে নেমে যেদিকে বাঘ চলে গেছে খুব সতর্ক হয়ে রাইফল্‌ নিয়ে সেই দিকে গিয়ে দেখলেন যে ঢিবিটার ও-পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা খাদের মধ্যে বাঘটা পড়েছে এবং বোধ হ'ল মরে গেছে। তার গায়ে কয়েকটা পাথর ফেলাতেও যখন সে নড়ল না তখন গ্রামবাসীরা নীচে নেমে সেই খাদ থেকে মৃত বাঘকে বয়ে নিয়ে আসল এবং শিকারীর তাঁবুতে পৌঁছে দিল। দেখা গেল যে রাইফ্‌লের গুলী বাঘের সম্মুখের পা দু'খানার একটু পশ্চাতে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে বুকের মধ্যে ঢুকেছে। সেই সন্ধ্যাবেলাতেই সেই এলাকার সর্ব্বত্র ঐ ম্যান্‌-ইটার্‌ মারার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সন্ধ্যার পর থেকেই

লোকে—স্ত্রীপুরুষে—নির্ভয় হয়ে দূর দূরান্তর গ্রাম থেকে দলে দলে মাদল বাঁশী ইত্যাদি বাজনা বাজিয়ে বাঘ দেখতে এবং শিকারীকে "জোহার" (করযোড়ে প্রণাম) করতে আসল ;—এবং সমস্ত রাত্রি তাদের নিজেদের প্রথামত দলে দলে স্ত্রীপুরুষে নাচ গান ক'রে কাটিয়ে দিল। ঐ বাঘ লম্বায় পুরা দশ ফুট ছিল এবং অল্পায়াসলব্ধ মানুষের মাংস খেয়ে খেয়ে সে বেশ মোটা হয়ে উঠেছিল। এইরূপে ঐ প্রসিদ্ধ শিকারী মহাভয় হতে ঐ এলাকার লোকদের রক্ষা করেছিলেন।

বৃদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বাঘ ম্যান্-ইটার্ হয়। এমন অনেক দেখা গেছে যে পুরা জোয়ান বয়সের বাঘও ম্যান্-ইটার্ হয়েছে। এটাও সাধারণতঃ ঐ খাদ্যাভাবেই ঘটে থাকে ব'লে অনেকে মনে করেন। জঙ্গলে প্রত্যেক বাঘের নিজের শিকার খুঁজে চ'রে বেড়াবার এক একটা নির্দ্দিষ্ট এলাকা থাকে। এই এলাকা ছোট জায়গা নয়, এবং এই রকম এলাকা আয়তনে চল্লিশ পঞ্চাশ বর্গমাইল বা তার বেশী হতে পারে। সচরাচর বাঘ আপন এলাকার বাহিরে যায় না। যদি কোন কারণে ঐ এলাকায় বাঘের খাদ্যের অর্থাৎ তার শিকারের জন্তুর অভাব হয় তা হ'লে ক্ষুধার তাড়নায় সে দু'একটা মানুষ ধরে খেতে খেতে শীঘ্র রীতিমত ম্যান্-ইটার্ হয়ে দাঁড়ায়। কোন জঙ্গলে কোন কারণে মানুষের গতায়াত বেশী হ'লে হরিণ ইত্যাদি ভীরু জন্তু সেই জঙ্গল থেকে ক্রমশঃ সরে যায়, আর সেই সঙ্গে বাঘে মানুষে দেখাদেখি হওয়ার বেশী সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থাতে বাঘের পক্ষে মানুষ ধরতে আরম্ভ করা বিচিত্র নয় এ তোমরা সহজেই বুঝতে পার। এই রকমে ম্যান্-ইটার্

হওয়া, রয়্যাল্ টাইগারের সম্বন্ধেই বেশী শোনা যায়। চিতাবাঘ বা প্যান্থার্ ঠিক এ ভাবে ম্যান্-ইটার্ হয় কি না সন্দেহ। আগেই বলেছি যে মানুষের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়্যাল্ টাইগারের চেয়ে বেশী আর মানুষের গৃহপালিত জন্তুর উপর লোভও বেশী এবং সেইজন্য লোকালয়ে যাতায়াতও এদের পক্ষে অতিশয় সাধারণ ব্যাপার। সুতরাং এদের ম্যান্-ইটার্ হওয়া খাদ্যাভাবের বড় একটা অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয় না। এইজন্য অনুমান হয় যে কোন পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ কোনও বিশেষ অবস্থায় যদি হঠাৎ একবার কোন মানুষ মেরে খায় তা হ'লে মানুষের রক্ত ও মাংসের আস্বাদ পেয়ে সে ক্রমশঃ ম্যান্-ইটার্ হয়ে ওঠে। রয়্যাল্ টাইগারের সম্বন্ধেও একথা যে খাটে না তা নয়।

কখন কখন এমন ঘটে যে ম্যান্-ইটার্ বাঘিনীর বাচ্ছা তার মা'র সঙ্গে থেকে মানুষ শিকার করা দেখতে দেখতে ক্রমে বড় হয়ে মানুষ শিকারে অভ্যস্ত হয়। এরা অল্প বয়স থেকেই ম্যান্-ইটারের স্বভাব পায়।

ম্যান্-ইটার্ টাইগার্ আর ম্যান্-ইটার্ প্যান্থারের স্বভাব এক নয়, অনেক বিভিন্ন। এর প্রধান কারণ, রয়্যাল্ টাইগার্ শিকার ধরতে একেবারে লোকালয়ের মধ্যে বড় একটা ঢোকে না,—আর চিতাবাঘ প্রায়ই শিকার ধরবার জন্য মানুষের আবাসে চোরের মত ঢোকে, তা সে শিকার গৃহপালিত জন্তু হোক বা মানুষ হোক। এর ফল দাঁড়ায় এই যে,—যে জঙ্গলে ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগার্ আছে, তুমি যদি সেই জঙ্গলে না ঢোক বা সেই জঙ্গলের ধারে না যাও, তা হ'লে তোমার ঐ বাঘের কবলে পড়ার সম্ভাবনা নাই বললেই হয়। কিন্তু কোনও ম্যান্-ইটার্

চিতাবাঘের উপদ্রবের এলাকার মধ্যে অবস্থিত গ্রামে ঘরের ভিতর থেকেও যে ঐ বাঘের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যেখানে ম্যান্-ইটার্ চিতাবাঘের উপদ্রব হয় সেখানে গ্রামবাসীরা তাদের ঘরের ভিতরে থেকেও রাত্রিতে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে। ঘরের দরজা খোলা থাকলে বাঘ ঘরের মধ্যে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যায়। পূর্ণ বয়সের মানুষকে অনেক সময় নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মেরে রেখে যায়। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদেরই ধরে নিয়ে খায়। এরা ঘুমন্ত মানুষকেই অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে। আমার এরকম ব্যাপার জানা আছে যে ম্যান্-ইটার্ চিতাবাঘের উপদ্রবে কোন জঙ্গল এলাকার কয়েকখানা গ্রামে এত বেশী শিশু হত হ'ল যে সেই সব গ্রামের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ম্যান্-ইটার্ চিতাবাঘ রাত্রিতে গ্রামে ঢুকে লোকের বাড়ী বাড়ী মানুষ শিকার খুঁজে বেড়ায়, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে লোক রয়েছে আর বাঘ এসে বাহির থেকে দরজা আঁচড়ে পরখ ক'রে দেখেছে যে ঘরে ঢুকতে পারবে কিনা,—এ আমি কয়েক বার দেখেছি। গৃহস্থ ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে সেই আঁচড়ানর চিহ্ন আর তার সঙ্গে দরজার কাছে বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়েছে! ঐ সব গ্রামে সন্ধ্যার পর থেকেই গ্রামবাসীদের মহা ভয় উপস্থিত হয়, কারণ ঘরের কাছে কোথায় বাঘ এসে লুকিয়ে বসে থাকবে আর সুবিধা পেলেই মানুষ, বিশেষতঃ ছেলেমেয়ে, ধরে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যার খানিকটা পরেই ম্যান্-ইটার্ প্যান্থার্

শিকারান্বেষী প্যান্থারের ভীষণ সতর্ক দৃষ্টি, (১০০ পৃষ্ঠা)।

ঘরের ভিতর ঢুকে ঘুমন্ত মানুষ মেরেছে এ রকম কয়েকটা ঘটনা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আমার অত্যন্ত পরিচিত একজন সাঁওতাল প্রধান এই ভাবে হত হয়েছিল। তার বাড়ী ছিল গ্রামের একেবারে মাঝখানে, বসতির ভিতর। শীতকালে রাত্রি আটটার সময় সে তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল, সেই অবস্থায় তাকে বাঘে ধরল। চীৎকার ক'রে ওঠায় তার ঘরের এবং পাশের বাড়ীর লোকেরা ছুটে এল। বাঘ পালাল বটে, কিন্তু প্রধান বাঁচল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হ'ল। বাঘ তার ঘাড় কামড়ে ধরেছিল এবং তাতে তার মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লাগায় অত শীঘ্র তার মৃত্যু হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আরো দু'একটা ঘটনা তোমাদের এর পরে বলব।

এই সব কারণে ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগারের চেয়ে ম্যান্-ইটার্ চিতাবাঘ মানুষের পক্ষে বেশী ভয়ানক। তবে এক বিষয়ে ম্যান্-ইটার্ চিতাবাঘ কতকটা মন্দের ভালো এইজন্য যে বেশী মানুষঘেঁষা বলেই ঐ বাঘ প্রায়ই বেশী দিন জীবিত থাকতে পারে না। শীঘ্রই মানুষের হাতে তাকে মরতে হয়। মানুষে প্রায়ই তাকে কিছুদিনের মধ্যে খুঁজে বা'র ক'রে ধ্বংস করে। অধিকাংশ সময়ে ঐ বাঘে মারা মড়ির নিকটেই অপেক্ষা ক'রে শিকারী বাঘকে মারতে পারে। ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগারের উপদ্রবের স্থান সচরাচর লোকালয়হীন বিস্তীর্ণ জঙ্গল। ঐ জঙ্গলে যে সব মানুষ কোন কাজে ঢোকে বা জঙ্গলের ভিতরের পথ ধ'রে চলে, সেই সব মানুষই অবস্থা বিশেষে ঐ বাঘের ভক্ষ্য হয়। সেইজন্য ঐ জানোয়ার শিকারী মানুষের পক্ষে খুব সহজলভ্য হয় না, বিশেষতঃ যখন মানুষের

সঙ্গে ভক্ষক ও ভক্ষ্যের সম্বন্ধ নিয়ে কারবার করতে করতে বাঘ বেশী চতুর হয়ে ওঠে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাঘের চতুরতাকে ব্যর্থ করবার উপায় অবলম্বন ক'রে অনুসন্ধান করতে করতে হয়ত অনেক দিনের পর ঐ বাঘের সঙ্গে দেখাদেখি হওয়ার সৌভাগ্য শিকারীর ঘটে। এই কারণে ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগার্ বৎসরের পর বৎসর তার নিজের এলাকার মধ্যে মানুষ মেরে চলেছে এবং শিকারীর শত চেষ্টা ব্যর্থ করে বেঁচে রয়েছে এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে এ সম্বন্ধে যার কথা মনে করলে আমার এখনও কষ্ট বোধ হয়। আমার অধীনস্থ এক সাব্-ডিভিসানে ঐরূপ একটা বাঘ বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ মারত। আমি দুই বৎসর ধরে তাকে অনুসরণ ক'রে মারতে চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য্য হইনি। এই চেষ্টার বিবরণ বিস্তৃত ভাবে সব লিখলে সেইটাই একটা বই হয়ে যায়। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে যেখানে যেখানে সে মানুষ মেরেছিল সেই স্থান যদি আমার অবস্থানের বার চৌদ্দ মাইলের মধ্যেও পড়ত, তা হ'লে যে অবস্থায় থাকি না কেন সংবাদ পেলেই তৎক্ষণাৎ সেইখানে উপস্থিত হয়ে মাচান ক'রে মড়ির উপরে বসে কয়েক রাত্রি উপর্য্যুপরি কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু ঐ বাঘকে পাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটেনি। আমার ঐ সাব্ডিভিসন্ ত্যাগ করার পরে অন্য বিখ্যাত শিকারী ঐ বাঘ শিকার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও আমার মতোই অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। এর কারণ এই যে বাঘটা এত চতুর হয়ে উঠেছিল যে মড়ির নিকট মাচান ক'রে বসলেই সে জানতে পারত এবং কখনই সেই মড়ির

কাছে আর আসত না। কিছু দিন পরে ঐ এলাকায় গভীর জঙ্গলে পাতা একটা বড় কলখাঁচায় প্রকাণ্ড এক রয়্যাল্ টাইগার ধরা পড়ে। তার পর থেকে এই ম্যান্-ইটারের উপদ্রব থেমে গিয়েছিল। তাতেই অনুমান হয় যে কলখাঁচায় ধরা বাঘটাই ঐ ম্যান্-ইটার্ ছিল। কলখাঁচায় একটা ছোট মহিষকে টোপ স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল।

কি ক'রে বাঘ এই চতুরতা অর্জ্জন করে শোন। জঙ্গলের জানোয়ার যারা মাটিতে চরে বেড়ায়, বিশেষ কারণ না ঘটলে,—যেমন কোন শব্দের দ্বারা বা দৃশ্যের দ্বারা তাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট না হ'লে, সে সব জন্তু সাধারণতঃ উপরের দিকে তাকায় না, এবং এই জন্যই মাচানের উপর নিশ্চল ভাবে ও নিঃশব্দে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে সহজে তাদের নজর পড়ে না। কিন্তু যে জানোয়ারকে শিকারী গাছের উপর থেকে বা মাচান থেকে মারবার জন্য দুই চার বার চেষ্টা ক'রে নিষ্ফল হয়েছে সেই সব জানোয়ার ক্রমশঃ বেশী সতর্ক হয়ে ওঠে আর তাদের ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন সন্দেহের কারণ ঘটলে তারা তাদের চারদিকে গাছের উপর বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখে যে কোন শত্রু উপস্থিত আছে কি না। এতটুকু সন্দেহ হ'লে এইরূপ সতর্ক ম্যান্-ইটার্ তার শিকার-মড়ির কাছে পুনরায় ফিরে আসে না। আগেই বলেছি যে বাঘ তার শিকার মেরে প্রথমে রক্ত ও খানিকটা মাংস খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য মড়ির কাছ থেকে সরে গিয়ে তার পর আবার মাংস খাবার জন্য সেখানে ফিরে আসে। যদি একদিনে সব মাংসটা না খেতে পারে তা হ'লে মাংস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দিনের পর দিন এসে ঐ মাংস খায়,

—যদি মড়ি খুব নির্জ্জন স্থানে থাকে আর যদি বাঘ কোন রকম বাধা না পায়। সুতরাং যে বাঘ এখনও সতর্কতা অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়নি, মড়ির উপর মাচানে ব'সে তাকে মারা কঠিন নয়, কিন্তু যে ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়েছে তাকে ঐরূপ উপায়ে মারা অত্যন্ত কঠিন। ঐ রকম বাঘই দীর্ঘকাল ধরে তার এলাকার মধ্যে মানুষ মেরে খেতে থাকে এবং শিকারী শত চেষ্টা করেও তার দেখা পায় না। ম্যান্-ইটার্ বাঘ যে মানুষ ছাড়া আর কিছু শিকার করে না তা নয়। গৃহপালিত পশু, যেমন গরু মহিষ ঘোড়া ইত্যাদি সুবিধামত পেলে শিকার করতে ছাড়ে না। ঐ সব জন্তু জঙ্গলের ধারে বা জঙ্গলের ভিতর চরতে গেলে ম্যান্-ইটার্ বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। ঐ রকম জন্তুর মড়ির কাছে ফিরে আসবার সময়েও ম্যান্-ইটার্ বাঘ ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে।

ঐরূপ সতর্ক একটা রয়্যাল্ টাইগারের চতুরতার গল্প বলি। আমার এলাকাধীন স্থানে যেখানে ম্যান্-ইটারের উপদ্রব হয়েছিল তার আশে পাশে যে সব গ্রাম ছিল সেই সব গ্রামের চৌকিদার-দের আমি একটা বিশেষ ট্রেণিং (training) বা শিক্ষা দিয়েছিলাম। কোনও মানুষকে বা গরু মহিষকে বাঘে মেরেছে খবর পেলেই সেই গ্রামের চৌকিদার তৎক্ষণাৎ তার নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামের চৌকিদারকে সেই সংবাদ দেবে এবং ঐ দ্বিতীয় চৌকিদার অবিলম্বে আমার কাছে সেই সংবাদ নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে প্রথম চৌকিদার তার গ্রামের লোকদের নিয়ে মড়ির কাছে গিয়ে মাচান তৈরী ক'রে রাখবে। মড়ি থেকে কত দূরে কি রকম স্থানে এবং কত উঁচুতে মাচান করতে হবে তা ঐ সমস্ত

চৌকিদারদের ভালো করেই শিখিয়েছিলাম। এইরূপ প্রত্যেকটা সংবাদের জন্য দুই টাকা ক'রে পুরস্কার দিতাম, ঐ টাকা দুইজন চৌকিদার ভাগ ক'রে নিত। সেই জন্য যথাসময়ে আমাকে সংবাদ দেওয়া সম্ভব হ'লেই তারা সে সম্বন্ধে অবহেলা করত না। একদিন প্রাতে এক চৌকিদার সংবাদ দিল যে পূর্ব্বরাত্রিতে তাদের গ্রামের একটা বড় গরুকে জঙ্গলের ভিতর বাঘে মেরেছে। জায়গাটা আমার বাসা থেকে ৮।৯ মাইল দূরে ছিল। আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া ক'রে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেলা প্রায় দুইটার সময় সেখানে উপস্থিত হলাম। যেখানে গরু মেরেছে সেখানটা গভীর জঙ্গলের ভিতর। সেখান থেকে চৌকিদারের গ্রাম প্রায় এক মাইল এবং ঐ গ্রাম ছাড়া কাছে আর কোন গ্রাম নাই। পূর্ব্বদিন গ্রামের অন্যান্য গরুর সঙ্গে ঐ গরুটি চরবার জন্য জঙ্গলে ঢুকেছিল, আর ঘরে ফিরে যায় নি। সকাল বেলা গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে জঙ্গলে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে গরুর মৃতদেহ দেখতে পায়। যেখানে গরুকে বাঘে ধরেছিল সে জায়গাটা একটা ছোট পাহাড়ের নীচে। সেখানে রক্তের দাগ ছিল, এবং তখন বর্ষাকাল থাকায় নরম মাটিতে গরুকে আক্রমণ করার সময়ে বাঘের পায়ের যে গভীর চিহ্ন পড়েছিল তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দেখেই বুঝতে পারলাম যে বেশ বড় রয়্যাল্ টাইগার্। ঐখানে গরু মেরে মড়িটাকে পাহাড়ের উপর নিয়ে গেছে। পাহাড়ের উপর মড়ির কাছে গিয়ে দেখলাম গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যে একটা গাছের উপর খাটিয়া বেঁধে মাচান তৈরী ক'রে ফেলেছে আর কয়েকজন মড়ি পাহারা দিচ্ছে। আমি তখনি সেই লোকদের সঙ্গে আমার ঘোড়া ও সহিসকে গ্রামে পাঠিয়ে

দিয়ে চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে মাচানে বসলাম। মাচানটা মড়ি থেকে প্রায় ৩০ হাত দূরে করা হয়েছিল। যে রকম নির্জ্জন গভীর বন তাতে সন্ধ্যার আগেই বাঘ মড়ির উপর আসবার সম্ভাবনা আছে বুঝে আমি তখনি মাচানে বসলাম।

মাচানে বসবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমি প্রথমে মাচানের ডান দিকে বনের ভিতর মৃদু খুস্-খাস্ শব্দ শুনতে পেলাম, যেন কোন ছোট জন্তু চলে বেড়াচ্ছে। দু'এক বার ঐ রকম শব্দ হয়ে থেমে গেল, আবার খানিকক্ষণ পরে ঐরূপ শব্দ হ'ল। এই রকমটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলল। বর্ষাকালের ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে ঐ দিকে কিছুই দেখতে পেলাম না। চৌকিদারও খুব সতর্ক হয়ে দেখেও কিছু দেখতে পেল না। শব্দ এত মৃদু যে কোন ছোট জন্তু যেমন খরগোস, বনমুরগী, ময়ূর বা কাঠ-বিড়ালীর চলার শব্দও হতে পারে। ঐ রকম কোন জন্তু হবে ভেবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল, অন্ধকার হয়ে আসল। সেটা কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি ছিল, তার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ফিস্ ফিস্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার অল্প পরেই বনের মধ্যে অন্ধকার এত গাঢ় হ'ল যে মড়ি দেখতে পাওয়া ত দূরের কথা আমার রাইফ্‌লের নলার মাথায় ফোর্‌সাইট্ পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না। এ আমি প্রায় ২৮ বৎসর আগেকার কথা বলছি। আজকালকার দিনের ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ ইত্যাদি তখন ভালো ওঠেনি। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে মড়ির উপর বসে শিকার করা তখনকার দিনে দুরূহ ব্যাপার ছিল। তখন কেবল জ্যোৎস্না রাত্রিতে, বা আকাশ নির্ম্মল থাকলে যে টুকু তারার আলো পাওয়া যায় সেই আলোতে ঐরূপ শিকার করা চলত।

নিবিড় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। সন্ধ্যার পর থেকেই সেই খুস্‌-খাস্‌ শব্দ বন্ধ হয়েছিল। রাত্রি প্রথম প্রহর প্রায় উত্তীর্ণ হ'লে আমার মনে হ'ল আর বসে থাকা বৃথা। সে স্থান লোকালয় হতে এতটা দূরে আর বন এত নির্জ্জন যে যদি মড়ির কাছে বাঘের ফিরে আসবার ইচ্ছা থাকত তা হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসত। এমন কখন কখন হয় যে কোন জন্তু মেরে রক্ত খাওয়ার পর সরে গিয়ে বাঘ যদি অপর কোন শিকার পায় তা হ'লে প্রথম শিকারের মড়ির কাছে দ্বিতীয়বার নাও ফিরে আসতে পারে। আমি ভাবলাম হয় ত তাই হয়েছে, সেইজন্য বাঘ আর এল না। তখন চৌকিদারকে বললাম, খুব জোরে হাঁক দিয়ে গ্রামবাসীদের ডাকতে। চৌকিদার মাচানের উপর দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে কয়েকবার ডাকার পর গ্রামবাসীদের উত্তর পাওয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ১৫।১৬ জন লোক মশাল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের তলায় এসে উপস্থিত হ'ল এবং আমি বলাতে তারা পাহাড়ে উঠে মাচানের কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গে দু'একটা কথা কওয়ার পর আমি মাচান থেকে নামবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় একটা শব্দ শুনে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। এই শব্দ জঙ্গলের ভিতর বড় জানোয়ার চলে বেড়ালে যেমন শব্দ হয় সেই শব্দ, আর শব্দটা মাচানের ডানদিক থেকে আসছিল,—যেদিক থেকে ইতিপূর্ব্বে খুস্‌খাস্‌ শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। বড় জন্তু চলার স্পষ্ট শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা বলল—"এই ত বাঘ রয়েছে।" আমি ভাবলাম—"তা'ত রয়েছে, এখন করা যায় কি? কেমন ক'রে

তাকে মড়ির কাছে আনি, আর কেমন করেই বা তার দেখা পাই ?” বুঝতে পারলাম আমাকে মাচানের উপর দেখতে পেয়েই ও এতক্ষণ মড়ির কাছে আসেনি, এখন লোকজন এসে পড়াতে বেচারা হতাশ হয়ে সরে পড়বার উদ্যোগ করছে। তখন এক ফন্দী আমার মাথায় উদয় হ'ল। এই ফন্দীর কথা তার আগে কোন ইংরাজী শিকারের বইতে পড়েছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাজে লাগাবার অবকাশ হয়নি। ফন্দীটা ঐ রকম সতর্ক বাঘকে ঠকাবার একটি কৌশল। সেটি এই :—

আমার উপদেশমত সেই গ্রামবাসীদের মধ্যে জন দুই লোক আলো নিয়ে মাচানের উপর উঠে এল এবং তার পরেই নেমে গেল। এই রকম দুই তিন বার করার পর তারা সকলে বেশ জোরে কথা কইতে কইতে যে রাস্তায় এসেছিল সেই রাস্তায় আলো নিয়ে ফিরে গেল। বলে দিয়েছিলাম যে যতক্ষণ গ্রামে না পৌঁছয় ততক্ষণ যেন কথাবার্ত্তা কওয়া বন্ধ না করে। চৌকিদারকেও বলেছিলাম যে গ্রামবাসীরা মাচান ছেড়ে যাওয়ার সময় থেকে যেন সে একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকে, এতটুকু না নড়ে। ভয় দেখিয়েছিলাম যে একটু নড়লেই তাকে মাচান থেকে নীচে ফেলে দেব। সে পাথরের মতো স্থির হয়েই বসে রৈল। আমিও তাই।

এটা করার উদ্দেশ্য বাঘকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মাচানের উপর যে পাজী লোকগুলো এতক্ষণ ধরে মড়ি আগলে ব'সে তার সঙ্গে বাদ সাধছিল তারা ঘরে চলে গেল। বাঘ বুঝলও তাই। গ্রামের লোকগুলি তখনও গ্রামে পৌঁছয় নি, অনেকদূর থেকে তাদের জোর গলার কথাবার্ত্তার আওয়াজ তখনও

বাতাসে ভেসে আসছে,—আর বাঘ একেবারে মড়ির উপর এসে উপস্থিত হ'ল।

ও দেশে যে সব গরু চরতে যায় তাদের গলায় কাঠের একরকম ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়, যাকে বলে 'ঘট্‌রা'। উদ্দেশ্য,—যে ঐ ঘণ্টার ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দে রাখালরা সহজে জঙ্গলের ভিতর গরু খুঁজে পাবে। ঐ মড়িটার গলায় একটি 'ঘট্‌রা' বাঁধা ছিল। বাঘ এসেই প্রথমে মড়িটাতে একটা টান দিল, আর তাতে 'ঘট্‌রা'টি খুব শব্দ ক'রে বেজে উঠল। আমার আগেকার উপদেশমত মড়ির একটি পা একটা গাছের সঙ্গে খুব শক্ত শিয়ালি লতার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ঐ লতার একটা মোটা দড়া এত শক্ত হয় যে তা দিয়ে হাতী বাঁধা যায়। বাঘের টানেও সে দড়ি ছিঁড়ল না। গাছটা বেশী মোটা ছিল না, টানের চোটে গাছ ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে কেঁপে উঠল। যখন টানাটানি করেও মড়িটাকে সরাতে পারল না তখন বাঘ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তার পর সেইখানেই বসে পট্‌ পট্‌ ক'রে মাংস ছিঁড়ে হুস্‌ হাস্‌ ক'রে খেতে লাগল আর কড়্‌মড়্‌ ক'রে হাড় চিবোতে লাগল। অন্ধকারে আমি বাঘ বা মড়ি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কেবল শব্দ শুনছিলাম। সে বোধ হয় এমন ভাবে বসেছিল যে তার চোখ দুটো আমার দিকে না থেকে অন্যদিকে ছিল, না হ'লে হয়ত অন্ধকারেও তার চোখ দেখতে পেতাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম যদি একবারও বিদ্যুৎ চমকায়, কিন্তু একবারও চমকালো না। ১০।১২ মিনিট বসে বসে ব্যাঘ্র ভোজনের (ব্রাহ্মণ ভোজনের মতো আর কি) শব্দ শুনতে লাগলাম। শেষটায় আমার আর ধৈর্য্য রৈল না, বিশেষ যখন

মনে হ'ল যে বাঘ হয়ত এখনও সন্দেহ করছে এবং মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে চুপ করে শুনছে। আন্দাজ ক'রে শব্দভেদী গুলী ছুড়লাম। বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড লম্ফের ভারী আওয়াজ, আর তার পরেই বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে যাবার শব্দ। অল্পক্ষণ পরে শুনলাম খানিক দূরে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ক'রে হাঁচবার শব্দ হ'ল। চৌকিদার তখন চুপি চুপি বলল, "হুজুর, বাঘের গায়ে গুলী লেগেছে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক'রে জানলে?" সে উত্তর দিল, "তার মুখ নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে সেই জন্য হাঁচ্ছে।" আমি হেসে বললাম—"গুলী লাগেনি। লাগলে একটু না একটু গর্জ্জন ক'রে উঠত। নিশ্চিন্ত হয়ে খাচ্ছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠায় মুখের ভিতরের খানিকটা খাবার বিপথে চলে গিয়ে নাকের মধ্যে ঢুকেছে, সেইজন্য হাঁচ্ছে।"

বন্দুকের শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা গোলমাল করতে করতে অনেক মশাল ও লণ্ঠন নিয়ে আবার পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়াল। আমি তাদের খুব সতর্ক হয়ে আসতে বলায় তারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে আর চীৎকার করতে করতে উপরে উঠে আসল। তখন আমি মাচান থেকে নেমে মড়ির কাছে গিয়ে মশালের আলোতে দেখলাম যে আমার গুলী ঠিক লক্ষ্যের দিকেই গিয়েছিল কিন্তু নলার মুখটা একটু বেশী নীচের দিকে ঝোঁকাতে গুলী বাঘের গায়ে না লেগে মড়ি থেকে প্রায় দুই হাত দূরে ভিতরের দিকে, অর্থাৎ মাচানের দিকে, মাটিতে আঘাত করেছে। অন্ধকার রাত্রিতে আন্দাজ ক'রে মারলে আর কত ভালো হবে?

আর বসা বৃথা জেনে তখনি গ্রামে ফিরে গিয়ে রাত

কাটালাম। প্রাতে পুনরায় মড়ির কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘ আর আসে নি। যেদিক দিয়ে বাঘ দৌড়ে গিয়েছিল সেদিকে গিয়ে নরম মাটিতে তার পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম।

বাঘের চতুরতা ব্যর্থ করবার যে ফন্দীর কথা বললাম সেই ফন্দীটা অবলম্বন ক'রে এই ঘটনার পরে আমি অনেকবার রাত্রিতে মড়ির উপর ব'সে বাঘ শিকারে কৃতকার্য্য হয়েছি। বিশেষতঃ যখন এরকম সন্দেহ করার কারণ ঘটে যে বাঘ জানতে পেরেছে যে মড়ির কাছে মানুষে অপেক্ষা করছে, তখন বাঘকে প্রতারিত করার ঐরকম কৌশল অবলম্বন করার নিতান্ত দরকার। সন্ধ্যার মুখে বা সন্ধ্যার পরে যদি মাচানে বসতে হয় তা হ'লে প্রথম থেকেই এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত,—বিশেষ যদি মড়ি লোকালয় থেকে দূরে থাকে, কারণ তখন ধরে নেওয়া উচিত যে বাঘ মড়ির অতি নিকটেই অপেক্ষা করছে এবং সম্ভবতঃ মানুষের সাড়া পেয়ে মড়ির কাছ থেকে অল্প দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ অবস্থায় যদি শিকারী এসে মাচানে বসে, আর তার পরেই সব চুপচাপ হয়ে যায় তা হ'লে বাঘের মনে এই সন্দেহ জাগার বেশী সম্ভব যে মানুষ এসে পাহারা দিতে বসল। ঐজন্য দরকার যে শিকারী মাচানের উপর বসার পর কয়েকজন লোক ঐ স্থান থেকে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে চলে যায়, ভাবটা এই যে যারা এসেছিল তারা সব চলে গেল।' এই রকম উপায় অবলম্বন ক'রে আমি অনেকবার দেখেছি যে ঐসব লোক চলে যাবার অতি অল্পক্ষণ পরেই বাঘ মড়ির উপর এসে উপস্থিত হয়েছে।

এইখানে বাঘের চালচলন সম্বন্ধে তোমাদের আরও দু'একটা

কথা বলতে চাই। এখনি যে গল্পটা বললাম তাতে একটু আধটু আভাস দেওয়া আছে, কিন্তু তা বোধ হয় তোমরা ধরতে পারনি এবং তা পারার কথাও নয়।

এই দেখনা,—বলেছি যে বাঘ এসে প্রথমেই মড়িটাকে জোরে এক টান দিল। এটা কেন করল? বাঘের স্বভাবই ঐ। কোন জন্তু শিকার করার পরই তার রক্ত এবং হয়ত বা খানিকটা মাংস খেয়ে সেটাকে রেখে সরে যাওয়ার পূর্ব্বে তাকে যথাসম্ভব গুপ্তস্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়া বাঘের স্বভাব। আমি দেখেছি যে প্যান্থারে ছোট জানোয়ার—যেমন ছাগল—মেরে এমন আশ্চর্য্যভাবে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেছে যে তুমি আমি যদি ঐ মরা ছাগলটাকে লুকোতে চেষ্টা করতাম তা হ'লে তার চেয়ে ভালো ক'রে ও কাজ করতে পারতাম না, আর তার পরে এও দেখেছি কত সন্তর্পণে চোরের মতো সে ঐ মড়ির কাছে ফিরে আসছে। এই হ'ল তার এক নম্বরের আচরণ। তার দু'নম্বরের আচরণ হচ্ছে যে সে মড়ির কাছে ফিরে এসে অধিকাংশ সময়েই মড়িটা সেখান থেকে আবার একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসে। এই সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে মড়ি ও বাঘ হয়ত মাচানে উপবিষ্ট শিকারীর দৃষ্টির বাহিরে চলে যেতে পারে, সেজন্য মড়িটা যাতে বাঘে না সরাতে পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করার দরকার। অত্যন্ত দৃঢ় দড়া দিয়ে মড়িকে কোন গাছে বা খোঁটার সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ দড়াকে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে তার চেহারা বদলে দিতে হয়। আর এক উপায় আছে। মড়ির পাঁজরা দু'টো যদি বাঘ না খেয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে

একটা গাছের শক্ত ডাল কেটে তার একটা দিক সরু ক'রে, পিন্ তৈরী ক'রে সেটা পাঁজরার ভিতর দিয়ে মাটিতে দৃঢ়ভাবে পুতে দিতে হয় এমনভাবে, যাতে পিনের মাথাটা মড়ির শরীরের উপরে বেরিয়ে না থাকে। এই সব করার এবং মাচান তৈরী করার সময়ে কিন্তু সাবধান হতে হয় যাতে বড় বেশী শব্দ বা গোলমাল না হয়। পিন্ পুততে হলে মুগুরের ঘায়ে দুম্‌দাম্ শব্দ না ক'রে মাটিতে গর্ত্ত ক'রে পোতাই উচিত।

গল্পটাতে আরও বলেছি যে অন্ধকারে আন্দাজে গুলী ছুড়লাম। প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্দাজ ক'রে ফায়ার্ করলেও লক্ষ্যটা করলাম কোথায়? মড়িটা ত একটা বড় গরু। আমার গুলী করবার সুবিধা ক'রে দেবার জন্য ত বাঘ এসে মড়ির সবটা ঢেকে তার উপর শুয়ে পড়ে খাওয়ার শব্দ ক'রে আমাকে গুলী করতে আহ্বান করবে না। এর উত্তর হচ্ছে যে মড়িটার যেখানে বাঘ প্রথমে খেয়ে গিয়েছিল যতদূর সম্ভব সেই জায়গাটা লক্ষ্য করেই গুলী ছুড়েছিলাম। কারণ, বাঘের স্বভাব এই যে যদি টাট্‌কা মড়ি হয় তা হ'লে দ্বিতীয়বার ফিরে এসে প্রথমে যে স্থানটা খেয়েছিল সেইখান থেকেই আবার খেতে আরম্ভ করে। এটাও বাঘের স্বভাব যে যদি শিকারের জন্তু ছোট না হয় তা হ'লে তার দেহের যে অংশটা সবচেয়ে নরম এবং সহজে ছেঁড়া যায় সেই অংশ থেকেই বাঘ সব প্রথমে খেতে আরম্ভ করে। ম্যান্-ইটার্ প্যান্থার্ কর্ত্তৃক নিহত দুইটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক আমি দেখেছিলাম। দু'বারই দেখেছি যে বাঘ স্ত্রীলোকটির স্তন সব আগে খেয়ে গেছে। যত সময় যায়, মড়ির অন্য অংশ পচতে আরম্ভ করে এবং তাতে মাংস নরম হয়ে বাঘের পক্ষে খাওয়ার সুবিধা হয়। মাচানে

বসবার সময় দেখেছিলাম গরুটার পেটের নরম মাংস বাঘ খেয়ে গেছে। গুলী করার পর মাচান থেকে নেমে দেখেছিলাম যে ঐ জায়গারই আরও খানিকটা তখনই খেয়ে গেছে; যার ফলে পাঁজরার দু'একখানা হাড় পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং দাঁতের চাপনে ভেঙ্গেছে। যখন চৌকিদারের ডাকে লোকেরা গ্রাম থেকে প্রথমবার আলো নিয়ে আমার মাচানের নীচে দাঁড়িয়েছিল এবং জানা গেল যে বাঘ নিকটেই চলে বেড়াচ্ছে তখন সেই আলোতে আমার রাইফ্‌ল্‌টাকে নিয়ে নানারকম ভাবে মড়ির খাওয়া অংশটাকেই লক্ষ্য ক'রে স্থির করতে চেষ্টা করেছিলাম যে রাইফ্‌ল্‌ ঠিক কি ভাবে ধরলে অন্ধকারেও ঐ অংশটার উপরেই ফায়ার্‌ করতে পারব। বন্দুকের গুলীটা লক্ষ্যের দিকে গিয়েছিল, মানে সেটা ঐ খাওয়া অংশটার দিকেই গিয়েছিল। বন্দুকের নলাটা যদি আর অতি সামান্য উঁচু ক'রে ফায়ার্‌ করতাম তা হ'লে খুব সম্ভব বাঘ আহত হ'ত।

একবার একটা গল্পে পড়েছিলাম যে একজন শিকারী রাইফ্‌ল্‌ চালনায় এমন সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন যে অন্ধকার রাতে বনের মধ্যে দূরে বাঘের ডাক শুনে তিনি শুধু ঐ ডাক সন্ধান ক'রে অব্যর্থ লক্ষ্যে বাঘকে শিকার করতে পারতেন। গল্পটি শুনতে বেশ আর খুব চমকপ্রদ, কিন্তু ওসব গল্প, গল্পই! অবশ্য এটা না বললে অন্যায় হবে যে গল্প-লেখক শিকারের গল্প বলতে বসেন নি; তিনি যে সুন্দর গল্পটি বলছিলেন তাকে গড়ে' তুলবার জন্য ঐ রকম একজন শিকারীকে গল্পের ভিতর আনবার দরকার হয়েছিল। আমার কিন্তু কত-গুলো বানান গল্প বলা উদ্দেশ্য নয় তা তোমাদের আগেই বলেছি। আমি বলছি তোমাদের সত্য ঘটনা, যা শুনে

তোমরা বুঝতে পারবে সত্য-সত্যই শিকারে কি রকম সব ব্যাপার হয়ে থাকে। আর এই সব ঘটনার মধ্যে যেগুলো আমার বিফলতার গল্প সেইগুলো আমি বেশী ক'রে বলতে চাই, কারণ সেইগুলোর মধ্যেই বেশী বিশেষত্ব আছে বলে আমার মনে হয়। আমার সফলতার গল্প আমি তোমাদের অনেক বলতে পারতাম কিন্তু তার অনেকগুলোই একরকমের, তাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। তাও দু'একটা যে না বলেছি বা না বলব তা নয়, কিন্তু সে খুব বেছে বেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যখন আমি প্রথমে শিকার করতে আরম্ভ করি তখন শিকারের সম্বন্ধে যত বই পেতাম, সবই আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। বলা বাহুল্য সে সমস্ত বই ইংরাজী ভাষায়, কারণ বাংলা ভাষায় তখন শিকারের বই ছিল না বললেই হয় এবং এখনও প্রায় তাই। ঐ সময় একখানা পুস্তকের গ্রন্থকার একটি ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগার্‌কে কি ক'রে শিকার করেছিলেন, তার বর্ণনা পড়েছিলাম। সেটা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। এটা পড়ে বুঝতে পারবে ঐ শিকারীর দৃঢ়তা এবং সাহস কি অসামান্য। আমার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গল্পটার ভিতর অতিরঞ্জিত বা অসম্ভব আজও কিছু দেখতে পাইনি। সেইজন্য গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। ঘটনার বিশেষ স্থান এবং লেখকের নাম আমার এখন মনে নাই। যতদূর স্মরণ হয়, ঘটনার স্থল দক্ষিণ ভারতবর্ষের কোথাও, বোধ হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে। গল্পটা এই :—

গ্রন্থকার সাহেব বড় জানোয়ার শিকারের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে আসেন এবং এ দেশের নানা স্থানে শিকার ক'রে বেড়ান। সঙ্গে জনকয়েক এদেশী অনুচর জুটিয়েছিলেন, যারা তাঁর মাহিনা-করা চাকর ছিল এবং শিকারে সাহায্য করত। ঐ সময়ে তিনি শুনতে পান যে এক জায়গায় কয়েক বৎসর ধরে একট ম্যান্-ইটার্ টাইগারের উপদ্রব হয়েছে। বাঘটা

নাকি সে পর্য্যন্ত চারশ'র উপর মানুষ মেরেছে এবং সরকার বাহাদুর তাকে মারবার জন্য পাঁচশ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বহু শিকারীর বহু চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে সে তখনও খোস মেজাজে আর বহাল তবিয়তে আপনার কাজ ক'রে যাচ্ছে। ঐ বাঘের উপদ্রবে তখন ঐ প্রদেশের বনের মধ্য দিয়ে যে সব বড় রাস্তা গেছে তাতে পর্য্যন্ত লোকের চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। মেল্-রাণার্দের উপর বাঘের ঝোঁকটা বেশী ছিল। একটার পর একটা অনেক গুলি মেল্-রাণার্ ঐ বাঘের কবলে যাওয়াতে, সরকারি ডাক বিভাগ, মেল্-রাণার্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট যে পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেছে, সে পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। বাঘ এত চতুর হয়ে উঠেছিল যে মানুষ শিকার ক'রে নিয়ে যাওয়ার সময় ছাড়া তাকে আর কখনও দেখা যেত না। মড়ির উপর বসে অপেক্ষা করা একেবারেই নিষ্ফল ছিল।

সাহেব এই সংবাদ পেয়ে ঐ বাঘের উপদ্রবের এলাকায় তাঁর লোকজন নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং অনেকদিন ধরে তাদের নিয়ে চেষ্টা করলেন কোন মতে বাঘের দেখা পান কি না, কিন্তু প্রথমটায় তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যখন তিনি বাঘের দেখা পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর অনুচরদের মধ্যে একজন বলল—"সাহেব তুমি এক কাজ করতে পার? তুমি মেল্-রাণার্ সেজে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে দৌড়ুতে পার? এই রকমে হয়ত বাঘের দেখা পাবে।" এই কথা শুনে সাহেবের অন্য অনুচরেরা তাকে গালাগালি দিয়ে বলল—"তোর কি

ইচ্ছা সাহেব বাঘের হাতে মরেন ?” বাস্তবিক এ কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারানরই বেশী সম্ভব। শিকার ধরবার সময় বাঘ সম্মুখ থেকে দেখাদেখি ভাবে প্রায়ই আক্রমণ করে না, সে লুকিয়ে আসে এবং অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে। ঠিক আক্রমণের মুহূর্তেই এই সাক্ষাৎ যমদূতকে হতভাগ্য শিকারের জীবটি দেখতে পায় এবং তখন তার আত্মরক্ষার কোন চেষ্টারই আর সম্ভাবনা থাকে না। এ প্রায়ই ঘটে থাকে যে দল বেঁধে সাবধান হয়ে মানুষ ম্যান্-ইটার্ টাইগারের এলাকার মধ্যে বনের পথে যাচ্ছে, আর তারা বুঝতে পারছে যে বাঘ তাদের অনুসরণ করছে, কিন্তু তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। যেতে যেতে তারা কখনও রাস্তার এক পাশে কখনও বা অপর পাশে বনের ভিতর বাঘের লুকিয়ে চলার খুস্ খাস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঐরূপ ক্ষেত্রে দলে পুরু না হয়ে যদি দু’একজন মাত্র পথিক হয় তা হ’লে শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মানুষ শিকারে যে বাঘ পাকা হয়ে উঠেছে সে ত ঐ রকম বনের রাস্তার ধারে ঝোপের বা আর কিছুর আড়ালে ওৎ পেতে শিকারের জন্য বসে থাকে, পথচলা মানুষ আসলে তার পাশ থেকে না হয় পিছন থেকে আক্রমণ করবে। সাহেবের কিন্তু এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও অনুচরের প্রস্তাবটা তাঁর বড় ভালো লাগল। তাঁর অন্যান্য অনুচরের নিষেধ উপেক্ষা ক’রে তিনি ঐটাকেই গ্রহণ করলেন। তাঁর সাহেবী পোষাক খুলে ফেলে, একজন সাধারণ এদেশী মেল্-রাণারের বেশ ধ’রে, পিঠে মেল্ব্যাগের মত ব্যাগ্ ঝুলিয়ে, কার্ত্তুস্ ভরা রাইফ্ল্টাকে মেল্-রাণারের বল্লমের মতো কাঁধে

তুলে নিয়ে, নিজের শরীরের কোথাও ঘুঙুর বেঁধে, ঝম্ ঝম্ করতে করতে যে রাস্তা দিয়ে আগে মেল্-রাণার্ ছুটত সেই রাস্তায় একা ছুটতে আরম্ভ করলেন। তোমরা যদি ভালো ক'রে ভেবে ঠিক জিনিষটাকে কল্পনা ক'রে নিতে পার তা হ'লে বুঝতে পারবে যে ব্যাপারটা কি ভয়াবহ আর শিকারীর ঐ কাজ কি শান্ত স্থির সাহসের (cool courage) পরিচায়ক। শিকারী ছুটছেন বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবে সজাগ তখন। যে দিকে তাঁর দৃষ্টি যাচ্ছে না সে দিকটাকেও যেন তিনি তাঁর সমগ্র অনুভব শক্তি দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়ের গোচরের মধ্যে আনতে চেষ্টা করছেন।

এই রকম কয়েকদিন ছুটে সাহেব বাঘের দেখা পেলেন না। কিন্তু তিনি হতাশ না হয়ে আরও কিছু দিন ঐ উপায় অবলম্বন করাই উচিত মনে করলেন। অবশেষে একদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর শবসাধনার ফল লাভ করলেন। বনপথে একাগ্রমনে ঝম্ ঝম্ শব্দ তুলে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পিছন দিকে খুস্ করে একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন যে কয়েক হাত মাত্র দূরে একটা বড় রয়্যাল্-টাইগার্ রাস্তার ঠিক উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তাঁর উপর লাফিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাহেবের রাইফ্ল্ গর্জ্জন ক'রে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যান্-ইটারের ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হ'য়ে গেল। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লে সাহেবেরই মানবলীলা শেষ হত।

ঐদিন হতে সেই এলাকায় আর ম্যান্-ইটারের উপদ্রব শোনা

গেল না। যেখানে ঐ বাঘ সাহেবের গুলীতে পড়েছিল সেই খানে গভর্ণমেণ্টের আদেশে একটি ছোট মনুমেণ্ট বা স্মারক স্তম্ভ নির্ম্মিত হ'ল।

আমি একবার একটা বাঘ শিকারে কিছু মুস্কিলে পড়েছিলাম, সেই সময় আমার সঙ্গের লোকদের মধ্যে একজনের কথামত কাজ ক'রে সেই মুস্কিল থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম। উপরে যে গল্পটা বললাম আমার শিকারের এই ঘটনার সঙ্গে ঐখানটাতেই তার একটু সাদৃশ্য আছে, সেই জন্য সে ঘটনাটা এইখানেই বলি।

ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে আমার এলাকাধীন স্থানে একবার একটা ম্যান্-ইটার্ টাইগার্ অনেকদিন ধরে অনেক মানুষকে হত্যা করে, আর আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে মারতে পারি নি। এটা আমার সেই বিফল চেষ্টা গুলোর মধ্যে একটার গল্প।

বাঘটার উপদ্রব যখন অতিশয় বেশী হয়ে উঠেছিল তখন ময়ূরভঞ্জের কর্ত্তৃপক্ষ তাকে মারবার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময়ে আমার উর্দ্ধতন একজন সিভিলিয়ান্ সাহেব কর্ম্মচারী ঐ বাঘকে মারবার জন্য একটি রীতিমত অভিযানের বন্দোবস্ত করেন, এবং তিনিই ঐ অভিযানের নেতা হয়েছিলেন। বাঘের উপদ্রবের জঙ্গল এলাকাকে চার ভাগ ক'রে তিনি এক ভাগ নিজের হাতে রাখলেন, অপর তিন ভাগ তিন জন শিকারীকে দেওয়া হ'ল, এবং ঐ তিন জনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগে জঙ্গলের মধ্যে আগে হতে মাচান তৈরী ক'রে সেই সব মাচানের কাছে মহিষ বা অল্প দামের ঘোড়া কিনে বাঁধতে লাগলাম, উদ্দেশ্য যে বাঘে কোন মহিষ বা ঘোড়া মেরে গেলে মাচানে গিয়ে বসব,

আর বাঘ পুনরায় মড়ির কাছে আসলে তাকে মারব। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল এ রকম উপায়ে ঐ ম্যান্-ইটার্‌কে পাওয়া যাবে না, কারণ মাচান দেখে খুব সম্ভব সে মাচানের কাছে বাঁধা মহিষ বা ঘোড়ার কাছে আসবেই না। তার আগে আমি কয়েকবার ঐ বাঘে মারা মানুষ মড়ির উপর মাচান ক'রে বসে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। যাই হোক, সাহেবের নির্দ্দেশমতে ঐ উপায়ই আমরা এখন অবলম্বন করলাম। ৪।৫ মাইল অন্তরে অন্তরে আমাদের ক্যাম্প্ পড়ল। জঙ্গল থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এক গ্রামে আমি তাঁবু ফেলে রৈলাম। প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় গ্রামের লোকেরা কয়েকজন একত্র হয়ে জঙ্গলে গিয়ে আমার বাঁধা মহিষটাকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস জল দিয়ে আসত। মহিষটা পূর্ণ-বয়স্ক ছিল না, কিন্তু নিতান্ত ছোটও ছিল না, এবং আমার ধারণা ছিল যে তাকে প্যান্থারে মারতে পারবে না।

এই রকম ৪।৫ দিন করার পর একদিন প্রাতে গ্রামবাসীরা মহিষ দেখে ফিরে এসে সংবাদ দিল যে পূর্ব্বরাত্রিতে মহিষকে বাঘে মেরে রেখে গেছে। ঐ সময়ে আমার ক্যাম্পে দুইটা হাতী ছিল। আমি জনকয়েক লোক সঙ্গে নিয়ে একটা হাতীতে চড়ে মড়ির কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম মড়ির পিছন দিকের খানিকটা নরম মাংস বাঘ খেয়ে গেছে। তখন গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টি না হওয়ায় কঙ্করময় মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। মহিষকে মারবার সময় বাঘের নখে স্থানে স্থানে মাটি খুঁড়ে গেছে বটে কিন্তু শক্ত মাটিতে বাঘের থাবার সম্পূর্ণ দাগ মড়ির কাছে দেখতে পেলাম না। তখন আমি নিকটে বনের মধ্যে চারপাশে খুঁজে

দেখতে দেখতে দেখলাম যে একটা সরু নালার ভিতর ভিজে মাটিতে বাঘের পায়ের সদ্য চিহ্ন রয়েছে। নালাতে ঝির্ ঝির্ করে জল বয়ে যাচ্ছে, মহিষ মেরে রক্তমাংস খেয়ে বাঘ সেখানে জল খেতে এসেছিল। থাবার চিহ্ন দেখে আমার মনটা দমে গেল, কারণ আমার আশা ছিল রয়্যাল্ টাইগারের জন্য, কিন্তু থাবাটা পূর্ণ বয়সের রয়্যাল্-টাইগারের মতো অত বড় নয়,—তবে প্যান্থারের হ'লে বেশ বড় প্যান্থারের বলে মনে হ'ল। রয়্যাল্-টাইগার্ না হয়ে ঐ জাতের বাঘিনী হতে পারে এই ভেবে মনকে একটু আশ্বাস দিলাম, কারণ বাঘিনীর থাবা বাঘের থাবার চেয়ে একটু ছোট হয়।

ইতিমধ্যে আমার আদেশমত সঙ্গের লোকেরা মাচানের চারদিকে যে পাতার বেড়া দিয়ে মাচানকে আড়াল ক'রে দেওয়া হয় সেটাকে নূতন পাতা দিয়ে মেরামত ক'রে দিল, কারণ বেড়ার পাতাগুলো এই তিন চার দিনে শুকিয়ে কতক কতক ঝরে পড়েছিল। আমি মাচানে গিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোকেরা চলে গেল। মাহুতকে বললাম হাতীকে জঙ্গলের বাহিরে নিয়ে গিয়ে কোন বড় গাছের তলায় ছায়াতে রাখতে। যে গাছে মাচান হয়েছিল সেটা বেশী বড় ছিল না, আমার মাথার উপর তার ডাল-পালা বেশী ছিল না। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে সমস্ত শরীরটা ঝলসে যেতে লাগল। মাথায় হ্যাট্ ছিল তাই রক্ষা। সমস্ত দুপুরটা যেমন রৌদ্রে পুড়লাম বৈকাল বেলায় মাচানে বসেই তেমনি ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান করলাম, কারণ ঐ দিনই কালবৈশাখীর প্রথম ঘটাটা দেখা দিল। যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। কোনমতে রাইফ্ল্‌টাকে বাঁচালাম, যাতে নলার মধ্যে জল না

ঢোকে। সন্ধ্যার আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। সমস্ত দিন কিন্তু বাঘের দেখা নাই।

যখন ঠিক সূর্য্যাস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, তখন দেখতে পেলাম বাঘ আসছে, বেশ বড় প্যান্থার্। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসছে, একটুও চলার শব্দ পর্য্যন্ত নাই। কয়েক পা এসে থামছে আর চার দিকে চাইছে। সোজা না এসে বক্র সর্পিল গতিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে সরে গিয়ে মড়ির দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে। ক্রমশঃ মড়ির খুব কাছে এসে বিড়াল যেমন ক'রে থাবা গেড়ে বসে সেই রকম ক'রে মাচানের দিকে মুখ ক'রে বসল। সেই সময় আমি রাইফ্ল্ তুলে নিয়ে যেমন লক্ষ্য করতে যাচ্ছি, আমার অত্যন্ত সাবধানতা সত্ত্বেও রাইফ্লের নলা একটা পাতায় লেগে একটু খুস্ ক'রে শব্দ হ'ল। শব্দ হতেই প্যান্থার্টা চকিত হয়ে মুখ তুলে গাছের উপরের দিকে অর্থাৎ মাচানের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'ল, কিন্তু আমি একটুও না ন'ড়ে, নিমেষ না ফেলে তার দিকে চেয়ে রৈলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল আর আমি পাতার বেড়ার পিছনে ছিলাম বলে বাঘ পাতার আড়ালে আমার চোখ দেখতে পেল না। অল্পক্ষণ ঐ রকম তাকিয়ে থেকে সে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে তার আশে পাশে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সেই অবকাশে আমি গুলী করলাম। সে সোজা হয়ে আমার দিকে সুমুখ ক'রে বসে থাকায় আর আমি উপর থেকে নীচের দিকে লক্ষ্য করায় তার বুক পেটের সাদা অংশ সেই সময়কার আলো-আঁধারে খুব ছোট দেখাচ্ছিল, আমি সেই অংশ লক্ষ্য

করেই গুলী করলাম। রাইফ্‌লের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ একটা গর্জ্জন ক'রে এক লাফে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হ'ল। আমি বুঝতে পারলাম গুলী বুকে না লেগে পেটে লাগল, কারণ বুকে ঐ প্রচণ্ড রাইফ্‌লের গুলী লাগলে বাঘ ঐখানেই উল্টে পড়ত।

মাহুত আমার বন্দুকের শব্দ শোনার প্রায় আধঘণ্টা পরে হাতী এনে উপস্থিত করল। সে আগে দূর থেকে চেঁচিয়ে বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করল। বাঘ যেদিকে চলে গেছে মাহুত আমার কথামত তার বিপরীত দিক দিয়ে হাতী নিয়ে এল। হাতী মাচানের নীচে এসে দাঁড়ানর পরে আমি মাচান থেকে নেমে গেলাম। দেখলাম বাঘ যেখানে বসেছিল সেখানে সদ্য রক্ত পড়েছে মাটির উপর। অন্ধকারে বনের মধ্যে ঐ বাঘকে অনুসরণ করা বৃথা আর অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

এতক্ষণ যে সব ঘটনা বললাম তাতে বড় একটা বিশেষত্ব নাই, মড়ির উপর মাচানে ব'সে শিকারে সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে তা থেকে বড় কিছু তফাৎ নয়। আমার যে বিশেষ মুস্কিলের কথা বলে এই গল্প সুরু করেছি তা ঘটেছিল পরের দিনে, যখন ঐ আহত বাঘকে খুঁজে বা'র করা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে গ্রামের লোকদের বললাম যে পরদিন প্রাতে আমি বাঘ খুঁজতে যাব। তারা সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করল আমার সঙ্গে যেতে। রাত্রি শেষ হতে না হতেই তারা আমার তাঁবুর কাছে জড়ো হ'ল। সকালে উঠে তাঁবুর বাহিরে এসে দেখি যে গ্রামবাসীরা প্রায় শ'খানেক

লোক ধনুর্ব্বাণ, টাঙ্গি, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে বসে রয়েছে। আমি বললাম যে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে বেরুতে আমার একটু দেরী হবে। তারা ঐ দেরী টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী নয়। তাদের ভিতর একজন প্রৌঢ় ছিল, সে অল্প বয়সে শিকার করত। সে আমার অনুমতি চাইল যে ঐ লোকদের নিয়ে আগেই বনে গিয়ে সাবধানে খুঁজে দেখবে যে বাঘটা বেঁচে আছে কিনা। কথাটা আমার ভালো লাগছিল না, কারণ আহত বাঘ যে কি ভয়ানক তা আমার জানা ছিল। কিন্তু লোকটি এবং অন্য গ্রামবাসীরা অতিশয় অনুরোধ করায় আমি তাদের যেতে দিলাম। বলে দিলাম যে তারা যেন অতি সাবধানে রক্তের দাগ অনুসরণ করে, এবং যেমন দেখবে যে রক্তের দাগ শেষ হয়েছে বা এতটুকু আভাস পাবে যে বাঘ সম্ভবতঃ বেঁচে আছে,—আর এগুবে না। সেইখানে আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত গোলমাল না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার পর আমি গিয়ে যা করবার করব। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদের বলেছি যে ঐ সব কোল সাঁওতাল ভূমিজ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা জঙ্গলের মধ্যে নানারকম চিহ্ন দেখে জানোয়ারের গতিবিধি লক্ষ্য করতে খুব দক্ষ, আরও সেই জন্য কতকটা আশ্বস্ত হয়ে তাদের যেতে দিলাম। এই ভুলটা এই ঘটনার আগে কখনও করিনি এবং পরে ত নয়ই, আর ভুল করার ফলটা সে দিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম। প্রৌঢ় শিকারীর অনুরোধে কার্ত্তুস্ ভরা একটা সাদা জোড়নলী বন্দুক তার হাতে দিলাম। আমার একজন পিয়নকে একটা হাতী দিয়ে ঐ লোকদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম যেন রক্তের দাগ অনুসরণ করার সময় হাতীটা আগে আগে যায়।

লোকগুলি হাতী নিয়ে বিদায় হয়ে যাওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অপর হাতীটাতে চড়ে আমি শিকার স্থলে রওনা হলাম। অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়েছি এমন সময় দেখলাম যে একজন লোক জঙ্গলের দিক থেকে দৌড়ে আসছে। কাছে এসেই সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—"একজনকে বাঘে ধরে ফেলেছে।" শুনে আমি চমকে উঠলাম, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিল। কি করে ধরল জিজ্ঞাসা করায় সে বলল :—"আমরা মাচানের তলা থেকে রক্তের দাগ দেখে যেতে যেতে বনের মধ্যে অনেকটা দূরে একটা ঘন ঝোপের কাছাকাছি যেমন পৌঁছেছি বাঘটা ভয়ানক গর্জ্জন ক'রে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে আসল। আমরা যেদিকে পারলাম ছুটে পালালাম, হাতীও দৌড় দিল। খানিক দূর দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন আর বাঘ দেখতে পেলাম না। আমরা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ ক'রে বাঘকে পুনরায় খুঁজে বা'র করার জন্য পন্থা ধরে দাঁড়ালাম, তার পর ঐ লাইন ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে একটা উচু বড় পাথর আমাদের লাইনের সামনে পড়ল। ঐ পাথরের আড়ালে যে বাঘ লুকিয়ে থাকবে এ আমাদের মনেই হয় নি। লাইনের একটু আগে আগে বুড়ো শিকারী বন্দুক নিয়ে চলছিল, সে যেমন ঐ পাথরের কাছে পৌঁছুল অমনি বাঘ পাথরের ওপাশ থেকে গর্জ্জন ক'রে এক লাফে তার উপর পড়ল। বুড়ো মাটিতে পড়ে গেছে আর বাঘ তাকে কামড়ে ধরেছে এই দেখেই আমি দৌড়েছি তোমাকে খবর দিতে। অন্য লোকেরাও পালাচ্ছে দেখে এসেছি।"

এই কথা শুনে আমি বুঝলাম যে, যে কাজ করতে,

"বুড়ো মাটিতে পড়ে গেছে আর বাঘ তাকে কামড়ে ধরেছে"

অর্থাৎ বাঘকে উত্যক্ত করতে, আমি বারণ ক'রে দিয়েছিলাম এরা ঠিক সেই কাজটি ক'রে বসেছে। আমি মাহুতকে বললাম হাতীকে দৌড় করিয়ে দিতে। যথাসম্ভব শীঘ্র ঘটনাস্থানে গিয়ে দেখলাম যে সেই প্রৌঢ় শিকারী মাটিতে পড়ে আছে। তার ডান হাতের উপরের অংশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে আর ঐ অংশের হাড় দুই তিন টুকরো হয়ে মাংস ভেদ ক'রে বেরিয়ে পড়েছে। রক্তে মাটি ভিজে গেছে আর তখনও ক্ষতস্থান-গুলো থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। আমি তখনই একজনের একখানা গলায় জড়ান গামছা নিয়ে ক্ষতগুলোর উপরের দিকের অংশে শক্ত ক'রে জড়িয়ে একটা কাঠি দিয়ে, যাকে টুর্ণিকেট্ (tourniquet) বলে সেই রকম ক'রে ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে, রক্ত বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর আহত লোকটাকে জঙ্গলের বাহিরে বহিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রাম থেকে খাটিয়া আনতে লোক পাঠালাম আর কয়েকজন লোককে মোতায়েন ক'রে রাখলাম, খাটিয়া আনলেই তারা তাতে ক'রে শিকারীকে সেখান থেকে দশ মাইল দূরে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে যাবে। এই বন্দোবস্ত ক'রে আমি আবার জঙ্গলে ফিরে গেলাম।

সেখানে আমার পিয়ন বলল যে শিকারীকে বাঘে ধরবার পর যারা পালাচ্ছিল তাদের কয়েকজন লোক ফিরে দাঁড়াল এবং চীৎকার ক'রে দূর থেকে বাঘের দিকে পাথর ছুড়েছিল। পাছে শিকারীর গায়ে লাগে এই ভয়ে কেউ তীর ছুড়তে সাহস করেনি। লোকজনের চীৎকারে এবং পাথর ছোড়ায় বাঘ শিকারীকে ছেড়ে দিয়ে প্রায় ৭০।৮০ গজ দূরে একটা লম্বা খাদের (ravine) মধ্যে ঢুকেছে। তখন আমি যে হাতীতে চড়ে

এসেছিলাম তার মাহুতকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে হাতীটা কখনও শিকারে ব্যবহার হয়নি। এটা হস্তিনী ছিল। পিয়ন যে হাতীতে চড়ে এসেছিল সেটা ছিল একটা দাঁতাল পুরুষ হাতী। ভাবলাম, সেইটাতে চড়ে খাদের মধ্যে নামব। সেই হাতীতে চড়তে যাচ্ছি এমন সময় পিয়ন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল :—"এ কাজ করবেন না, এর উপর থেকে আপনি ফায়ার্ করতে পারবেন না। বাঘ যখন চার্জ (charge) করেছিল তখন এ হাতী এমন ক'রে বনের ভিতর দিয়ে ছুটে পালাল যে আমার মনে হ'ল গাছের ডাল মাথায় লেগে আমার মাথা ভেঙ্গে যাবে এবং আমি হাতী থেকে মাটিতে পড়ে যাব।" সেই হাতীর মাহুতও বলল যে ঐ হাতীও শিকারে অভ্যস্ত নয়।

তখন আমি পায়ে হেঁটেই রাইফ্‌ল্ নিয়ে সেই খাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকেরা এবং হাতী দুইটা আমার পিছনে আসল। দেখলাম খাদের ভিতরটা ছোট ছোট গুল্মের ঝোপে ভরা আর সে ঝোপগুলো খাদের কিনারা পর্য্যন্ত উঠে এসেছে। খাদের ঐ ঝোপের ভিতর নেমে আহত বাঘকে খুঁজতে যাওয়া বড় বেশী দুঃসাহসের কাজ। সে তার লুকোবার জায়গা থেকে এক লাফে আমার উপর এসে পড়বে, আমি ফায়ার্ করার অবসরও পাব না, বিশেষতঃ যখন তার অল্পক্ষণ পূর্ব্বের আচরণে বোঝা গিয়েছিল যে আহত হয়েও সে বিলক্ষণ সতেজ আছে। একটু ভেবে নিয়ে আমি জনকয়েক লোককে খাদের ধারের বড় বড় গোটাকয়েক গাছের উপর উঠিয়ে দিয়ে তাদের ভালো ক'রে দেখতে বললাম বাঘ কারও নজরে পড়ে কি না। অল্প সময় পরে তাদের একজন বলল,—"আমি বাঘের পিছনের

পা আর লেজ দেখতে পাচ্ছি, লেজটা মাঝে মাঝে নড়ছে।” তখন অন্য লোকদের খাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি খাদের একেবারে ধারে একটা বড় গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আর গাছের উপরের লোককে বাঘের লুকোবার স্থানটা যতটা সম্ভব নির্দ্দেশ ক’রে দিতে বললাম। সে হাত দিয়ে দেখিয়ে আর মুখে বলে ঐ স্থানটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। আমি সেই জায়গাটা লক্ষ্য ক’রে উপর্য্যুপরি কয়েকটা ফায়ার্ করলাম। খাদের ভিতর থেকে বাঘ গর্জ্জন ক’রে উঠল, বুঝতে পারলাম এইবার খাদ থেকে বেরিয়ে পড়বে। আমি গাছটার পিছনে দাঁড়িয়ে রাইফল্ ঠিক ক’রে ধরে তু’ধারে দেখতে লাগলাম কোথায় বাঘ খাদ ছেড়ে উঠে আসে। অতি অল্পক্ষণ পরেই গাছের উপরের লোকেরা গোল ক’রে উঠল—“গেল, গেল, পালাল।” আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম লোকেরা হাত দিয়ে খানিক দূরে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে দেখলাম যে বাঘ খাদের কিনারার উপরে না উঠে কিনারার নীচে নীচে অনেকটা পথ দৌড়ে তারপর উপরে এসে একটা ঝোপ পার হয়ে পাশে আর একটা খাদে গিয়ে ঢুক্‌ছে। একটা ফায়ার্ করলাম, সেটা লাগল বলে মনে হ’ল না।

তখন আমি বড় মুস্কিলে প’ড়েছি বলে মনে হ’ল। সঙ্গের লোকদের নিয়ে পন্তা ধরিয়ে জঙ্গল বিট্ ক’রে যে বাঘকে বাহিরে আনব সে সাহস আমার ছিলনা, কারণ আহত বাঘকে ঐরূপে তাড়িয়ে বা’র করতে গেলে আরও তু’একজনের প্রাণ যাওয়া অসম্ভব নয়, আর লোকেরাও সে সাহস করবেনা জানতাম। আমি ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। আহত

বাঘটাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে আসা অসম্ভব। সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা হবে, আর তাতে নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়। ইত্যবসরে গাছের লোকগুলি নেমে আসল, যারা সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হাতী দুইটাও আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এই সময় একজন সাঁওতাল আমাকে বলল —"হুজুর, তুই একটা হাতী এগিয়ে দিয়ে তার পাশে পাশে যা না কেন? বাঘ যখন হাতীকে তাড়া করবে তখন তুই গুলী করবি।" আমি তখনি বললাম—"বাঃ, এই ঠিক বলেছে, বড় ভালো প্রস্তাব।" এতেও বিপদ ঘটতে পারে বলে পিয়ন আমাকে ঐ উপায় অবলম্বন না করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার কথা না শুনে একজন মাহুতকে আদেশ দিলাম হাতী নিয়ে যেখানে বাঘ খাদে নেমেছে সেইখানে খাদে ঢুকতে। মাহুত তাই করল, আর আমি হাতীর পাশে পাশে গিয়ে খাদের কিনারায় দাঁড়ালাম। হাতী খাদে নামা মাত্রই বাঘ মহা গর্জ্জন করে হাতীকে চার্জ্ করল, আর হাতী শুঁড় তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে খাদ থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ুল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অন্য সময়ে দেখলে হাসি পাবার কথা। অতবড় জানোয়ারটা—পিছনের পা দিয়ে মাঝে মাঝে লাথি ছুড়তে ছুড়তে ভয়ে দৌড়েছে, আর তার পিছনে তার চেয়ে ছোট জানোয়ার তাকে তাড়া করেছে। দেখতে দেখতে হাতী এক ধারে বেরিয়ে গেল, আর রঙ্গভূমিতে রয়ে গেলাম বাঘ আর আমি। আমাকে দেখেই বাঘ ফিরে দাঁড়িয়ে, বিড়াল শিকারের উপর লাফ দেওয়ার ঠিক আগে যেমন ক'রে মাটিতে পেট দিয়ে শরীরটাকে গুটিয়ে বসে যায়, সেই রকম করে বসল। আমার

তখনকার সম্পূর্ণ একাগ্র দৃষ্টির উপর মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঘের যে চেহারা ফুটে উঠেছিল সেটার ছাপ আমার স্মৃতিতে চিরকালের মতো মুদ্রিত রয়ে গেছে। তখন তার ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, তীক্ষ্ণ বড় দাঁত গুলো বেরিয়ে পড়েছে, কাণ দুটো পিছন দিকে চ্যাপটা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে, লেজটা চাবুকের মতো এপাশ ওপাশ করে দুলছে, চোখ দুটো ভীষণ হিংস্র ভাবে উঠেছে জ্বলে। আমা হতে ২৫ ফুট আন্দাজ দূরে তখন সে, একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি, লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঐ দেখেই আমি তৎক্ষণাৎ এক হাঁটু মাটিতে দিয়ে বসে গিয়েই বাঘের দুই চোখের মাঝখানে লক্ষ্য ক'রে নিমেষের মধ্যে ফায়ার্ করলাম। বাঘ আর উঠলনা, ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল। কেবল তার সমস্ত শরীরটার ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ চলে গেল, চোখের আগুন নিভে আসল, মুখটা নেমে পড়ে মাটিতে ঠেকল, আর লেজটা একবার আস্ফালন ক'রে উচু হয়ে উঠে তার পর মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে রৈল। এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লে সেদিন আমার জীবন-সংশয় হত তার আর সন্দেহ নাই।

তারপর বাঘের কাছে গিয়ে দেখলাম রাইফ্‌লের গুলী তার মাথাটাকে একটা কুড়ুলের ঘা দিয়ে কেটে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি ক'রে দু'ফাঁক ক'রে দিয়ে চলে গেছে, আর তার সঙ্গে মস্তিষ্কের খানিকটা ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে। দেখলাম পূর্ব্বদিনের গুলীটা বাঘের পেটের একপাশে ঢুকে মেরুদণ্ড স্পর্শ না ক'রে কোমরের নীচে একপাশ ভেদ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে এসে মেপে দেখেছিলাম বাঘটা লম্বায় সাড়ে সাত ফুট ছিল। আমি যতগুলো প্যান্থার্ মেরেছি তার মধ্যে এইটাই

সব চেয়ে বড়। সেবারকার অভিযানে আমারই অদৃষ্টে কেবল এই বাঘ জুটেছিল, অপর শিকারী কেউ কিছু পাননি।

সেই প্রৌঢ় শিকারীটির জীবন রক্ষা পায়নি। তিনদিনের দিন হাসপাতালে তার মৃত্যু হ'ল। তার স্ত্রী ও দুইটী যুবক পুত্র এসে আমার কাছে বড় কান্নাই কেঁদেছিল। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম।

এই হ'ল আমার সেদিনকার মুস্কিলের আর তার আসানের ইতিহাস।

এইখানে সাহস আর ভয়ের সম্বন্ধে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। যতবার মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ বা বড় ভালুক মেরেছি তার মধ্যে অনেকবারই বড় বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সে সবের থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে সাহস জিনিষটা শিক্ষা বা ট্রেনিংএর উপর অনেকটা নির্ভর করে, আর নির্ভর করে কতকটা কার্য্যক্ষেত্রের উপরে। শিকারে যখন ইচ্ছা ক'রে জেনে শুনে আপনাকে বিপদের মধ্যে ফেলেছি তখন যে আমার মনে ভয়ের লেশমাত্র হয়নি এ বাহাদুরী যদি তোমাদের কাছে করতে যাই তা হ'লে মিথ্যা কথা বলা হবে। ওরকম ক্ষেত্রে আগে যে বুকের মধ্যে একটুও চাঞ্চল্যের ভাব আসে না এবং মাথার ভিতর নানারকম জল্পনা কল্পনা উদয় হয় না, একথা হলপ নিয়ে বলতে রাজী নই। তবে এটা ঠিক, একবার বিপদের মধ্যে নেমে পড়ে সেই সময়ের করণীয় কাজ (ইংরাজীতে যাকে action বলে) আরম্ভ ক'রে দিলে ভয় বলে জিনিষটা তখনকার মতো অন্তর্হিত হয়। "আমি জয়ী হতে চাই এবং জয়ী হবই"—এই অনুভূতিটা তখন সমস্ত

মনকে আচ্ছন্ন ক'রে বসে। সমস্ত স্নায়ুগুলো তখন লোহার মতো শক্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় তাকে বাহির থেকে যারা দেখে তারা ভাবে বুঝি লোকটি ভয়লেশহীন। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয় দেহধারী জীবের পক্ষে অন্ততঃ কিছুটা ভয় অপরিহার্য্য। তবে শিক্ষার গুণে মানুষ ভয়ের মধ্যে থেকেও তাতে বিচলিত না হয়ে আপনার কাজ ক'রে যেতে পারে। এমন কি কোন কোন পশুকেও এই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এসম্বন্ধে আমার ঘোড়ার আচরণের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। মানুষের কিন্তু আর এক উন্নত রকমের ভয়হীন অবস্থা হতে পারে। তাকে সাহস বলা ঠিক হয়না বলে আমার ধারণা, কারণ সাহস কথাটা ভয়ের বিপরীত। ঐ অবস্থায় প্রথম থেকেই ভয় বলে জিনিষটার একান্ত অভাব হয়, মন ভয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এই ভয়হীন অবস্থা ত্যাগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঐ অবস্থার কথা উঠতেই পারে না।

অনেক সময় অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ লোকে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। তারা বুঝতে পারে না কতটা দুঃসাহসের কাজ করছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সরকারী কাজ উপলক্ষ্যে একটা জঙ্গল জমি তদন্ত ক'রে বনের ধারের রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পে ফিরছি। আমার হাতে রাইফ্‌ল্‌ আর সঙ্গে একজন যুবক বাঙালী সার্ভেয়র্‌ ছিল, সে ঐ দেশে নতুন এসেছে। তখন মহুল ফুলের সময়। যেতে যেতে দেখতে পেলাম একটি বৃহদাকার ভালুক বনের ধারে মাটিতে ঝরে পড়া মহুল ফুল খাচ্ছে। আমি প্রায় ৫০ গজ দূর থেকে গুলী করায় সে আহত হয়ে বনে ঢুকল।

সার্ভেয়র্ ছোকরা এই দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলল, "সার্, আসুন, আসুন, ভালুকটার গুলী লেগেছে," আর এই বলেই ভালুক যেখানে বনে ঢুকেছে সেইদিকে দৌড়ুল। আমি প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম, তারপর তার পিছনে দৌড়ে গিয়ে তাকে থামতে বলায় সে দাঁড়াল। আমি তাকে বললাম—"কোথায় যাচ্ছ যমের মুখে? অন্ধকার হয়ে আসছে, ঘায়েল্ ভালুকের পিছনে জঙ্গলে ঢুকছ, আর তাও শুধু হাতে? এখনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে যে! এ, ভালুক নাচানর ভালুক পেয়েছ নাকি!" সে তখন অপ্রতিভের মতো খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার সঙ্গে ফিরে এল। হয়ত ভাবল এ লোকটা বড়ই ভীরু। পরদিন সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ভালুকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

আমার পুত্রের যখন বয়স ষোল সতের বৎসর, সবে শিকার শিখছে, তখন সে একটা অতিশয় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসেছিল। তারই বিশেষ আগ্রহে একটা বেড় শিকারের বন্দোবস্ত করেছিলাম। ঘন বনে ঢাকা প্রায় এক মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া একটা পাহাড় বিট্ করার কথা হ'ল। দুইটা মাচান তৈরী করা হ'ল। তার মধ্যে একটা মাচান পাহাড়ের নীচে বেশ ভালো জায়গাতে করা হয়েছিল। ঐ জায়গায় পাহাড় আর বন ঢালু এবং সরু হয়ে নেমে এসে সমতল ভূমির অন্য বনের সঙ্গে মিশেছে, বিটের সময় জঙ্গলের জানোয়ারগুলো বেশীর ভাগ ঐ পথে নেমে এসে ঐ মাচানের কাছ দিয়েই যাওয়া সম্ভব। আর একটা মাচানের জন্য অত ভালো জায়গা পাওয়া গেল না। ছেলে আগেকার মাচানটাই চেয়ে নিল, আমি অপর মাচানে বসলাম।

বিট্ প্রায় শেষ হবার সময় ছেলের মাচান থেকে ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। আমি দুইটা ফায়ার্ ক'রে একটা ভালুক মারলাম। বিটার্‌রা পৌঁছে যাওয়ার পর ছেলে তার মাচান থেকে নেমে এসে বলল যে সে দুইটা ভালুক মেরেছে, আর একটা বড় প্যান্থার্‌কে গুলী করেছে কিন্তু তাকে পায়নি, সেটা পালিয়েছে। ছেলের সঙ্গে তার মাচানের কাছে গিয়ে দেখলাম যে যেখানে সে প্যান্থার্‌কে গুলী করেছে সেখানে মাটিতে রক্ত পড়েছে আর ঐ রক্তের দাগ মাচানের পিছনদিকে বনের মধ্যে চলে গেছে। সেইখানে সে বলল যে বাঘকে গুলী করার পর সেটা মাচানের পিছনে বনের মধ্যে ঢুকে খানিকক্ষণ মৃদু গর্জ্জন (low growl) করে চুপ করেছিল এবং তারপর সে মাচান থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢুকে ঐ শব্দের দিকে লক্ষ্য ক'রে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিল বাঘটা কোথায় গেল, কিন্তু দেখতে না পেয়ে ফিরে এসেছিল। এই কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম। কারণ, দেখলাম ঐদিকে এত ঘন ঝোপ যে ছয় সাত হাত দূরের জানোয়ারকেও দেখা যাবে না। একজন বালকের পক্ষে আহত বড় প্যান্থার্‌কে ঐ বনের মধ্যে একা খুঁজতে যাওয়া আর ইচ্ছা ক'রে মৃত্যু ডেকে আনা এক্ কথা। ভাগ্যে ঐ প্যান্থার্ বেঁচে ছিল না, না হ'লে সেদিন সম্ভবতঃ ছেলেটিকে হারাতাম। তার হঠকারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করায় সে বলল যে তার কাজটা যে কত বড় অবিবেচকের কাজ হয়েছিল তা সে বুঝতে পারেনি বলেই করেছিল। তখন আমি বিটার্‌দের ফের লাইন ধরিয়ে দিয়ে পাথর ছুড়তে ছুড়তে ঐ ঝোপের মধ্যে ধীরে ধীরে এগুতে বললাম। ছেলে আর আমি বন্দুক ধ'রে তাদের দু'চার হাত

আগে আগে পাশাপাশি চলতে লাগলাম। মাচান থেকে ৩০ গজ যেতে না যেতে দেখতে পেলাম প্যান্থারের মৃতদেহ। গুলী তার ফুস্ ফুস্ ভেদ ক'রে গেছে। মেপে দেখা গেল বাঘটা লম্বায় ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি।

আমি নিজে যে কখনও এই রকম অবিবেচকের কাজ করিনি তা নয়। যখন থেকে রাত্রিতে শিকারে ইলেকট্রিক্ টর্চ্ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলাম তখন থেকে অন্ধকার রাত্রিতে শিকার করতেই বেশী পছন্দ করতাম। কারণ যত বেশী অন্ধকার হবে মড়ির উপর মাচানে বসে টর্চ্ নিয়ে শিকারে তত বেশী সুবিধা। কেন তা হয় সে কথা পরে বলছি। ঐরকম একদিন ভারী অন্ধকার রাত্রিতে একটা গরুর মড়ির উপর মাচানে বসে টর্চের সাহায্যে এক প্যান্থার্কে গুলী করলাম। বাঘ তার পার্শ্বদেশটা মাচানের দিকে দিয়ে বুক পেট মাটির সঙ্গে লাগিয়ে শুয়ে মাংস খাচ্ছিল, আর আমি তার সুমুখের পায়ের ঠিক পশ্চাতে লক্ষ্য ক'রে গুলী করেছিলাম। আহত হয়ে বাঘ বনের মধ্যে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হ'ল। নিকটের গ্রামের লোকেরা জঙ্গলের বাহিরে মাঠে অপেক্ষা করছিল। বন্দুকের শব্দ শুনে মশাল জ্বালিয়ে তারা এসে উপস্থিত হ'ল। আমার স্থির ধারণা হয়েছিল যে শরীরের যে স্থানে লক্ষ্য ক'রে ফায়ার্ করেছি তাতে বাঘ বেশীক্ষণ বাঁচতেই পারে না। আমি কিছু সময় অপেক্ষা ক'রে সেই সব লোকদের আমার পিছনে মশাল নিয়ে আসতে বলে, টর্চের সাহায্যে বাঘের রক্তের দাগ দেখতে দেখতে আর টর্চের জোর আলোটা অনেকটা আগে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে ফেলতে বনের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। সেখানে ঝোপ না থেকে বড় বড় গাছের

বন ছিল, গাছগুলোর নীচে অনেকদূর পর্য্যন্ত আলোতে দেখা যাচ্ছিল, বিশেষতঃ সেইজন্যই এই সাহস করেছিলাম। অল্পদূর গিয়ে বাঘের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলাম।

আমাকে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে কাজটা ভালো করিনি। এ হ'তে পারত যে আমার লক্ষ্যের ভিতর ত্রুটি থাকায় বাঘ মরেনি। এ অবস্থায় আমার নিজের যাই হোক, আমার সঙ্গের অতগুলি লোককে বিপন্ন করা আমার উচিত হয় নি। ক্যাম্প্ আমার দূরে ছিল, সেই রাত্রিতে ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আবার পর দিন এসে বাঘ খোঁজার হাঙ্গাম কে করে, কতকটা এই ভেবে ঐ কাজ করেছিলাম আর কি। আর অনুমান করারও কারণ ছিল যে খুব সম্ভব বাঘ মরেছে।

অনেক সময় কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারীরও ঐরূপ অনুমানে ভুল হয়, এবং তা যখন হয় তখনই অতি ভয়ানক ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যায়। এই রকম ঘটনা তোমরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়বে। কিছুদিন আগে এই রকম একটি বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত পড়ে থাকবে। আমি পরলোকগত প্রসিদ্ধ শিকারী ব্যারিষ্টার ৺কে. এন্. চৌধুরীর মৃত্যুর কথা বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ছিল না, কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ শিকারী ছিলেন বলে আমি চিরকাল তাঁকে মনে মনে দূর থেকে বড়ই শ্রদ্ধা করতাম। শিকারী মানে হত্যাকারী নয়। যথার্থ শিকারী বলতে যা বুঝায় তিনি তাই ছিলেন, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বীরের মন এবং কবির অনুভূতি ছিল। যখনই তাঁর

লেখা আমার হাতে পড়ত তখনই একথা বুঝতে পারতাম। বেড় শিকারে মাচানে বসে একটা রয়্যাল্ টাইগার্কে গুলী করেন। বাঘটা আহত হয়ে অদৃশ্য হয়। তিনি মাচান থেকে নেমে তাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। সে নিকটেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে তাঁর প্রাণ নাশ করে। তিনি তাকে পুনরায় গুলী করবার অবসর পাননি। যখন খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়েছিলাম তখন আমি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছিলাম।

এই ঘটনা নিয়ে আমার একজন পরিচিত বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছিল। ভদ্রলোকটি সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে অতি-হিসাবী বলে পরিচিত। যখন খবরের কাগজে ঐ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তখন অপর একজন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় ব'সে আমাদের কয়েকজনের ভিতর ঐ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, এবং সকলে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"হুঁঃ, বুড়ো হয়েও শিকারের সখ গেল না, শেষটায় বাঘের হাতে প্রাণটা দিল। কেনরে বাপু, কি দরকার ছিল অত সখে?" কথাটা আমার অসহ্য হয়েছিল। আমি অল্প বয়সে ইংরাজীতে একটা মজার গল্প পড়েছিলাম, সেটা সেখানে বললাম। দুইটি পরস্পর অপরিচিত ব্যক্তির কোনখানে দেখা হয়ে তাদের মধ্যে এই কথাবার্ত্তা হচ্ছে :—

প্রথম ব্যক্তি। তোমার কি করা হয়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমি নাবিকের কাজ করি।

শিকারের কথা

প্রথম। আচ্ছা, তোমার ভয় করে না? সমুদ্রে ঝড়ে বা অপর কিছুতে ত সময়ে সময়ে জাহাজের বড় বিপদ হয়।

দ্বিতীয়। তা বিপদ হয় বৈকি। ভয় ক'রে আর কি করব? ছেলেবেলা থেকে বাবা এই কাজ আমাকে শিখিয়েছিলেন।

প্রথম। তোমার বাবাও কি এই কাজ করতেন? তাঁর কিসে মৃত্যু হয়?

দ্বিতীয়। বাবাও নাবিকের কাজ করতেন। জাহাজ ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম। বল কি? তবু তুমি এই কাজ করছ?

দ্বিতীয়। না ক'রে করি কি? আমরা তিন পুরুষ ধরে যে নাবিকই।

প্রথম। তোমার পিতামহের কি ক'রে মৃত্যু হয়?

দ্বিতীয়। ঐ জাহাজ ডুবেই!

প্রথম। কি ভয়ানক! তোমার সাহস ত কম নয়, নাবিক হয়ে তোমার বাপ পিতামহ জলে ডুবে মরেছে। আমি হ'লে কখনও এ কাজ আর করতাম না।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিটি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা কংল—"মশায়ের কি করা হয়?"

প্রথম। আমি গাঁয়ের জমিদার, চাষবাসও আছে।

দ্বিতীয়। মশায়ের পিতা কি করতেন?

প্রথম। তিনিও ঐ জমিদার ছিলেন।

দ্বিতীয়। কি ক'রে তাঁর মৃত্যু হয়?

প্রথম। কেন? ভদ্রলোকের মতো নিজের বাড়ীতে, বিছানায় শুয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়। আপনার পিতামহের কি ক'রে মৃত্যু হয়?

প্রথম। (হেঁসে) তোমার বাপ পিতামহের মতো আমার কেউ জলে ডুবে মরেননি। আমার সাত পুরুষের মৃত্যু ভদ্র-লোকেরই মতো তাঁদের নিজের বাড়ীতে নিজের বিছানায় শুয়ে হয়েছে।

দ্বিতীয়। কি সর্ব্বনাশ! তার পরেও আপনার ভদ্রলোক হয়ে নিজের বাড়ীতে বিছানায় শুতে সাহস হয়! ধন্য আপনার বুকের পাটা।

এই গল্পের পর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বললাম,—"মশাই, আপনি আমি যে রকম সাবধানী—তাতে ও রকম ক'রে আমাদের বাঘের হাতে মৃত্যু ঘটবে না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তবে মৃত্যুর ভয়ে, মরার আগেও দিনে সাতবার ক'রে মৃত্যু আমাদের কেউ ঘোচাতে পারবে না, ভগবান এলেও নয়। আমরা সম্ভবতঃ আমাদের জরা আর রোগজীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে মাসের পর মাস বিছানায় পড়ে থেকে তবে মরব। তার চেয়ে যদি পুরুষ মানুষের মতো বন্দুক হাতে ক'রে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূতের সঙ্গে লড়তে লড়তে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটা এসেই পড়ে সেটা যে ঐরকম বিছানায় শুয়ে তিল তিল ক'রে মরার চেয়ে কম বাঞ্ছনীয় না হতে পারে এ কথা আপনাকে আমি বুঝাই কি করে?"

নবম পরিচ্ছেদ

একটু আগে এক জায়গায় বলেছি যে মাচানে বসে বাঘকে লক্ষ্য করার সময় গাছের পাতায় বন্দুকের নলা লেগে শব্দ হওয়ায় বাঘ সতর্ক হয়ে মাচানের দিকে চেয়ে দেখল। ঐটা বলবার সময় মনে হ'ল যে মাচানের সম্বন্ধে এবং অন্য যে উপায়ে শিকারী লুকিয়ে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে তার সম্বন্ধে দু'চারটা বিশেষ কথা এর আগেই আমার তোমাদের বলা উচিত ছিল। আরও বাঘের গল্প বলার আগে এইখানে সেকথা কয়টা বলে নিই।

উঁচু জায়গায় গোপন ভাবে স্বচ্ছন্দে বসে থাকবার জন্য মাচান তৈরী করা হয় তা আর বলে দিতে হবে না। যেমন তেমন ক'রে খানিকক্ষণ বসে থাকতে হ'লে বোধ হয় অনেকের পক্ষে গাছের ডালই যথেষ্ট হত। কিন্তু তা করলে ত হবে না। শিকারীর যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, ইচ্ছামত ঘোরার দরকার হয়, বন্দুকে লক্ষ্য করার সময় দুই হাতই ব্যবহার করতে হয়, এবং এই সব কারণেই তার নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার স্থানের এত প্রয়োজন।

দুইটা যথাসম্ভব সমান্তরাল মোটা ডালের উপর একটা দড়ি দিয়ে ছাওয়া হালকা খাটিয়া বেঁধে বা কতকগুলো গাছের ডাল কেটে এনে সেগুলোকে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ঐ সমান্তরাল ডাল দুইটার উপর সাজিয়ে বেঁধে দিয়ে একটা বসবার আসন

তৈরী ক'রে নেওয়া হয়, আর একেই মাচান বলে। যেখানে এমন গাছ পাওয়া যাচ্ছে না যার দুইটা ডালের উপর ঐ রকম মাচান তৈরী করা যায় সেখানে মাটিতে খুঁটি পুতে তার উপর মাচান তৈরী করতে হয়। কিন্তু যেখানে আগে মাচানের মতো কোন জিনিষ ছিল না সেখানে খুঁটির উপর ঐ রকম একটা জিনিষ দাঁড় করালে তা শিকারের জন্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেইজন্য খুঁটির উপর মাচান তৈরী করতে হ'লে তাকে কোন গাছের সঙ্গে লাগিয়ে তৈরী করার দরকার, যাতে সেটাকে হঠাৎ গাছেরই একটা অংশ বলে মনে হবে। খুঁটিগুলোতেও এমনভাবে পাতা সাজিয়ে দিতে হয় যেন সেগুলোকে গাছ বলে ভ্রম হয়।

মাচান কখনও আয়তনে বেশী বড় হওয়া উচিত নয়। দু'জনের বসবার জায়গার চেয়ে বেশী জায়গা কখনই দরকার হয় না। মাচান আয়তনে যত বড় হবে তত বেশী জঙ্গলের জানোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভব। যাঁরা শিকারে অভ্যস্ত নন এমন সহুরে ভদ্রলোকদের কখন কখন শিকারের জন্য মাচানে বসতে দেখেছি। তাঁদের সঙ্গের সাজ-সরঞ্জাম দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে মড়ির উপর মাচানে বসে শিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের চা খাওয়ার সরঞ্জাম, টিফিন্ কেরিয়র্, সিগারেট্ কেস্, অনেকগুলো রাগ্ ইত্যাদি যা নিয়ে মাচানে ওঠেন, তা দেখলে মনে হয় যে তাঁরা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েও এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হতে রাজী নন। মড়ির সন্নিকটে মাচানের উপর বসে যদি কেউ "ফিষ্টি" করতে, বা ডিশ পেয়ালার ঠুন্‌ঠান্ শব্দ ক'রে চা খেতে বা দেশালাই জ্বালিয়ে সিগারেট্ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লেগে যান, তা হ'লে শিকারের

জন্তুটি যে ঐ 'ফিষ্টি' ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে কৃতার্থ করতে আসবে না এ তোমরা সহজেই বুঝতে পার। বেড় শিকারে মাচানে ব'সে এ সব বরং চলতে পারে, মড়ির উপর ব'সে কখনও না। অল্প-পরিসর মাচানের উপর দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ আর নিশ্চল হয়ে বসে শিকারের প্রতীক্ষা করা অনভ্যস্ত শিকারীর কাজ নয়।

মাচানের চার পাশে পাতার পর্দ্দা ক'রে ঢেকে দিতে হয় যাতে শিকারীকে সহজে দেখা না যায় এবং মাচানকেও যতটা সম্ভব গাছেরই একটা অংশ বলে মনে হয়। চার পাশে দড়ি খাটিয়ে, বা লম্বা-লম্বি ডাল বেঁধে দিয়ে তার উপর কতকগুলো পাতা ঝুলিয়ে দিয়ে পর্দ্দা তৈরী করা হয়। পর্দ্দার প্রত্যেক দিকে অন্ততঃ ছুইটা করে ছিদ্র থাকা দরকার, যার ভিতর দিয়ে শিকারী এবং তার সঙ্গী মাচানের বাহিরে দেখতে পারবে। যেখানে গাছেরই ঘন পাতার ভিতরে মাচান তৈরী হয় সেখানে সব সময়ে এই পাতার পর্দ্দার দরকার হয় না তা বলাই বাহুল্য।

মাচানে উঠবার জন্য বা মাচান থেকে নামবার জন্য একটা সিঁড়ির দরকার। ছুইটা লম্বা সরু গাছ কেটে তাতে আড়া-আড়ি ভাবে গোটাকয়েক ছোট ডাল বনের লতা দিয়ে বেঁধে দিয়ে তখনি তখনি এই সিঁড়ি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়, যেমন বাঁশের মই আর কি। এই রকম সিঁড়ি কিন্তু মাচানের সঙ্গে লাগান থাকলে সতর্ক জন্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভব, সেইজন্য শিকারী মাচানে বসার পর সিঁড়িটা সরিয়ে ফেলে কাছেই জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা উচিত যাতে শিকারী নামবার সময় পুনরায় সহজে ব্যবহার করতে পারে। এ করাও কিন্তু অনেক হাঙ্গাম। সেই জন্য মড়ির উপর বসে শিকারে আমি দড়ির সিঁড়ি ব্যবহার

করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। ঐ সিঁড়ি দিয়ে মাচানের উপর উঠে সিঁড়িটা টেনে উপরে উঠিয়ে নিতাম, আর নামবার সময় আবার ঝুলিয়ে দিতাম। শিকারে যাবার সময় প্রায়ই ঐ রকম একটা সিঁড়ি সঙ্গে রাখতাম।

ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে বেড় শিকারে মাচানে বসে শিকার করা তত কিছু কঠিন নয়, কেবল দ্রুত লক্ষ্য করার ক্ষমতা থাকলেই যথেষ্ট; কারণ ঐ শিকারে শিকারের জন্তুকে শিকারীর কাছে তাড়িয়ে এনে হাজির ক'রে দেওয়া হয়। মড়ির উপর বা যেখানে জানোয়ার সচরাচর আসাযাওয়া করে এমন জায়গায় রাত্রিতে মাচানে বসে শিকারের প্রতীক্ষা করা খুব সহজ কাজ নয়, তা আমি আগে যা বলেছি তা থেকে কতক বুঝতে পেরে থাকবে। এতে বড়ই ধৈর্য্যের দরকার। ঐ অবস্থায় মাচানে বসা কতকটা যোগাসনে বসার মতো। নড়বে চড়বে তাতে এতটুকু শব্দ হ'লে চলবে না, কারণ তুমি জান না যে জানোয়ার মাচানের কাছে এসে গেছে কিনা। ঐ অবস্থায় এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে যখন পা বা শরীরের কোন অংশ অবশ হয়ে যায় তখন তাকে একটু সরিয়ে সহজ অবস্থায় আনতে গেলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে অনেকটা সময় নিয়ে তা করতে হয়। অন্ততঃ আমি তাই করতাম। আমার বিশ্বাস, অনেক নতুন শিকারী যে ঐরকম শিকারে ব'সে বার বার নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসেন তার প্রধান কারণ তাঁরা তখনও মাচানে বসতে শেখেন নি। তাঁদের মাচানে বসে উস্‌খুস্‌নির শব্দগুলো প্রায়ই তাঁদের উপস্থিতির সংবাদটা শিকারের জন্তুদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের সতর্ক ক'রে দেয়।

আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে শিকারী যদি মাচানে অন্য লোক নিয়ে বসেন তা হ'লে যেন একজনের বেশী না নেন, আর যাকে নেবেন সেও যেন মাচানে নিঃশব্দে দীর্ঘকাল বসতে অভ্যস্ত হয় এবং ভীরু স্বভাবের না হয়। এ না হ'লে প্রায়ই মাচানে বসা নিষ্ফল হয়, এবং সময়ে সময়ে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে তখন নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়—"কেন এই লোককে নিয়ে মাচানে বসেছিলাম" বলে। আমার দু'এক জন সাহসী পিয়নকে আমি ঐ ভাবে বসতে শিখিয়েছিলাম। তবুও জ্যোৎস্না রাত্রি হ'লে আমি পিয়নকে সঙ্গে নিতাম না। কেবল অন্ধকার রাত্রিতে তাদের কাউকে নিয়ে মাচানে বসতাম, কারণ ফায়ার্ করার সময় শিকারের জন্তুর উপর ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেলবার জন্য ঐ কাজে শিক্ষিত একজন সঙ্গীর দরকার হত আমার। যখন প্রথমে রাত্রিতে মাচানে বসতে আরম্ভ করে-ছিলাম তখনকার একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। ঘটনাটা যেমন বিশ্রী তেমনি হাস্যকর। গভীর বনে রয়্যাল্ টাইগার্ একটা মহিষ মেরে রেখে গেছে। মাচান তৈরী হয়েছে, সন্ধ্যার একটু আগেই মাচানে বসতে যাচ্ছি। সেদিন আমার পিয়ন সঙ্গে ছিল না। একজন চৌকিদারকে বললাম আমার সঙ্গে থাকতে। এই লোকটীর একটি অনেক দিনের পুরোনো বন্দুক ছিল, যা দিয়ে সে মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করত। তার ঐ বন্দুকে ব্যবহার করার জন্য আমার কাছ থেকে কখন কখন বারুদ আর ক্যাপ্ চেয়ে নিয়ে যেত। ভাবলাম লোকটার শিকার করা অভ্যাস আছে, মাচানে বসতে পারবে। আমাদের দু'জনকে মাচানে বসিয়ে দিয়ে অন্য লোকেরা যখন চলে গেল

তখন থেকেই চৌকিদার মাঝে মাঝে উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল, যেন তার কোন অসুখ করেছে। আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করায় সে ঘাড় নেড়ে 'না' বলল। তখনও বুঝতে পারিনি যে ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হ'ল। জ্যোৎস্না রাত্রি, নিশ্চিন্ত ছিলাম যে রাত্রিতেও বাঘ আসলে মারতে পারব। সন্ধ্যার ঠিক পরেই বাঘ আসবার আভাস পাওয়া গেল। দু'একটা ছোট জানোয়ার মাচানের কাছ দিয়ে দৌড়ে যাবার শব্দ শোনা গেল আর মাচান থেকে কতকটা দূরে শুকনো পাতার উপর দিয়ে বড় জন্তুর সাবধানে চলার মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ হ'তে লাগল, এবং বোধ হ'ল ঐ শব্দটা ক্রমশঃ অল্প অল্প ক'রে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছি এমন সময়ে মনে হ'ল যেন মাচানটা দুলছে। সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদার তার ভাষায় চাপা গলায় ব'লে উঠল—"বাবু প্রস্রাব করব", আর সেই সঙ্গে মাচান মট্ মট্ শব্দ ক'রে বেশ জোরে কাঁপতে লাগল। বড় বেশী ভীত হ'য়ে মানুষ অসহায় ভাবে কত জোরে যে কাঁপতে পারে তা আমি সেদিন যেমন দেখেছি তেমন আর কখন দেখিনি। আমি বুঝতে পারলাম,—সব নষ্ট হয়ে গেল। তাকে চুপি চুপি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ভয় নেই, আর তাকে বললাম প্রস্রাব করলে উপর থেকে জল পড়ার শব্দে বাঘ সতর্ক হয়ে পালিয়ে যাবে, কিন্তু সব বৃথা হ'ল। সে প্রস্রাব ক'রে ফেলল আর তা ছর্‌ ছর্‌ শব্দে নীচে পড়ল। তাকে মৃদু স্বরে তর্জ্জন করায় সে কেঁদে ফেলল। দেখলাম কিন্তু যে বেচারা ভয় আর কান্না দুইই দমন করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারছে

না। আর কিছু না বলে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তখন থেকেই কিন্তু বনের ভিতর জন্তু চলার শব্দ বন্ধ হ'ল। তার পর মধ্য রাত্রি, অর্থাৎ জ্যোৎস্না না ডোবা পর্য্যন্ত, মাচানে বসে রইলাম যদি বাঘ আবার আসে। কিন্তু আসবার কোন লক্ষণই না দেখে বন্দুক ফায়ার্ করে দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকদের সঙ্কেত করায় তারা আলো নিয়ে এল, আমরাও মাচান থেকে নেমে গেলাম। পর দিন প্রাতে খবর নিয়ে জানলাম বাঘ ঐ মড়ির কাছে আর আসেনি। এ আমার শিকার জীবনের প্রথম অবস্থার ঘটনা যখন বিজলী বাতি বা টর্চের চলন হয়নি। এর পর থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে পারতপক্ষে দ্বিতীয় লোক নিয়ে মাচানে বসব না। একটা বড় শিকার হাতের কাছে এসে পালিয়ে যাওয়ায় সেদিন মনে যে ক্ষোভ হয়েছিল তা আমার এখনও মনে পড়ে।

যতদিন ইলেকট্রিক্ টর্চের চলন না হয়েছিল ততদিন অন্ধকার রাত্রিতে মড়ির উপর বসে শিকার করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে তারার আলোতে কখনও এক আধটা ও রকম শিকার করেছিলাম। কিন্তু টর্চ্ ব্যবহার আরম্ভ করার পর থেকে এই অসুবিধা দূর হয়। এই আলো ব্যবহারে একবার অভ্যস্ত হওয়ার পর জ্যোৎস্না রাত্রিতে চাঁদের আলোতে শিকারের চেয়ে অন্ধকার রাত্রিতে টর্চের আলোতে শিকার অনেক বেশী সুবিধা ও সহজ বলে বুঝতে পেরেছিলাম। আর অন্ধকার যত গাঢ় হয় তত বেশী সুবিধা কারণ তখন ঐ আলোতে জানোয়ারের দেহাকৃতিটা (outline of the body) তার পার্শ্ববর্ত্তী গাছপালা ও মাটি থেকে পৃথক হয়ে তত বেশী

স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এটা দেখেছি যে জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারে শিকারের জন্তুর, বিশেষ বাঘের, দেহ কখন কখন আশপাশের গাছপালার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে যতক্ষণ সে তার শরীরের কোন অংশ না নড়িয়েছে ততক্ষণ নিশ্চিতভাবে বন্দুকে লক্ষ্যই করতে পারিনি। গভীর অন্ধকারে টর্চের তীব্র আলোতে এ রকমটা আমার কখনও হয়নি। এমন আমার কখনও ঘটেনি যে, যে জানোয়ারের উপর টর্চের আলো দু'তিন সেকেণ্ড স্থির ভাবে পড়েছে সে নিষ্কৃতি পেয়ে অক্ষত দেহে পালিয়ে যেতে পেরেছে।

টর্চের চলন হওয়ার পর নানারকমের কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে বন্দুকের গায়েই টর্চ্ এঁটে দিয়ে রাত্রিতে শিকার করা যায়। আমি তার প্রায় সবগুলোই পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, কিন্তু তার কোনটাই আমার মনঃপূত হয়নি। প্রত্যেকটাতেই কোন না কোন রকমের অসুবিধা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি প্রায় সবগুলোতেই বন্দুকে দ্রুত লক্ষ্য করার সময় দৃষ্টি কতকটা বাধা পায়। বন্দুকের নলার নীচে টর্চ্ লাগান হ'লে শিকারীর দৃষ্টিতে বাধা ঘটে না বটে, কিন্তু হাত দিয়ে বন্দুক ধরার এবং সহজভাবে বন্দুক ঘোরান ফিরানর পক্ষে অসুবিধা হয়, আর তা ছাড়া টর্চের আলো বন্দুকের নীচে দিয়ে যাওয়াতে বন্দুকের ফোর্‌সাইট্ এবং ব্যাক্‌সাইট্ কতকটা অন্ধকারে থেকে যায়। এই সব কারণে আমি বন্দুকের গায়ে টর্চ্ এঁটে দিয়ে শিকার বড় একটা করিনি। অন্ধকার রাত্রিতে সর্ব্বদাই টর্চের আলো ফেলতে বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক নিয়ে মাচানে বসেছি। শিকারী পাতার পর্দ্দার যে ছিদ্র দিয়ে লক্ষ্য করে ফায়ার্

করবে, তার পাশের ছিদ্র দিয়ে টর্চ্‌ধারী লোকটি আলো ফেলবে। মাচানে বসবার সময়েই ঐ লোক ভালো ক'রে দেখে নেবে কিভাবে টর্চ্‌ ধরলে আলো একেবারে মড়ির উপর পড়বে। জানোয়ার আসার পর শিকারী ফায়ার্‌ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সঙ্কেত করা মাত্র সে টর্চের আলো ফেলবে। দুজনে ঠিক পাশাপাশি বসে, এবং সেই জন্য শিকারী তার কনুই বা পায়ের চাপ দিয়ে সহজে সঙ্কেত করতে পারে। শিকারী যেমন নিঃশব্দে তার নিজের কাজ করবে সঙ্গের লোকও তেমনি নিঃশব্দে তার টর্চ্‌ নিয়ে কাজ করবে, কারণ তাকেও কতকটা বন্দুক দিয়ে লক্ষ্য করার মতোই টর্চ্‌ নিয়ে আন্দাজ ক'রে মড়ি লক্ষ্য ক'রে আলো ফেলতে হবে আর তা করতে গিয়ে একটুও শব্দ হ'লে চলবে না। এই জন্যই কাজটা অভ্যাস সাপেক্ষ এবং তাতে একটু শিক্ষা নেওয়ার দরকার। আমার মাচানের সঙ্গী যে দু'একজনকে এই কাজ করতে শিখিয়েছিলাম তাদের বিশেষ ক'রে বলা ছিল যে কখনও ৩।৪ সেকেণ্ডের বেশী টর্চের আলো জ্বালিয়ে রাখবে না। ঐ রকম অল্পক্ষণ জ্বালিয়ে আলো বন্ধ ক'রে দেবে, তা আমি ফায়ার্‌ করি আর না করি, এবং আমি পুনরায় সঙ্কেত না করা পর্য্যন্ত ফের আলো ফেলবে না। এটা করা হয় এইজন্য যে টর্চের আলো ফেললে জানোয়ার চকিত হয়ে ওঠে এবং যদিও প্রথমটা একটু স্তম্ভিত (যাকে আলোর Shock বলা যেতে পারে) হয়ে স্থির হয়ে যায়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে বিপদের সম্ভাবনা বুঝে সরে যায়। খুব অল্পক্ষণ আলো ফেললে জানোয়ার প্রায়ই পালায় না। প্রথমতঃ সে বুঝতে পারে না কোথা থেকে এই তীব্র

আলোটা আসছে, দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হয় যে জানোয়ার ভাবে যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এ আমি দেখেছি যে বাঘ মড়ির পাশে বসে মাটিতে বুক পেট লাগিয়ে শুয়ে প'ড়ে মাংস খাচ্ছে এমন সময় দুই তিন মিনিট অন্তর ঐ রকম টর্চের আলো তিনবার ফেলা হয়েছে, আর তিনবারই বাঘটা মড়ি না ছেড়ে শুধু অল্পক্ষণ খাওয়া বন্ধ ক'রে থেকে আবার খেতে আরম্ভ করেছে। তাতেই আমার মনে হয় যে ঐ ভাবে আলো ফেললে বাঘ বা অন্য জানোয়ার মানুষের সান্নিধ্য হঠাৎ বুঝতে পারে না। সেদিন তিনবার আলো ফেলবার কারণ ঘটেছিল এই যে মড়িটা ছিল একটা সাদা গরু আর বাঘ তার পাশে শুয়ে পড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। টর্চের আলোতে আমি প্রথম দু'বার অত অল্পক্ষণের মধ্যে ঠিক ধরতে পারিনি গরুটার আর বাঘের দেহের সীমানার পার্থক্য কোথায়। তোমরা অনেকে হয়ত দেখে থাকবে যে রাত্রিতে আলো জ্বাললে হলদে-রংকে অনেকটা সাদা দেখায়। বলা বাহুল্য যে তৃতীয়বার আলো ফেলার পর বাঘ আর সেখান থেকে উঠে ঘরে ফিরে যায়নি।

উপরে যা বললাম তা থেকে তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারছ যে টর্চের আলোতে শিকার করতে হ'লে খুব দ্রুত লক্ষ্য ক'রে ফায়ার্ করতে হয়। সেইজন্য আলো ফেলবার আগেই শিকারীকে এমনভাবে প্রস্তুত হতে হয় যাতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে ফায়ার্ করতে পারে। আলো ফেলার পর বন্দুক তুলে লক্ষ্য করতে গেলে প্রায়ই দেরী হয়ে যাওয়ার, এবং তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বন্দুকের সঙ্গে গাছের ডাল বা পাতা

লেগে শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য মড়ির উপর জানোয়ার এসেছে বুঝতে পারলে আমি প্রথমে ধীরভাবে এবং নিঃশব্দে আমার সামনের ছিদ্র দিয়ে যতটা সম্ভব আন্দাজে মড়ি লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ঠিক ক'রে ধ'রে তবে পাশের লোককে আলো ফেলবার জন্য সঙ্কেত করতাম, এবং সে আলো ফেললেই আমার অন্ধকারে আন্দাজে লক্ষ্য করার জন্য যেটুকু ত্রুটি থাকত সেটুকু শুধরে নিয়ে ফায়ার্ করতাম, আর এটা করতে কখনও দুই তিন সেকেণ্ডের বেশী দেরী হত না।

আজকাল আর একরকম আলোতে শিকার করার প্রথা হয়েছে দেখতে পাই। এ হচ্ছে মোটর্কারের হেড্-লাইটের অত্যন্ত তীব্র আলোর সাহায্যে শিকার। বনের ভিতর দিয়ে মোটর্ রাস্তা গেছে, শিকারী সেই রাস্তায় মোটর্কার্ চড়ে শিকারে বা'র হন। রাস্তার ধারে বা উপরে যদি কোন জানোয়ার থাকে ঐ আলো তার চোখে প'ড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় আর সে কতকটা মেস্মেরাইস্ড্ (সম্মোহিত) হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঐ আলোর দিকে চেয়ে থাকে, মোটর্কার্ নিতান্ত কাছে এসে পড়লেও বুঝতে পারে না কত কাছে এসেছে। ঐ অবস্থায় শিকারী কার্ থেকে অতি সহজে লক্ষ্য ক'রে ঐ জানোয়ারকে মারতে পারেন। মোটরের আলোতে জঙ্গলের জানোয়ারের ঐ অবস্থা হওয়া আমি দেখেছি, কিন্তু ও অবস্থায় শিকার আমি কখনও করিনি। কেউ কেউ বলেন যে ওরকম শিকার ভালো নয়, কারণ তাতে জন্তুকে আগে অবশ ক'রে ফেলে তার পরে গুলী করা হয়। আমি কিন্তু এই কথাটা কতটা বিচারসহ তা ঠিক বুঝতে পারি না। যদি এই উপায়ে শিকার করা ভালো

শিকারীর কাজ না হয়, তা হ'লে সেই যুক্তি দিয়েই বলা যেতে পারে যে বেড় শিকারও যথার্থ শিকারীর উপযুক্ত নয় যেহেতু তাতে নিজের বুদ্ধি, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতির উপর নির্ভর ক'রে শিকারের জন্তুর অনুসন্ধান করতে হয় না। আগেই বলেছি যে শিকারের রীতিই হচ্ছে শিকারের জন্তুর উপর শিকারীর অতর্কিত আক্রমণ, বিশেষ যদি হিংস্র জন্তু হয়।

রাত্রিতে শিকারের সম্বন্ধে এবং মাচানের সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা কথা বললাম। এমন কখন কখন ঘটে যে, যেখানে শিকারী শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করবে সেখানে মাচান করার কোনও সুবিধা থাকে না। হয়ত মড়ির কাছে কোন গাছ নাই বা থাকলেও সে খুব ছোট গাছ অথবা কেবল নীচু ঝোপ আছে যেখানে মাচান করলেই নিশ্চয় জানোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই অবস্থায় লুকিয়ে থেকে প্রতীক্ষা করার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। তখন মড়ির কাছে মাটিতে গর্ত্ত বা ট্রেঞ্চ্ (trench) কেটে শিকারী তার মধ্যে বসতে পারে। তা করতে হলে মাটিটা এমন হওয়া চাই যে সেখানে সহজে একটা বড় এবং অন্ততঃ তিন ফুট গভীর গর্ত্ত করা যেতে পারে, কারণ এ প্রায়ই ঘটে যে মড়ির সংবাদ পাওয়ার পর অল্পই সময় থাকে মাচান বা ট্রেঞ্চ্ ক'রে বসার জন্য। যাতে দুই জন লোক পাশাপাশি বসতে পারে এমন গর্ত্ত হওয়ার দরকার। গর্ত্তের উপরটা কাঠ, মাটি, ঘাসের চাপড়া ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং তার উপরে পাতাশুদ্ধ সরু সরু ডাল কেটে সেগুলোকে ছোট গাছের মতো সোজা ক'রে বসিয়ে দিতে হয়, যাতে সেস্থান যে সদ্য খোঁড়া হয়েছে তা বোঝা না যায়। খোঁড়া মাটিগুলো

সেখান থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত। গর্ত্তটা এমন হওয়ার দরকার যাতে তার ভিতর বসলে শিকারী ও তার সঙ্গীর চোখ এবং মাথা ভূপৃষ্ঠের (ground level) চেয়ে উঁচুতে থাকে, তা না হ'লে তারা মড়ি বা শিকারের জানোয়ারকে দেখতে বা বন্দুকে লক্ষ্য করতে পারবে না। গর্ত্তের উপরটা ঢাকবার সময়েই আচ্ছাদনটা মাটি হতে ঐ রকম একটু উঁচু ক'রে তৈরী করতে হয়। গর্ত্তের দুই পাশে কাঠের রলা সাজিয়ে তার উপরে আচ্ছাদনের ফ্রেম্‌টা ফেললেই এটা সহজে করা যায়। আচ্ছাদনের ঠিক নীচেই মড়ির দিকে দুইটা ছিদ্র রাখতে হয়, যার ভিতর দিয়ে শিকারী ও তার সঙ্গী বাহিরের জিনিষ, বিশেষতঃ মড়ি, দেখতে পাবে, এবং ঐ ছিদ্র দিয়েই ফায়ার্ করবে। আর একটা সুড়ঙ্গ ঐ গর্ত্ত হ'তে আন্দাজ দুই হাত দূর থেকে মাটি খুঁড়ে করতে হবে যার ভিতর দিয়ে শিকারী ও তার সঙ্গী গর্ত্তের মধ্যে ঢুকতে পারবে। তারা গর্ত্তের মধ্যে যাওয়ার পর একটা ভারী পাথর বা ঐরকম কিছু দিয়ে সুড়ঙ্গর মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ার দরকার, যাতে সহজে কোন জানোয়ার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ না করতে পারে। বুঝতেই পারছ, এই সুড়ঙ্গটা কাঠের উনুনের যে মুখ দিয়ে কাঠ দেওয়া হয় কতকটা তার মতো।

ট্রেঞ্চে বসার সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। যেখানে গর্ত্ত করার সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে ট্রেঞ্চ্ মড়ির খুব কাছেই করা যেতে পারে। ট্রেঞ্চে মাচানের মতো বেশ নিরাপদে বসাও যায়। আমার কিন্তু ট্রেঞ্চের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে কষ্ট বোধ হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটুখানি জায়গার মধ্যে অন্ধকারে বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জ্জিত হয়ে বসে থাকার পর তা থেকে

বেরিয়ে আসতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। ট্রেঞ্চের আর একটা অসুবিধা এই যে এতে মড়ির খুব কাছে বসতে পারলেও, জানোয়ার যখন মড়ির খুব কাছে এসে পড়ে তখনও তাকে বন্দুক দিয়ে লক্ষ্য করা সব সময়ে খুব সহজ হয় না। মাচানে বসে চারদিক বেশ সহজে দেখা যায়, এবং উপর থেকে লক্ষ্য করতে হয় বলে বন্দুকের নিশানা করবার সাইট্‌গুলো সহজে স্পষ্টভাবে দৃষ্টির ভিতর এসে পড়ে, কিন্তু ট্রেঞ্চে বন্দুককে প্রায়ই মাটির উপর শুইয়ে এবং মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধ'রে লক্ষ্য করতে, এমন কি জানোয়ারের অবস্থান বিশেষে সময় সময় একটু উর্দ্ধমুখ ক'রেও ধরতে হয়, আর তাতে অনেক সময় দৃষ্টিতে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ট্রেঞ্চের সামনের জমির উপরিভাগ অল্প অসমতল থাকলেই জানোয়ারকে লক্ষ্য করার সময় যে লক্ষ্যকারীর দৃষ্টিতে বাধা পেতে পারে তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। যদিও ট্রেঞ্চের ভিতর বসে আমি অনেকবার বাঘ শিকার করেছি, তবু এই সব কারণে আমি কখনই ট্রেঞ্চে বসে বেশ স্বচ্ছন্দে বন্দুক চালাতে পারতাম না। ঐরকম একদিনের ঘটনা বলি। সে দিন আমি আমার বালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেঞ্চে বসেছিলাম, এবং ঐ দিনই সে তার প্রথম প্যান্থার্‌ শিকার করে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। জঙ্গল থেকে অল্প দূরে চষা মাঠের মধ্যে একটা গরুর মড়ি, মড়িটার অধিকাংশই বাঘে খেয়ে গেছে, অল্প একটু অবশিষ্ট আছে। তার খুব কাছেই ক্ষেতের একটা আইলের পিছনে ট্রেঞ্চ্‌ ক'রে দু'জনে বসেছি। ছেলের অনুরোধে তার হাতেই জোড়নলী বন্দুক দিয়েছি। বসে থেকে থেকে প্রায় মাঝ

রাত্রিতে ছেলে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল যে সে তার ঠিক সাম্‌নে খানিকটা দূরে জঙ্গলের ধারে একজোড়া প্যান্থার্ দেখতে পাচ্ছে। তাকে ইঙ্গিত করায় সে স্থির হয়ে বসল। আমার সামনের ছিদ্র দিয়ে আমি জানোয়ার দু'টোকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই ছেলে ফায়ার্ করল এবং বলল যে একটা বাঘ এসে মড়ির কাছে বসামাত্র সে ফায়ার্ করেছে আর সেটা পড়েছে। অপর বাঘটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বলল। তাকে স্থির হয়ে বসে প্রতীক্ষা করতে বললাম। প্রায় একঘণ্টা পরে সে বলল যে অপর বাঘটা আবার এসেছে এবং জঙ্গলের ধারে মাঝে মাঝে চলা-ফেরা করছে। সেই সময়ে আমার ইচ্ছা হ'ল যে আমি ঐটাকে মারি। ছেলেকে বলায় সে তার জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিল, কারণ মড়িটা ঠিক তার সম্মুখের ছিদ্র দিয়েই ভালো দেখা যাচ্ছিল। তখন আমি সেই প্যান্থার্‌কে দেখতে লাগলাম। জঙ্গল থেকে এক এক বার বেরিয়ে ঝোপের ধারে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার জঙ্গলের ভিতর চলে যাচ্ছে। এই রকম কয়েক বার ক'রে সে ক্রমশঃ সাহস সঞ্চয় ক'রে মড়ির দিকে এগিয়ে আসল। তখন লক্ষ্য করবার জন্য বন্দুক ঠিক ক'রে ধরতে গিয়েই একটা বিষম খট্‌কা লেগে গেল আমার। রাত্রিতে লক্ষ্য করতে হ'লে আমি বন্দুকে সর্ব্বদা নাইট্-সাইট্ (night-sight) ব্যবহার করতাম, কারণ বাল্যকাল থেকে আমার দৃষ্টি-শক্তি কিছু খর্ব্ব ছিল। নাইট্-সাইট্ মানে একটা সাদা রঙের উজ্জ্বল বড় পুঁতির মতো জিনিষ যা বন্দুকের ফোর্‌সাইট্ বা মাছিতে ইচ্ছামত পরিয়ে দেওয়া এবং খুলে নেওয়া যায়। ঐ নাইট্-সাইট্ ব্যতীত আমি রাত্রিতে বন্দুকে লক্ষ্য করতে

পারতাম না! সেদিন রাত্রিতেও আমি বন্দুকের মাথায় নাইট্-সাইট্ লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু বন্দুকটাকে লক্ষ্য করবার মতো ধরতে গিয়ে সেটাকে দেখতে পেলাম না। ঐ-টা না দেখতে পেয়ে আমার সব গোলমাল হয়ে গেল এবং বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, কারণ আমি জানতাম যে নাইট্-সাইট্ না থাকলে আমার লক্ষ্য ঠিক হবে না। বন্দুকের নলাকে ছিদ্রের বাহিরে রেখেই বন্দুককে নানারকম ক'রে ধরে চেষ্টা করলাম যে নাইট্-সাইট্টা দেখতে পাই কিনা। মনে ভয়ও হ'ল যে হঠাৎ আমার দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ হয়ে গেল না কি? তখন যে ছেলেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমি সরে বসব তারও উপায় ছিল না,. কারণ বাঘ কাছে এসে গেছে, ঐ কাজ করতে গিয়ে কিছু না কিছু শব্দ হবেই আর তাতে বাঘ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তবুও তাই করা উচিত ছিল, কারণ তা হ'লে খানিকক্ষণ পরে বাঘের পুনরায় ফিরে আসবার কতকটা সম্ভাবনা থাকত। যাই হোক, আমি তা না ক'রে বিনা নাইট্-সাইট্তেই লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে আমার নড়া-চড়ার শব্দে বাঘ চকিত হয়ে উঠেছে এবং ফিরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বনের দিকে সরে যেতে আরম্ভ করেছে। খানিকটা যাচ্ছে আবার দাঁড়াচ্ছে, সন্দিগ্ধ হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে, আবার কয়েক পা যাচ্ছে। দেখলাম যে দৃষ্টির বাহিরে চলে যায়। আর অপেক্ষা না ক'রে ফোর্সাইট্ না দেখতে পেয়েও ফায়ার্ করলাম। বাঘ তখন অনেকটা দূরে গেছে, তার লাগল না, পালিয়ে গেল। তার পর ট্রেঞ্চ্ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম যে নাইট্-সাইট্টা বোধ হয় বন্দুকের সঙ্গে ভালো ক'রে আটকান না থাকাতে ছেলে

যখন প্রথম ফায়ার্ করে তখন বন্দুকের ঝাঁকানিতে সেটা ছিট্‌কে একটু দূরে মাটিতে পড়েছিল।

এই শিকারটা বিফল হওয়ায় ছেলে আমাকে বড়ই অনুযোগ করল। বলল যে ঐ বাঘটাকেও তাকেই মারতে দেওয়া আমার উচিত ছিল। তার এই অনুযোগ অন্যায় হয়নি। সে তখন বালক। সেদিন তাকে প্রথম বাঘ শিকারের জন্য সঙ্গে নিয়ে বসেছি, দুটো জানোয়ারকেই তার হাতে আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। সেদিন প্রথম বাঘ মেরে তার জননীকে নিয়ে গিয়ে দেখাবে এই আনন্দে তার মনটা খুব উৎফুল্ল হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছিলাম; কিন্তু তার সঙ্গে কতকটা ক্ষোভও মিশ্রিত ছিল, দুটো বাঘই নিয়ে যেতে পারল না বলে।

যেখানে মড়ির কাছে মাচান বা ট্রেঞ্চ্ কোনটাই করার সুবিধা পাওয়া যায় না সেখানে আর এক উপায় অবলম্বন করা হয়। যদি মড়ি থেকে খানিক দূরে মাচান তৈরী করার মতো গাছ পাওয়া যায় তা হ'লে সেখানে মাচান তৈরী ক'রে মড়িটাকে সেই মাচান পর্য্যন্ত মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। ঐ রকম টেনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে মাটিতে মড়ির রক্তের গন্ধ লেগে থাকবে, আর বাঘ এসে মড়ি না দেখতে পেয়ে ঐ গন্ধ অনুসরণ ক'রে মড়ির কাছে উপস্থিত হবে এবং তখন শিকারী ঐ মাচান থেকে বাঘকে শিকার করার সুযোগ পাবে। অনেক সময় কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় না, কারণ দেখেছি যে মড়ি বেশী দূর সরিয়ে নিয়ে গেলে বাঘ প্রায়ই সন্দিগ্ধ হয়ে সেদিকে সহজে যেতে চায় না। তা হ'লেও ট্রেঞ্চে বসার চেয়ে এই উপায় অবলম্বন করা আমি বেশী পছন্দ করতাম এবং তা ক'রে কয়েকবার শিকারে কৃতকার্য্য হয়েছি।

ট্রেঞ্চে একা অনেকক্ষণ বসে থাকলে মনে হ'ত যেন নিঃসঙ্গ কারাবরোধ (Solitary confinement) ভোগ করছি। কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে বনের মধ্যে একা সমস্ত রাত্রি মাচানে বসে থাকলেও কষ্ট বোধ করতাম না। এমন কত রাত্রি কেটেছে যে লোকালয় থেকে দুই তিন ক্রোশ দূরে সন্ধ্যার সময় মানুষের বা অপর কোন জন্তুর মড়ির উপর একা মাচানে বসেছি আর তার পরদিন প্রভাতে আমার লোকেরা আসার পর মাচান থেকে নেমেছি। জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিস্তব্ধ বনভূমির দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনই গম্ভীর। আকাশে চাঁদ ক্রমশঃ যেমন সরে যায়, আলো ও ছায়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বনভূমির চেহারাও তেমনি বদলাতে থাকে। যেখানে আগে অন্ধকার ছিল ক্রমশঃ সেস্থান উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আলো আঁধারে অদ্ভুত মায়া রাজ্যের সৃজন করে, আর এক অপূর্ব্ব অনুভূতি মনে জেগে ওঠে। বাতাসে গাছের মাথায় মাথায় যখন পাতাগুলি চাঁদের আলো প্রতিফলিত ক'রে কাঁপতে থাকে তখন মনে হয় কাছে দূরে কিরণ-শরীরী কা'রা সব ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠছে। শিশির পড়ার টুপ্‌টাপ্ শব্দ, মৃদু বাতাসের শির্‌শির্ শব্দ এই অনুভূতিকে আরও গাঢ় ক'রে তোলে। সময়ে সময়ে ঠিক মনে হয় কা'রা যেন আশে-পাশে চুপি চুপি কথা কইছে, চমকে উঠতে হয় আর উৎকর্ণ হয়ে শুনতে ইচ্ছা হয়। নিঃসঙ্গ হয়ে বসে থাকলেই এই অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করত, না হ'লে নয়।

যারা সচেতনভাবে কবির অনুভূতি নিয়ে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে সক্ষম নয় তারাও বোধ হয় এই মায়ার প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। এর একটা প্রমাণ

শিকারের কথা

একবার কয়েকজন জঙ্গলবাসী খড়িয়ার (যাদের কথা আগে বলেছি) মুখে পেয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার ক'রে বেড়াচ্ছি এমন সময় এই খড়িয়াদের সঙ্গে দেখা হয়। জঙ্গলের অনেক গল্প তাদের সঙ্গে হ'ল। জঙ্গলের মধ্যে অনেক জায়গায় দেবতা থাকবার কথা তাদের মুখে শুনলাম। তার পর তাদের মধ্যে একজন তাদের ভাষায় বলল,—"বাবু, তুমি আমাদের সঙ্গে একটা পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রিতে এখান থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অমুক পাহাড়ের ভিতর অমুক জঙ্গলে যেতে পার ? তা হ'লে আমরা এমন কিছু দেখাতে পারি যা তুমি কখন দেখনি। সেখানে একটি ঝরণা অনেক উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে। তোমাকে সেই ঝরণা থেকে একটু দূরে গোপন জায়গায় একটা গাছে-ঘেরা উঁচু পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে আমরা চলে আসব। তুমি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবে। দেখতে পাবে রাত্রি যখন গভীর হবে তখন পরীর মত অতি সুন্দরী কয়েকটি মেয়ে ঐ ঝরণা বেয়ে একে একে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তারা নামছে আর জায়গায় জায়গায় চুল এলো ক'রে দিয়ে ঝরণার জল ছড়িয়ে স্নান করছে। তাদের রঙ্ এত উজ্জ্বল যে মানুষের সে রকম রঙ্ দেখা যায় না। খানিকক্ষণ ঝরণার জলে এই রকম স্নান আর খেলা ক'রে তারা আবার একে একে ঝরণা বেয়ে উপরে উঠে মিলিয়ে যায়।" তাদের দলের অন্য দু'একজন খড়িয়া ঘাড় নেড়ে এই গল্পের সত্যতার সমর্থন করল। আমি এই গল্প শুনে তাদের মতো জঙ্গলবাসীরও কবিজনোচিত মায়া সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এবং তার সঙ্গে বর্ণনার ভঙ্গীতে বিস্মিত হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য

আমি তাদের সঙ্গে পরী দেখতে যাইনি। যে পাহাড়ের নাম তারা করেছিল সেখানে কখন কখন আমার গতিবিধি ছিল, তার ত্রিসীমানায় লোকালয় ছিল না। বুঝতেই পারছ এরা কি ক'রে পরী দেখেছিল। সে ঐ ঝরণার জলে আর তার আশে পাশে লতায় পাতায় ধীরগতিশীল চাঁদের কিরণের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

ম্যান্-ইটার্ প্যান্থার্ যে কি ভয়ানক জানোয়ার এবং গ্রামের ভিতরে, এমন কি ঘরের ভিতরে থেকেও অবস্থা বিশেষে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না তা আগেই বলেছি। তাদের ভীষণ চতুরতা সম্বন্ধে আমার জানা ঘটনা আর দু'একটা বলি।

জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে জঙ্গল কেটে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ধান-জমি তৈরী করেছে এমন অনেক জায়গা ছিল আমার এলাকার ভিতর। ঐ সব জমিতে বন্য হস্তীর উপদ্রব খুব। ধানের শীষ পুষ্ট হয়ে ওঠার সময় থেকে এই উপদ্রব বেশী হয়। ঐ সময়ে হাতীর দল এসে রাত্রিতে ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে এবং ধানগাছ মাড়িয়ে বিধ্বস্ত ক'রে চলে যায়। সেই কারণে গ্রামবাসীরা তাদের ফসল রক্ষা করবার জন্য ঐ সব জমি রাত্রিতে পাহারা দেয়। ক্ষেতের পাশে জঙ্গলের ধারে বড় বড় গাছে তারা মাচান বেঁধে সমস্ত রাত্রি মাচানে ব'সে বা শুয়ে কাটিয়ে দেয়। বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঐ সব মাচানের উপর পাতা বা খড় দিয়ে ছেয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে আগুন আর টিনের কেনেস্ত্রা থাকে। রাত্রিতে হাতীর সাড়া পেলেই তারা কেনেস্ত্রাগুলো কাঠ দিয়ে বাজাতে থাকে আর আগুন জ্বালিয়ে তোলে এবং তা ক্ষেতের ভিতর ছুড়ে দেয়। একটা কেনেস্ত্রা বেজে উঠলেই কাছাকাছি যত লোক তাদের নিজ নিজ ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে সকলেই কেনেস্ত্রা বাজিয়ে চীৎকার ক'রে, সোরগোল ক'রে

ওঠে, আর তাতে ভয় পেয়ে হাতীর দল পালিয়ে যায়। যতদিন না ধান কেটে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে ততদিন গ্রামের লোকেরা এই রকম ক'রে তাদের ফসল রক্ষা করে। তোমরা বুঝতে পারছ কত কষ্টে এই সব দরিদ্র প্রজা তাদের ক্ষুধার অন্ন অর্জ্জন করে। ঐ রকম পরস্পর নিকটবর্ত্তী কয়েকটা গ্রামে একবার ম্যান্-ইটার্ প্যান্থারের উপদ্রব হয়েছিল। বাঘ গ্রামের বসতির মধ্যে এবং ঘরে ঢুকে কয়েকটা মানুষ মারার পর লোকেরা খুব বেশী সতর্ক হওয়ার ফলে দিনকয়েক মানুষ মারা বন্ধ হয়। কিন্তু বাঘ যে রাত্রিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চিহ্ন গ্রামবাসীরা দেখতে পেত। আমাকে সংবাদ দেওয়ায় আমি সেখানে গিয়ে জানোয়ারটাকে মারতে চেষ্টা করব সঙ্কল্প করেছি, এমন সময় এক ভয়ানক ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধ্যার পরে একজন সাঁওতাল গৃহস্থ ও তার স্ত্রী রোজ যেমন যায় তেমনি তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আধ মাইল দূরে বনের মধ্যে তাদের ক্ষেত পাহারা দিতে গেল। তারা তাদের মাচানে বসার পর পুরুষটি তার স্ত্রীকে বলল—"আমি প্রথম রাত্রিটা ঘুমুই। তুই জেগে থাক। মাঝ রাত্রিতে আমাকে জাগিয়ে দিস্, তারপর তুই ঘুমুবি।" এই বলে সে ঘুমুল। রাত্রি যখন গভীর হ'ল, তখন গাছের ডালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে স্ত্রীলোকটির তন্দ্রা আসল। সেই সময় পুরুষটি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। স্ত্রী চমকে জেগে উঠে দেখল যে একটা প্যান্থার্ তার স্বামীর ঘাড়টা কামড়ে ধরেছে। তখন সেও চীৎকার ক'রে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে বাঘকে আঘাত করতে লাগল। দুই একটা আঘাতের পর বাঘ সেই লোককে

ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নীচে চলে গেল। চীৎকার শুনে নিকটে যারা নিজেদের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল, তারা ছুটে এল। তারা আসতে আসতেই সেই লোকটির মাচানের উপরেই মৃত্যু হ'ল, তার ঘাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার পরদিন দ্বিপ্রহরে আমি এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে গেলাম, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছুলাম। যা দেখলাম তাতে বুঝতে পারলাম ঐ প্যান্থার্ কি ভয়ানক চতুর হয়ে উঠেছে। তখন বর্ষার শেষ, মাটি ভিজে এবং রাস্তায় কাদা রয়েছে। গ্রামের লোকেরা দেখিয়ে দিল যে মৃত লোকটির বাড়ীর দরজা থেকে তার মাচানের গাছ পর্য্যন্ত নরম মাটিতে স্বামী-স্ত্রীর পায়ের দাগের সঙ্গে প্যান্থারের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেশ বোঝা গেল যে সন্ধ্যা থেকে বাঘ গ্রামে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল এবং যখন ঐ স্ত্রী পুরুষ তাদের ঘর ছেড়ে মাচানে গেল, তখন তাদের অনুসরণ করেছিল আর তারপর মাচানের কাছে অপেক্ষা ক'রে বসেছিল, কখন এরা ঘুমিয়ে পড়বে। ম্যান্-ইটার্ প্যান্থার্ সাধারণতঃ জাগ্রত এবং সতর্ক পূর্ণবয়স্ক মানুষকে সহজে শিকারের জন্য আক্রমণ করে না, বিশেষ যদি একাধিক লোক একত্র থাকে। এই জানোয়ারের আক্রমণ ছেলেমেয়েদের উপরে বা ঘুমন্ত পূর্ণবয়স্ক মানুষদের উপরেই অধিকাংশ সময়ে হয়ে থাকে, এ আমি আগেই বলেছি।

আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছুলাম তার আগেই লোকটির মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে এসেছে। সেই মৃতদেহ নিয়ে বাঘের প্রতীক্ষায় বসে থাকা নিষ্ফল ; কারণ তা করতে হ'লে ঐ মড়িকে মাচানের উপরে নিয়ে যেতে হয়, এবং এ কখনই আশা করা

যায় না যে ঐ মড়ির লোভে পরদিন রাত্রিতে বাঘ আবার মাচানের উপর উঠে আসবে। সুতরাং আমি আমার নিজস্থানে ফিরে এলাম। আসবার আগে বিশেষ ক'রে আশে-পাশে গ্রামের লোকদের ব'লে এলাম যেন বাঘ পুনরায় কোন মানুষকে মারলে তৎক্ষণাৎ আমি সংবাদ পাই। সেই সঙ্গে আর এক উপায়ের কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম যে এইবার এসে ঐ সব গ্রামের কোন এক গ্রামে জঙ্গলের ধারে কোন বাড়ী থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে তার একটা ঘরের দরজা খুলে রেখে, দরজার কাছে রাত্রিতে খাটিয়াতে শোবার ভাণ ক'রে পড়ে থাকব। বাঘ যখন মানুষ শিকারের সন্ধানে আমাকে ঘুমন্ত ভেবে কাছে আসবে তখন গুলী করব। যে বাঘ মানুষ শিকারের সন্ধানে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে ঐ উপায়ে পাওয়া অসম্ভব নয়। কাজটা কিন্তু বিপজ্জনক। সেই জন্য স্থির করেছিলাম যে, যে দরজা খুলে শুয়ে থাকব সেই দরজার ফাঁকটাতে এমন ভাবে গোটাকয়েক কাঠের রলা পুতে দেব যাতে বাঘ খুব সহজে ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পাবে এবং তাই দেখে আকৃষ্ট হবে, কিন্তু হঠাৎ এসে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই উপায় জ্যোৎস্না রাত্রিতেই অবলম্বন করা চলে, অন্ধকার রাত্রিতে নয়, কারণ অন্ধকারে গ্রামের পথে বাঘের আসা যাওয়া টের পাওয়া যাবে না। সে নিঃশব্দে আসবে, নিঃশব্দে যাবে। মড়ির উপর আসলে অন্ধকারেও বুঝা যায় মড়িকে টানার শব্দে বা মাংস খাওয়ার শব্দে, এবং তখন তার উপর টর্চের আলো ফেলে করা যায়।

এই ঘটনার পরে কিন্তু, কেন বলতে পারি না, ঐ বাঘের উপদ্রব ঐ দিকে আর শোনা যায়নি। এর কিছুদিন পরে সংবাদ পেয়েছিলাম যে আমার এলাকার বাহিরে ঐ এলাকার সংলগ্ন অপর একটি করদ রাজ্যে ঐ রকম ম্যান্-ইটার্ প্যান্থারের উপদ্রব হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত এই বাঘের অদৃষ্টে কি ঘটল তার আর সংবাদ পাইনি।

অপর এক ঘটনায় আর একটা ম্যান্-ইটার্ প্যান্থারের ঐ রকমই অসাধারণ চতুরতার প্রমাণ পেয়েছিলাম। আমার এলাকার যে কয়েকটা গ্রামে ঐ বাঘের উপদ্রব হয়েছিল সে গ্রামগুলো পরস্পর নিকটবর্ত্তী ছিল না, জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। এই বাঘটাই আমার অনুগত একটি গ্রামের প্রধানকে সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরে তার ঘরের মধ্যে এসে শিকারের উদ্দেশ্যে হত্যা ক'রে যায়; যার কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। এই সংবাদ পাওয়ার দিন কয়েক পরে আমি ঐ অঞ্চলে শফরে বেরিয়েছিলাম, প্রধান উদ্দেশ্য যে যদি বাঘটার সন্ধান পাই মারতে চেষ্টা করব। আজ এ গাঁয়ে, কাল সে গাঁয়ে, এই রকম ক'রে ক্যাম্প্ করছিলাম। কয়েকদিন ক্যাম্প্ করার পর একদিন দ্বিপ্রহরে সংবাদ পেলাম যে পূর্ব্বদিন মধ্য রাত্রিতে আমার ক্যাম্প্ থেকে ছয় সাত মাইল দূরে এক গ্রামে একটি ৭।৮ বৎসরের ছেলেকে বাঘে নিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে রওনা হলাম। পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দুর্গম রাস্তা, যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা হতে আন্দাজ দু'ঘণ্টা বাকী আছে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তা বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি নক্সা দিলাম, নক্সাটা দেখ।

ছোট গ্রামে জঙ্গলের ধারে এক সাঁওতালের বাড়ী। বাড়ীতে তিনখানা খড়ে ছাওয়া ঘর তিনদিকে, মাঝখানে উঠান। একটা ঘর থেকে অপর ঘরের মধ্যে ব্যবধানগুলো এবং উঠানটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। জঙ্গলের গাছ কেটে তা দিয়ে রলা বানিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে মাটিতে পুতে ঐ বেড়াগুলো মজবুত ক'রে তৈরী করা হয়েছে, যাতে উঠানের দরজা বন্ধ থাকলে সহজে জঙ্গলের
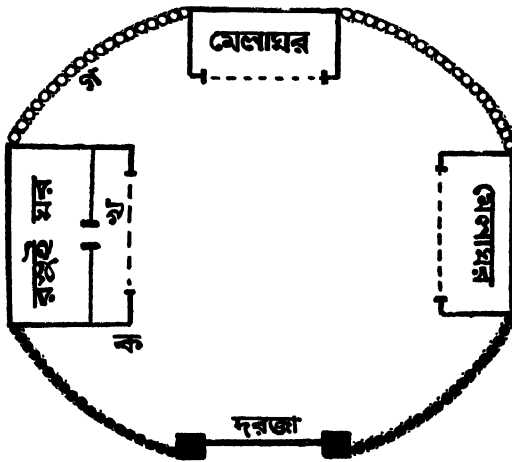
জানোয়ার বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পারবে না। উঠানের দরজাটা ঐ রকম রলার একটা ফ্রেম্। বেড়াগুলোর মধ্যে 'গ' চিহ্নিত স্থানের বেড়াটা কিছু নীচু, প্রায় ৪ হাত উঁচু হবে। অপর জায়গায় বেড়া প্রায় ৬ হাত উঁচু। ঘরগুলোর মধ্যে যেটা বড় সেটা ভাত-ঘর বা রস্থই ঘর, আর ঐটাই শোবার ঘর। কোল-সাঁওতালেরা সাধারণতঃ তাদের রস্থই ঘরকেই প্রধান ঘর বা শোবার ঘররূপে ব্যবহার করে। ঐ ঘর চারদিকেই দেয়ালে

ঘেরা, আর তাতে একটিমাত্র দরজা। ঘরের দরজাটা বাঁশের শক্ত ফ্রেম বা জাফ্রির তৈরী। ঐ ঘরের সামনে একটা খড়ে ছাওয়া পিণ্ডা বা বারান্দা, যা পার হয়ে উঠানে নামতে হয়। অপর দুইটা ঘর ছোট, উঠানের দিকে দেওয়াল-ঘেরা নয় এবং তাতে রাত্রিতে কেউ শোয় না। বাঘের উপদ্রব হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা হতেই উঠানের দরজা বন্ধ ক'রে রাখা হত আর রাত্রিতে ঐ সাঁওতাল গৃহস্থ আর তার স্ত্রী তাদের ৭।৮ বৎসরের ছেলেটিকে নিয়ে ভাতঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমুত। ঘটনার রাত্রিতে প্রায় মাঝরাত্রির সময় ছেলে জেগে উঠে প্রস্রাব করবে বলায় তার মা ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়ায় এবং তার পিছনে ছেলেটি বেরিয়ে আসে। ছেলে যখন বারান্দার উপর 'খ' চিহ্নিত স্থানে এসেছে সেই সময় বাঘ উঠানের একপাশে তার লুকিয়ে বসে থাকবার জায়গা ('ক' চিহ্নিত স্থান) থেকে লাফ দিয়ে এসে ছেলেকে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে 'গ' চিহ্নিত স্থানে নীচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকল। স্ত্রীলোকটির চীৎকারে তার স্বামী জেগে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু তার আগেই বাঘ ছেলেকে নিয়ে গেছে। তাদের চীৎকারে গ্রামের লোকেরা আলো জ্বালিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ছেলের অনুসন্ধান করতে তারা সাহস করল না। প্রাতঃকাল হতেই সকলে মিলে রক্তের দাগ অনুসরণ ক'রে বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে গভীর জঙ্গলে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেল, তখন তার শরীরের অনেকটা মাংসই বাঘে খেয়ে গেছে।

আমি দেখলাম বারান্দার উপর এবং 'গ' চিহ্নিত বেড়ার উপর তখনও রক্তের দাগ রয়েছে। ছেলেটির মা আমাকে যেখান থেকে বাঘ লাফিয়ে এসে ছেলেকে ধরেছিল সে জায়গা দেখিয়ে দিল। ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম সেখানে মাটিতে দু'-একটা বাঘের লোম পড়ে আছে। এই বাঘ যে কি ভয়ানক চতুর হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা গেল। মানুষ শিকারের উদ্দেশ্যেই সে রাত্রিতে বেড়া পার হয়ে ভিতরে এসে প্রতীক্ষা করছিল,—কেউ ঘর থেকে বা'র হয় কি না। মা আর তার পিছনে ছেলে বাহির হয়ে আসায় সে বুঝে নিল যে একজন পূর্ণ-বয়স্ক মানুষকে নিয়ে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়া ঢের সহজ হবে, এবং সে তাই করল। কোন্ দিকের বেড়া পার হওয়া সহজ হবে তাও যেন সে আগে হতে ঠিক ক'রে রেখেছিল বলে মনে হয়। এ যেন মানুষের মতো বুদ্ধি। এই জন্যই অনেক সময় ঐ সব নিরক্ষর গ্রামবাসীরা বিশ্বাস ক'রে বসে যে, যে বাঘটা মানুষ মারছে আসলে সে বাঘই নয়, বাঘ-বেশী ভূত! যে বুদ্ধির জোরে শিকারীর হাত থেকে ঐ রকম একটা বাঘ আপনাকে দীর্ঘকাল রক্ষা ক'রে এবং মানুষের সাবধানতাকে ব্যর্থ ক'রে তার নিজের গোপন ভীষণ কাজটি চালিয়ে যায়, একটা জানোয়ারের যে অত বুদ্ধি থাকতে পারে এই সব লোকেরা তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না বলেই তারা তার কাজগুলোকে ভূতের আচরণের মতোই রহস্যময় মনে করে।

সেই গৃহস্থের ঘর দেখে আমি গ্রামের কয়েকজন লোকের সঙ্গে মড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রাম থেকে একটা খাটিয়া আর দড়ি নিলাম মাচান বাঁধবার জন্য, কারণ লোকেরা

বলল যে মাচান তৈরী হয় নি। জঙ্গলে কয়েকজন লোক মড়ি পাহারা দিচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা হতে আর অল্পই বাকী আছে। দেখলাম ছেলেটির বুক পেট আর একখানা পায়ের অধিকাংশ মাংসই খেয়ে গেছে। হাত দুইটা, একটা পা আর মাথাটা আস্ত আছে। হাত দুইটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এমন-ভাবে, যেন কে করাত দিয়ে পরিষ্কার ক'রে কেটেছে। বাঘ যে ছুরি বা করাত দিয়ে পরিষ্কারভাবে কাটার মতো ক'রে দাঁত দিয়ে কামড়ে মড়ির শরীরের কোন অংশ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এ আমি কয়েকবার দেখেছি। একটা ঝোপের ভিতর মড়িটা এমনভাবে পড়েছিল যে দেখলেই বোঝা যায় যে ইচ্ছা ক'রে সেটাকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে লুকানো হয়েছে। ঐখানেই মড়িকে লতা দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে, আর এক দিকের ডালপালা একটু সাফ ক'রে দিয়ে সেই দিকে খানিক দূরে একটা গাছে তাড়াতাড়ি মাচান তৈরী করতে বললাম। মাচান করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমি মাচানে বসলাম, টর্চের আলো ফেলতে অভ্যস্ত একজন পিয়ন আমার সঙ্গে বসল। মাচানে বসেই বুঝতে পারলাম যে মাচান করতে একটা গুরুতর ভুল হয়ে গেছে। সেদিন মাচান করবার ভার ঐ কাজে অভ্যস্ত পিয়নের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে যে এত বড় ভুল করবে তা বুঝতে পারিনি। দেখলাম মড়ি আর মাচানের লাইনের উপর প্রায় অর্দ্ধপথে আর একটা গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছটা একেবারে ঠিক ঐ লাইনের উপর না থেকে অতি সামান্য মাত্র একপাশে অবস্থিত ছিল। ফলে হয়েছিল এই যে যতক্ষণ একটুও দিনের আলো ছিল ততক্ষণ পিয়ন মাচান তৈরী করার

সময় বুঝতে পারেনি যে রাত্রিতে ঐ গাছটা তার এবং আমার দৃষ্টিকে বাধা দেবে। দিনের আলোতে সে একবার মাত্র দেখে নিয়েছিল যে মড়ি দেখা যাচ্ছে, আর তাই দেখেই মাচানের স্থান ঠিক ক'রে নিয়েছিল। মাচানে বসার পর যখন পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য তাকে মড়ির উপর টর্চের আলো ফেলতে বললাম তখন যদিও একেবারে গাঢ় অন্ধকার হয়নি তবুও সে প্রথমটা বার বার চেষ্টা ক'রেও আলো ফেলতে পারল না, অনেকবারের পর তবে ফেলল। মড়ির উপর আলো ফেলার পরও দেখা গেল যে মাঝখানের গাছটা টর্চের আলো এমনভাবে প্রতিফলিত করছে, অর্থাৎ ঐ আলোতে হঠাৎ এত বেশী উজ্জ্বল আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যে তার পিছনে ঝোপের মধ্যে মড়িটা খুব বেশী চেষ্টা না করলে দেখা যাচ্ছে না, সেটা আপনি চোখের উপর ভেসে উঠছে না। আমি উদ্বিগ্ন হলাম, ভয় হ'ল যে শিকারটা বিফল হবে, আর শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ালও তাই। তখন যে অন্য জায়গায় মাচানটা সরিয়ে দেব, তার আর উপায় ছিল না। তা করতে গেলে রাত্রি অনেক হয়ে যায় এবং রাত্রিতে মড়ির কাছে সোর গোল করা হয়, যা করা মোটেই উচিত নয়। অন্য উপায় না দেখে স্থির করলাম যে ঐ মাচানে বসেই সেদিন নিজের আর বাঘের ভাগ্য পরীক্ষা করব। অন্ততঃ গুলী করবার একটা অবসরও (chance) ত পাবার সম্ভব। পিয়নও বলল যে খুব সম্ভব সে ঠিক মতো আলো ফেলতে পারবে।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় মড়ির উপর বাঘ আসল। প্রথমে একটু খুস্ খাস্ শব্দ আর তার পর মাংস ও হাড় চিবানর শব্দ সুরু হল। বন্দুক ঠিক ক'রে ধরে আলো ফেলবার জন্য সঙ্কেত

করলাম। পিয়ন আলো ফেলতে গিয়ে পূর্ব্বের মতোই গোলমাল করতে লাগল। আমার সঙ্কেতানুসারে সে যতবারই চেষ্টা করল ততবারই বিফল হ'ল। এক মুহূর্ত্তও স্থির ভাবে মড়ির উপর আলো রাখতে পারল না। সে পারবে কি ক'রে? আলো ফেললেও সে যে নিজে মড়ি দেখতে পাচ্ছে না। একবার দেখলাম যেন বিদ্যুতের মতো দ্রুত গতিতে মড়িটার উপর আলো খেলে গেল। কিন্তু বাঘকে ভালো করে দেখবারও অবসর পেলাম না। মনে হ'ল যেন বাঘ দেখতে পেলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ততক্ষণে বার বার আলোর খেলা দেখে বাঘ খাওয়া বন্ধ করেছে, মড়ির উপর রইল কি সরে গেল বোঝাই গেল না। অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে আবার প্রায় পনের মিনিট পরে খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এবার আর আলো ফেলতে সঙ্কেত করলাম না। আন্দাজ ক'রে ফায়ার্ করলাম। ফলে যা হবার তাই হ'ল। গুলী লাগল না। তারপরও অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম। বাঘ আর এল না। গ্রামের লোকেরা দূরে একটা খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিল। চীৎকার ক'রে ডাকায় তারা আসল। আমরা মাচান থেকে নামলাম। আলোতে দেখলাম পিয়ন প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো হয়েছে। এরকম ভুল এবং তার জন্য এত বড় নিষ্ফলতা তার আর কখনও হয়নি। আমি তাকে কিছু বললাম না। সে বড় বিশ্বাসী এবং সাহসী চাকর ছিল। শিকারেই হোক বা অন্য সম্পর্কে হোক অনেক বড় বড় বিপদের সময় সে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সেদিনকার নিষ্ফলতায় আমার কিন্তু যে মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ হয়েছিল তা শিকারে আমার আর একবার মাত্র হয়েছিল,

তার কথা পরে বলব। এই জন্যই এর আগে বলেছি যে আমার বিফলতার গল্পগুলোর মধ্যেই বেশী বিশেষত্ব আছে।

ঐ বাঘকে আমি মারতে পারিনি। এই শিকার বিফল হওয়ার পর ঐ অঞ্চলের লোকদের ভয় আরও বেশী হয়েছিল। আফিসের আর কাছারীর কাজ ছেড়ে আর বেশী দিন মফঃস্বলে থাকতে পারলাম না, আমাকে ক্যাম্প্ ভেঙ্গে দিয়ে ফিরতে হ'ল। ফিরবার সময় বলে এলাম যে আমি আবার শীঘ্র আসব এবং বাঘটাকে মারতে চেষ্টা করব। সেই সময় ঐ অঞ্চলের একজন প্রজা, তার নাম আমার এখনো মনে আছে—'পেতেই কোল', আমার কাছে প্রার্থনা করল তাকে ঐ বাঘটা মারতে অনুমতি দেওয়া হোক। লোকটি প্রজাদের ভিতর 'শিকারী' বলে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু শিকারী বলতে যা বোঝায় সে তা ছিল না। তার 'শিকার' মানে 'কলকাঁড়' পেতে জানোয়ার মারা। কলকাঁড় কথাটার অর্থ,—যে তীর কলে ছোড়া হয়। সাঁওতালেরা তীরকে কাঁড় বলে। কাঁড় কথাটি সংস্কৃত 'কাণ্ড' শব্দের অপভ্রংস, আর কাণ্ড শব্দের একটা অর্থ তীর। কলকাঁড় জিনিষটা এই যে একটা ধনুকে তীর যোজনা ক'রে ধনুককে এমন কৌশলে পেতে রাখা হয় যাতে ধনুকের ছিলার সংশ্লিষ্ট একটা সূতাতে অতি সামান্য একটু টান পড়লেই তীরটা তৎক্ষণাৎ আপনি ধনুক থেকে ছুটে গিয়ে যেখানে ঐ সূতাতে টান পড়েছে সেইখানে আঘাত করে। জানোয়ারের চলবার পথে সূতাটা আড়াআড়ি ভাবে মাটি হতে খানিকটা উঁচু করে খাটিয়ে রাখা হয়। চলবার সময় জানোয়ারের শরীরে লেগে সূতাতে টান পড়া মাত্র ঐ তীর মহাবেগে ছুটে গিয়ে জানোয়ারকে বিদ্ধ করে। যে ধনুক সচরাচর কলকাঁড়ে

ব্যবহার করা হয় তা কোল সাঁওতালেরা যে সব ধনুক সাধারণতঃ হাতে ধ'রে ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তার একটা তীর একটা প্যান্থারের শরীরকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেদ ক'রে যেতে দেখেছি। কখন কখন কলকাঁড়ের তীরে উগ্র বিষ মাখান থাকে যার ফলে তীরটার সামান্য আঘাতেই জানোয়ারের শরীর বিষাক্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। দেখেছি যারা এই কলকাঁড় পাততে অভ্যস্ত তাদের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা খুবই অসাধারণ হয়ে থাকে। জঙ্গলের ভিতর বা গাঁয়ের ধারে নানারকম চিহ্ন দেখে তারা ঠিক বুঝতে পারে কোন্ পথ দিয়ে কোন্ বিশেষ জানোয়ার যাতায়াত করছে। যে সূতা ঐ পথে খাটিয়ে দেওয়া হয় তার উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন জানোয়ারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাখতে হয়, এবং ঐ উচ্চতাগুলো যে ঠিক ঠিক জানা থাকা দরকার তা তোমরা সহজেই বুঝতে পার। একটা রয়্যাল্ টাইগার্‌কে মারতে হ'লে যতখানি উঁচু ক'রে সূতা খাটাতে হবে, একটা প্যান্থারের জন্য তার চেয়ে নীচু করতে হবে। একই জাতের জানোয়ারের মধ্যেও আবার ছোট বড় থাকে আর তা পায়ের চিহ্ন দেখে অনুমান করতে হয়। কলকাঁড়ের আর একটা নাম "ধরম কাঁড়।" "ধরম" করান মানে দিব্বি করান। কলকাঁড় পাতা হ'লে নিকটের গ্রাম গুলোতে দিব্বি দিয়ে ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয় যেন কোন লোক ঐ দিকে না যায়, কারণ অজানিত ভাবে সূতায় টান দিলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

পেতেই কোল কলকাঁড় পাততে অতিশয় দক্ষ ছিল এবং অনেক প্যান্থার্ সে এই ঘটনার পূর্ব্বে ঐ উপায়ে মেরেছিল। যে সব গ্রামের কাছে সে বাঘ মারত সেই সব গ্রামের লোকেরা

চাঁদা ক'রে তাকে কিছু পয়সা ও চাল দিত। আমি যখনকার কথা বলছি তখন পেতেই কিছু বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ থেকেও নির্ব্বিচারে জঙ্গলের জানোয়ার হত্যার বিরুদ্ধে আদেশ ঘোষিত হয়েছে, সুতরাং তখন তার 'শিকারী'র ব্যবসায় কম পড়ে এসেছে। সে আমার ক্যাম্পে প্রায় আসত আর তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ক'রে যেত। যখন সে ঐ ম্যান্-ইটার্‌কে মারবার জন্য আমার অনুমতি চাইল তখন আমার মনটা, সত্য কথা বলতে কি, কিছু দমে গিয়েছিল। সুবিধা পেয়েও বাঘটাকে মারতে পারিনি বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম এবং শীঘ্রই ফিরে এসে পুনরায় চেষ্টা করবার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পেতেই যখন অনুমতি চাইল তখন না দিয়ে থাকতে পারলাম না, কারণ তা না দিলে অন্যায় করা হয়। আমি যত দিনে ফিরে আসব ততদিনে বাঘটা ত আরো মানুষ মারতে পারে। পেতেইকে অনুমতি দিলাম বটে, কিন্তু বলতে লজ্জা হ'লেও বলছি যে মনে মনে ভাবলাম পেতেই বাঘটাকে না মারতে পারে ত ভালো হয়, আমি ওটাকে মারব। আমার বিশ্বাস শিকারী মাত্রেরই এই রকম মনের ভাব হয়ে থাকে। শিকারীদের পরস্পরের প্রতি শিকারের বিষয়ে যথেষ্ট ঈর্ষা থাকে। তবু ত পেতেই যথার্থ শিকারী ছিল না।

যাই হোক, আমি ঐ অঞ্চল থেকে চলে আসার কয়েকদিন পরেই সেখানে পেতেইর কলকাঁড়ে বড় এক প্যান্থার্ পড়ল। আমার বিশ্বাস ঐটাই ম্যান্-ইটার্ ছিল, কারণ তার পর থেকে ম্যান্-ইটারের উপদ্রব বন্ধ হয়েছিল।

প্যান্থারের চতুরতার বিষয়ে যে দুইটা গল্প বললাম, আমার

ধারণা ওরূপ ঘটনা ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগারের দ্বারা ঘটা সম্ভব নয়। রয়্যাল্ টাইগার্ মাচানে চড়ে মানুষকে আক্রমণ করেছে, এমন ঘটনা আমার জানা নাই। মাচান বেশী উঁচু না হ'লে ঐ বাঘ লাফ দিয়ে মাচানের উপর পড়তে পারে, এবং গাছ যদি একদিকে অনেকটা হেলে প'ড়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে রকম গাছে তার পক্ষে চড়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু রয়্যাল্ টাইগার্ সোজা গাছে বিড়ালের মতো চড়ে বেশী দূর উঠেছে এ কখনও শুনিনি। ঐরূপে গাছে চড়তে প্যান্থার্ কিন্তু খুবই সক্ষম। তাড়া পেয়ে প্যান্থার্ এত উঁচু গাছে উঠে বসে রয়েছে যে তাকে গাছের মাথায় ছোট দেখাচ্ছে, আর আমি নীচে থেকে তাকে গুলী করে ফল পাড়ার মতো ক'রে মাটিতে ফেলেছি। গুলী করা মাত্র সে চমকে উঠে নখ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরল, তারপর জলের ধারার মতো রক্ত ঝরতে লাগল, অল্পক্ষণ পরেই তার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে এল, সে গাছ থেকে খসে পড়ে, নীচের ডালগুলোতে ধাক্কা খেতে খেতে সশব্দে মাটিতে পড়ল। চিতাবাঘের মতো গ্রামের মধ্যে ঢুকে লোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ান বা ঐরকম জায়গায় লুকিয়ে বসে থাকাও রয়্যাল্ টাইগারের স্বভাব নয় তা আগেই বলেছি। তবে এমন কখন্ কখন ঘটেছে যে যেখানে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে মাত্র দু'একঘর লোকের বাস সে রকম জায়গায় ঘরের অত্যন্ত নিকট থেকে রয়্যাল্ টাইগার্ মানুষ ধরে নিয়ে গেছে।

যে ম্যান্-ইটার্ রয়্যাল্ টাইগার্কে মারবার জন্য অনেক দিন ধরে বিফল চেষ্টা করার কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, সে তার নিজের

এলাকার মধ্যে গোটাকয়েক জায়গা বেছে নিয়েছিল যেখানে তার উপদ্রব অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশী ছিল। ঐ সব জায়গার ভিতর দিয়ে যে বনপথগুলিতে মানুষের বেশী গতায়াত ছিল সাধারণতঃ সেই সব পথের ধারে সে লুকিয়ে বসে থেকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত। এই জায়গাগুলো পরস্পর কাছাকাছি ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যবধানগুলো চার পাঁচ মাইল থেকে আট দশ মাইল পর্য্যন্ত ছিল। ঐ অঞ্চলের একটা ম্যাপ্ তৈরী করেছিলাম, এবং যেমন যেমন খবর পেতাম, ম্যাপের উপর লিখে রাখতাম কোথায় কোন তারিখে বাঘে মানুষ ধরল। কোন কোন শিকারী বলেন যে সেই ম্যাপ্ দেখে বাঘ কি ভাবে রোঁদ (round) দিয়ে বেড়াচ্ছে তা বোঝা যায়, এবং আগে হতে কতকটা অনুমান করা যায় যে এইবার সে কোথায় মানুষ ধরবে। আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে কিন্তু দেখেছি যে ঐরূপ অনুমানের উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, কোন নির্দ্দিষ্ট পথ ধ'রে সে পরিক্রমণ করে না। এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে সে তার এলাকার মধ্যেই বেড়াবে, এবং যথাসময়ে এক একটি ক'রে হতভাগ্য মানুষ তার কবলে যাবে। একবার উপর্য্যুপরি তিন বার সংবাদ পেলাম যে ঐ বাঘ পরস্পর খুব কাছাকাছি তিন জায়গায় তিনটি মানুষ ধরেছে। শুনে মনে হ'ল যে সে ঐ স্থানটা ছেড়ে অন্য দিকে যেতে চাচ্ছে না। আমি ঐ স্থানের নিকটে একটা গ্রামে ক্যাম্প্ করলাম। তার পূর্ব্বে অনেকবারের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম যে মানুষের মড়ির উপর বসে অপেক্ষা করা নিষ্ফল, কারণ ঐ বাঘ মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে একবার খেয়ে, মড়ির কাছে দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না, বিশেষতঃ যদি মাচান করা যায়।

এবার আমি অন্য উপায় অবলম্বন করলাম। যে পথটাতে বাঘ অল্পদিন আগে বার বার মানুষ মেরেছে সেটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ৫।৬ মাইল গেছে। মাচান না ক'রে ঐ পথের ধারেই এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ বেছে নিলাম, যার একটা মোটা ডালে বেশ স্বচ্ছন্দে ঠেস দিয়ে বসা যায়। গাছটার সামনে একটু খোলা জায়গা, আর পাশেই একটা ঝোপ। একটা খড়ের মানুষ তৈরী ক'রে ঐ খোলা জায়গায় বসিয়ে দিলাম, এবং একখণ্ড ছোট কাঠ পুতে তার সঙ্গে ঐ খড়ের মানুষটাকে বেঁধে দিয়ে কাঠের উপর একখানা গামছা দিয়ে ঢেকে দিলাম। মূর্ত্তিটাকে মানুষের মতো কাপড় আর কোর্ত্তা পরিয়ে, উপরের অংশটাতে একটা চাদর জড়িয়ে, মাথায় একটা ছোট পাগড়ী দিয়ে তার মুখটাকে একটু নীচু ক'রে দিলাম, এবং তার পিঠে একটা কাপড়ের বোঁচকা বেঁধে দিলাম, দেখলে মনে হবে একজন পথিক ঐ জায়গায় মুখ নীচু ক'রে বসে বিশ্রাম করছে। মুখ নীচু ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য মুখটা হঠাৎ দেখা না যায়। নাক মুখ চোখ বাদে শরীরের আর সব অংশ ঠিক মানুষের মতো ক'রে দেওয়া হয়েছিল, একটু দূর থেকে মানুষেরই ভ্রম হবে যে সত্যই একজন লোক ঐ খানে বসে রয়েছে।

মড়ির নিকট ঝোপের মধ্যে, গাছের ডাল কেটে শক্ত রলা তৈরী ক'রে সেগুলো ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে গভীর এবং দৃঢ়ভাবে মাটিতে পুতে দিয়ে, একটু ছোট জায়গা সম্পূর্ণভাবে ঘিরে দিলাম, যার ভিতর একজন লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। মূর্ত্তিটার কোমরে একটা সরু দড়ি বেঁধে দড়িটা ঐ বেড়ার ভিতর পর্য্যন্ত চালিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর আমার পিয়ন রলার

বেড়া ডিঙ্গিয়ে, তার ভিতরে গিয়ে বসল। উপরটাও ঐ রকম শক্ত রলা দিয়ে ঢেকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়া হ'ল, এবং সমস্ত জিনিষটাতে এমন ক'রে পাতা সাজিয়ে দেওয়া হ'ল যাতে তাকে ঝোপেরই একটা অংশ ছাড়া আর কিছু না মনে হয়। পিয়নের সঙ্গে একটা নেপালী ছোরা এবং গুলী ভরা বন্দুক রইল। আমি রাইফল্ নিয়ে গাছের উপর বসলাম। আমি বসার পর পিয়ন মানুষের সাধারণ স্বরে মাঝে মাঝে কথা কইতে হাসতে আর গান করতে লাগল, যাতে খানিকদূর থেকে বেশ শোনা যায় যে মানুষে কথা কইছে বা গান করছে। সে মাঝে মাঝে দড়িতে অল্প টান দিয়ে মূর্ত্তিটাকে অল্প অল্প নড়াতে লাগল, দেখলে ঠিক মনে হবে যেন মানুষটা বসে বসে মাঝে মাঝে অল্প ঢুলছে। এ সব করার উদ্দেশ্য তোমরা বোধ হয় বেশ বুঝতে পারছ। বাঘ যদি ঐ পথে আসে বা নিকটে থাকে তা হ'লে মানুষের স্বর শুনে সে ঐ খানে আসবে এবং খোলা জায়গায় একজন পথিককে বসে থাকতে দেখে তার উপর লাফিয়ে পড়বে, আর তখন আমি গুলী চালাবার সুযোগ পাব। আমার কিন্তু এ চেষ্টাও তার পূর্ব্বের অন্য সব চেষ্টার মতোই বিফল হয়েছিল। পূরো দু'দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পিয়ন এবং আমি ঐ রকম ক'রে বসে রইলাম। সকাল বেলায় কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসতাম আর সন্ধ্যার পরে গ্রামের লোকেরা একত্র হয়ে আমাদের নিয়ে আসত। বাঘটা দিনেই মানুষ ধরত, আর অধিকাংশ সময়ে ম্যান্-ইটার্ টাইগার্ তাই করে, কারণ রাত্রিতে জঙ্গলের পথে মানুষ খুব কমই যায়—বিশেষ যেখানে ম্যান্-ইটারের ভয় হয়েছে। দু'দিন এই হাঙ্গাম করার পর তৃতীয় দিনে সংবাদ

পেলাম, সেখান থেকে অন্য দিকে প্রায় আট মাইল দূরে পূর্ব্বদিনে ঐ বাঘ মানুষ ধরেছে, এবং আরো শুনলাম যে সে মড়ি কেউ খুঁজতে যায়নি কারণ নিহত লোকটি ছিল একজন অজ্ঞাত পথিক এবং তাকে ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাঘে নিয়ে গিয়েছিল। তার একজন সঙ্গী এই সংবাদ নিকটের এক গ্রামে দেওয়াতে লোকে জানতে পেরেছিল। তখন ওখানে আর থাকা বৃথা জেনে ফিরে আসলাম। ইচ্ছা ছিল পুনরায় ঐ উপায় অবলম্বন ক'রে বাঘটাকে মারতে চেষ্টা করব, কিন্তু সে অবসর আর পাইনি। এর কিছুদিন পরেই আমার অন্য এলাকায় বদলী হয়েছিল।

এই ম্যান্‌ইটারের সম্পর্কে আর একটা ঘটনা বলছি। ইতিপূর্ব্বে ঐ সব অঞ্চলের সাধারণ প্রজাদের মধ্যে কোন কোন লোকের অত্যধিক ভয়ের গল্প ছু'একটা বলেছি। এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারবে তাদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসাধারণ সাহসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। জঙ্গলের ধারে এক বাংলোতে রয়েছি। সন্ধ্যার মুখে একজন চৌকিদার তার গ্রামের ৩।৪ জন লোকের সঙ্গে এসে খবর দিল যে সেই দিনই বেলা আন্দাজ দশটার সময় তার গ্রামের একজন লোককে বাঘে মেরেছে। মড়িটা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে মড়িটাকে জঙ্গল থেকে তুলে এনে গ্রামের ভিতর তার নিজের বাড়ীতে রাখা হয়েছে। গ্রামটা বাংলো থেকে দশ মাইল দূরে, আর প্রায় সমস্ত পথটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘলা রাত্রিতে অতটা পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'ল না, আর গিয়েও কোন

লাভ হত না ; কারণ একে ত সেই চতুর বাঘ, তার উপর আবার মড়িটা তুলে আনা হয়েছে। পরদিন প্রাতে বেলা ১০টার সময় সেই গ্রামে পৌঁছুলাম। হত লোকটির বাড়ীতে গিয়ে তার মৃত-দেহ দেখলাম। জোয়ান সাঁওতাল ছোকরা, তার মাথার খুলির পিছনটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, মস্তিষ্ক বেরিয়ে পড়েছে। তার মা আমাকে দেখে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ঘটনার সমস্ত বিবরণ জানতে চাওয়ায় সেখানকার লোকেরা ঐ গ্রামের আর একটি সাঁওতাল যুবককে আমার কাছে ডেকে এনে বলল যে ঐ ছোকরা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল এবং সে-ই এসে গ্রামে খবর দিয়েছিল। তখন ঐ সাঁওতাল যুবকের মুখে যা শুনলাম তাই বলছি ঃ—

পূর্ব্বদিন প্রাতে বেলা আন্দাজ নয়টার সময় ঐ ছু'জন ছোকরা কতকগুলি গরু নিয়ে গ্রামের কাছে জঙ্গলে চরাতে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর একটা নালার ধারে খানিকটা খোলা জায়গা, তারা গরুগুলোকে সেইখানে নিয়ে চরাচ্ছিল। ছু'জনের কাছেই তীর ধনুক ছিল। ঐ রকম জঙ্গল যায়গায় রাখালেরা সচরাচর তীর ধনুক সঙ্গে রাখে। যখন প্রায় ছু'প্রহর বেলা হয়েছে তখন এই ছোকরা মানুষের গলার একটা 'হুঃ' ক'রে শব্দ শুনতে পেল। শব্দের দিকে তাকিয়ে দেখল যে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে এক প্রকাণ্ড বাঘ এসে তার সঙ্গীকে ধরেছে। ঐ সঙ্গীর নিকটের গরুগুলো ছুটে পালাতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ছে আবার উঠছে। বাঘটা আক্রান্ত মানুষকে দাঁড়ান অবস্থাতেই তার ঘাড়ের উপরের দিকটা কামড়ে ধরেছে আর লোকটি তখন পড়ে যাচ্ছে। এই

দর্শক ছোকরার সঙ্গে ছিল দুইটি মাত্র তীর। সে একটা তীর ধনুকে জুড়ে ছাড়ল। অতিশয় ত্রস্ত হয়ে তীর ছেড়েছিল বলে তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। বাঘ একবার ফিরে এর দিকে চেয়ে দেখে আবার তার শিকারকে কামড়ে ধরল। তখন এই ছোকরা চীৎকার ক'রে দ্বিতীয় তীরটাও ছাড়ল, সেটাও লাগল না। বাঘ তখন শিকার ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল যেন অতিশয় অনিচ্ছার সঙ্গে যাচ্ছে, একটু ক'রে যায় আবার ফিরে দেখে। এই ছোকরা তখনও মাঝে মাঝে চীৎকার করছিল। বাঘ জঙ্গলের ধার পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়াল এবং তারপর তার শিকারের দিকে না গিয়ে এক এক পা ক'রে এই ছোকরার দিকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করল। এ তাই দেখে তার ধনুকটা মাথার উপরে ঘুরিয়ে আস্ফালন ক'রে জোরে মাটিতে আছড়াতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করতে লাগল। বাঘ খানিকটা এসে থেমে গেল, তারপর অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে এর দিকে চেয়ে থেকে আবার ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। যতক্ষণ বাঘকে দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ ছোকরা তার নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি। বাঘ অদৃশ্য হওয়া মাত্র সে সেখান থেকে দৌড়ে এসে গ্রামে খবর দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ গ্রামের সমস্ত লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটা গ্রামে নিয়ে আসল।

আমি ঘটনাস্থল দেখতে চাওয়ায় লোকেরা আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। ঐ যুবকটি আমাকে সব জায়গা দেখিয়ে দিল। সেখানে তখনও যে সব চিহ্ন দেখতে পেলাম তাতে তার গল্পের সত্যতার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রইল না। যেখানে তার সঙ্গীকে

বাঘে ধরেছিল সেখানে মাটিতে প্রচুর রক্তের দাগ রয়েছে। ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি হওয়ায় মানুষের, গরুর আর বাঘের পায়ের চিহ্ন সব জায়গায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঘ তার শিকার ছেড়ে দিয়ে কতদূর গিয়ে ফিরে এসেছিল, কোথা থেকে আবার জঙ্গলে ফিরে গেল সে সমস্ত নিদর্শন এই ছোকরার গল্পের সঙ্গে মিলে গেল।

এ থেকে তোমরা বুঝতে পারবে কত বড় সাহসের পরিচয় ঐ সাঁওতাল যুবকটি দিয়েছিল। যখন বাঘ এসে তার সঙ্গীকে ধরল, তখন সে ইচ্ছা করলে পালাতে পারত, কারণ একটা শিকার নিয়ে তখন বাঘ ব্যস্ত, খুব সম্ভব সে দ্বিতীয় মানুষটিকে আক্রমণ করত না। জঙ্গলের ভিতরে বা ধারে অরক্ষিত গরুর পাল চরছে আর বাঘ এসে একেবারে কয়েকটাকে মেরে রেখে গেল এ প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু একটা মানুষ-শিকারে কোন বাধা না পেয়েও ম্যান্-ইটার্ যে দ্বিতীয় আর একটা মানুষকে মেরেছে এ খুব কম শোনা যায়। কিন্তু ঐরূপ শিকারে বাধা পেয়ে একাধিক মানুষকে হত্যা করেছে এ ঘটনা বিরল নয়। সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে এই ছোকরা নিজের জীবনকে কি ভয়ানক ভাবে বিপন্ন করেছিল তা সহজে অনুমান করা যায়। বাঘ তার দিকে ফিরে আসবার সময়ে সে যদি ভীত হয়ে একবারও মুখ ফিরিয়ে পালাতে চেষ্টা করত, আমার মনে হয় তা হ'লে সে কিছুতেই রক্ষা পেত না। শিকারে বাধা পেয়ে তখন বাঘ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ সে ঐ মানুষটিকেও আক্রমণ ক'রে মেরে ফেলত। কেবল সাহসের সঙ্গে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখোমুখী যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, এই ভাবটা দেখানতেই বাঘ বোধ হয় কিছু দমে

গিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেছিল। আমি কিন্তু এ কথা বলতে চাই যে সব সময়ে ব্যাপারটা ঐ রকম দাঁড়ায় না। যখন বাঘ ক্ষুধার্ত্ত হয় তখন সে সহজে তার শিকার ফেলে পালায় না। আমি কয়েকবার বাঘের বাচ্ছা পুষেছিলাম, সেগুলো যখন একটু বড় হয়ে উঠত, তখনও আমার সঙ্গে খুব খেলা করত, বিড়ালের বাচ্ছাগুলো যেমন করে ঠিক সেই রকম। হাতের উপর গায়ের উপর লাফিয়ে প'ড়ে কামড়ানর ভাণ করত, কিন্তু দাঁত বসাত না। কিন্তু যদি কখন হঠাৎ কোন মুর্গী, ছাগলছানা বা ঐ রকম জ্যান্ত কিছু ধরে ফেলত তখন তার সুপ্ত হিংস্র স্বভাব জেগে উঠত। তখন তার কাছে যায় কে? কাছে গেলেই গর্জ্জন ক'রে তেড়ে আসত। সতর্ক হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘাড় না ধরে ফেলতে পারলে নখ দিয়ে আঁচড়ে এবং কামড়ে রক্ত বার ক'রে দিত। কখন কখন তার শিকারকে এমন ক'রে কামড়ে ধরে থাকত যে মারলেও ছাড়ত না। মুখটা জোর ক'রে হাঁ করিয়ে তবে ছাড়াতে হত। আমার অনুপস্থিতিতে একটা পাগলী এসে ঐ রকম একটা চেন্ দিয়ে বাঁধা বড় বাচ্ছাকে খুব বিরক্ত করায় বাচ্ছাটা স্ত্রীলোকটির উপর লাফিয়ে প'ড়ে তার ঘাড় এমন কামড়ে ধরেছিল যে যতক্ষণ আমার চাকর এসে জোর ক'রে না ছাড়িয়ে দিল ততক্ষণ বেচারা অনেক চেষ্টা ক'রেও বাচ্ছাটাকে ছাড়াতে পারেনি। বাচ্ছা তখনও এত বড় হয় নি যে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গতে পারে, তাই রক্ষা।

সেই সাঁওতাল যুবকের মৃত-দেহটা ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে রাত্রিতে মাচান ক'রে ব'সে আমার আর একবার দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল যদি বাঘটাকে পাই। কিন্তু এ প্রস্তাবে তার মা সম্মত

হ'ল না। গ্রামের লোকেরা মৃতদেহ জঙ্গল থেকে আনার সময় দেখেছিল যে ঘটনাস্থলের কাছে নালার গর্ভে শুক্‌নো বালির উপর বাঘের পায়ের চিহ্ন পড়েছে, এবং আমাকেও তা দেখিয়ে দিল। গ্রীষ্মকাল, নালার অধিকাংশ স্থানই শুক্‌নো। মাঝে মাঝে যে দু'এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাতে দু' একটা গভীর জায়গায় কুণ্ডের মতো একটু ক'রে জল জমে আছে। ঐ রকম একটা পাথুরে কুণ্ডের ধারে বালিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন ছিল। দেখলাম সব চিহ্নগুলো একদিনের নয়, দু'চার দিনের আগু পাছু হবে। ঐখানে কতকগুলো হরিণের পায়ের চিহ্নও ছিল। আমার মনে হ'ল সম্ভবতঃ হরিণ শিকার করতে বাঘ ঐ খানে আসা-যাওয়া করছে। সেই জন্য ঐ খানেই নালার ধারে একটা গাছে মাচান তৈরী ক'রে রাত্রিতে সেই মাচানে বসলাম। চাঁদনী রাত ছিল, একাই বসলাম। গভীর রাত্রিতে পাথরের উপর মৃদু খট্ খট্ শব্দ হওয়াতে বুঝলাম, হরিণের খুরের শব্দ। দেখলাম হৃষ্ট-পুষ্ট একটি শিঙাল্ হরিণ জল খেতে নামছে। খুব ধীরে ধীরে সন্তর্পণে জলের ধারে এসে জল খেতে লাগল। তাকে মারতে ইচ্ছা হ'ল না। বাঘের জন্য বসেছি, হরিণ মারতে গেলে বাঘের আসবার সম্ভাবনা থাকবে না। হরিণ জল খেয়ে ফিরে গেল। আমি সমস্ত রাত্রি ব'সে রইলাম, বাঘের দেখা পেলাম না।

আর একবার একটি আঠার উনিশ বৎসরের কোল ছোকরার ঐ রকম সাহসের পরিচয় পেয়েছিলাম। তখন আমার ময়ূরভঞ্জে চাকরীর প্রথম অবস্থা। শীতকাল, সরকারী কাজ উপলক্ষে এক বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকার মধ্যে প্রাতঃকালে ঘোড়ায় চড়ে

একগ্রাম থেকে দূরবর্ত্তী আর এক গ্রামে যাচ্ছি। মধ্যে আর একটি গ্রাম পড়ে, এবং আমার রাস্তা সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে। যেতে যেতে দেখলাম রাস্তা থেকে কতক দূরে একটা মাঠের মধ্যে ঐ গ্রামের অনেকগুলি লোক জটলা ক'রে উঁচু গলায় কি বলাবলি করছে, আমাকে দেখে দু'একজন দল ছেড়ে এগিয়েও এল। আমি কৌতূহলী হয়ে লোকগুলির কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম একটি রয়্যাল্ টাইগারের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে, তার ডান দিকের পাঁজরায় একটা গভীর ক্ষত, আর তার মুখের কস্ বেয়ে রক্ত পড়েছে। বাঘটা কোথায় আর কি ক'রে মরেছে জিজ্ঞাসা করায় লোকগুলি একটি কোল ছোকরাকে এগিয়ে দিল। তার মুখের গল্প এই ঃ—

আগের দিন সন্ধ্যার সময় ছোকরাটি দুইটা মহিষ নিয়ে গ্রামের কাছে জঙ্গলের ধারে চরাচ্ছিল। ঠিক সূর্য্যাস্ত হয়েছে আর সেও বাড়ী ফিরবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় একটা রয়্যাল্ টাইগার্ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে একট মহিষের ঘাড়ের উপর পড়ে কামড়ে ধরল। তাই দেখে অপর মহিষটা ছুটে গিয়ে বাঘকে তার শিঙ্ দিয়ে আঘাত করল, বাঘও তৎক্ষণাৎ প্রথম মহিষটাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় মহিষের পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ল। কোল ছোকরা তখন মাত্র পনের বোল হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রথমটা হঠাৎ আক্রমণে সে হতবুদ্ধি হয়েছিল এবং তার কাছে যে তীর ধনুক ছিল তা ব্যবহার করবার জন্য তার হাত ওঠেনি। বাঘ যেমন দ্বিতীয় মহিষকে আক্রমণ করল সেই সময় ছোকরা নিজেকে সামলে নিয়ে একটা তীর বাঘের উপর ছাড়ল। বাঘ আহত হয়ে মহিষকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে

অদৃশ্য হ'ল, আর মহিষ দুইটার সঙ্গে ছোকরাটি ছুটে গিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। মহিষ দুইটার গা বেয়ে তখন রক্ত পড়ছে। ছোকরা গ্রামের লোকদের ঘটনার কথা জানাল। পরদিন, অর্থাৎ আমি যেদিন ঐ গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম সেইদিন, খুব প্রাতে গ্রামের লোকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সাবধানে রক্তের দাগ অনুসরণ ক'রে যেখানে বাঘ আহত হয়েছিল সেখান থেকে প্রায় তিনশ' হাত দূরে জঙ্গলের মধ্যে বাঘের মৃতদেহ দেখতে পায়। ছোকরাও সঙ্গে গিয়েছিল। যেখানে বাঘ পড়েছিল সেখানে তার তীরের পিছনের পালক দেওয়া অংশটি ভেঙ্গে মাটিতে পড়েছিল, সে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

রক্ত মাখা পালক দেওয়া তীরের অংশটি সেই ছোকরার হাতে রয়েছে দেখলাম। গ্রামবাসীরা একটু আগেই বাঘটাকে জঙ্গল থেকে বয়ে এনেছ বলল। বাঘের ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে দেখলাম যে তীরের বাকী অংশটা বাঘের দেহে ঢুকে ক্ষত-মুখে ভেঙ্গে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল মরবার সময় বাঘ মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি দেওয়াতেই তীরটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার সম্মুখের ডান কাঁধের উপরে এক জায়গায় চামড়ার লোম উঠে গেছে, ছোকরাটি বলল যে ঐ খানে মহিষ শিঙ্ দিয়ে আঘাত করেছিল। আমার কথায় লোকগুলি তখনই ছুরী এনে বাঘের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল। চামড়া ছাড়ানর পর আমি বাঘের শবচ্ছেদ করে দেখলাম যে প্রকাণ্ড তীরটি বাঘের এক পাশের মাংস ভেদ ক'রে, তার পর তার দুইটা ফুস্‌ফুস্‌ই ভেদ ক'রে অপর পাশের ভিতরকার মাংস স্পর্শ করেছে আর বক্ষ-গহ্বরে প্রচুর

রক্ত চাপ বেঁধে রয়েছে। বুঝতেই পারছ কি জোরে সেই ছোকরা তীর ছেড়েছিল।

গ্রামের মধ্যে গিয়ে মহিষ দুইটাকে দেখলাম। দুইটাই বেশ বড় পুরুষ মহিষ। একটার ঘাড়ে বাঘের দাঁত বসানর গোটাকয়েক গভীর ক্ষত, আর একটার পিঠের একপাশে ঐ রকম ক্ষত আর নখে আঁচড়ানর চিহ্ন রয়েছে। ছোকরাটি বলল যে যার ঘাড়ে ক্ষত চিহ্ন আছে তাকেই আগে বাঘে ধরেছিল। তাই হবার কথা। বাঘ যখন বড় জন্তু শিকার করে, তখন প্রায়ই প্রথমে তার ঘাড় কামড়ে ধ'রে মুচড়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে। এটা বাঘের সংস্কার, সে বেশ জানে যে ঐ রকম আক্রমণে সে তৎক্ষণাৎ শিকারের জন্তুকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারবে। বাঘের সঙ্গে অন্য জন্তু বা মানুষের যখন লড়াই উপস্থিত হয় তখনই বাঘ কেবল তার শত্রুর ঘাড়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য না রেখে শরীরের যেখানে সুবিধা পায় সেইখানে আঘাত করে, আর এইটা হওয়াই স্বাভাবিক। একজন লোক যদি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আর অপর এক জন যদি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে তা হ'লে আততায়ী লোকটা যে প্রথমেই তার গলায় তলোয়ারের আঘাত করবে এ জানা কথা। কিন্তু যদি দু'জনেই তলোয়ার নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন কি দাঁড়ায় তা আর বলে দিতে হবে না। বাঘ যখন শিকারে বাধা পেয়ে দ্বিতীয় মহিষকে আক্রমণ করল তখন সে শিকারের উদ্দেশ্যে করেনি, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দেবার জন্য করেছিল, সেইজন্য তার যেখানে পেরেছে আঘাত করেছে।

তোমরা হয়ত শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছ যে বাঘ যখন একটা মহিষকে আক্রমণ করল, তখন অপর মহিষটা তেড়ে গিয়ে বাঘকে শিঙ্ দিয়ে আঘাত করেছিল। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। পুরুষ মহিষগুলো প্রায়ই ঐ অবস্থায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং নির্ভয়ে বাঘের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত হয়। বাঘও একথা যে না জানে তা নয়। যেখানে একপাল মহিষের ভিতর কয়েকটা পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ মহিষ থাকে, তাদের একত্র থাকা অবস্থায় বাঘ প্রায় পালের কোনটাকেই আক্রমণ করে না। কেবল যখন পালের ভিতর কোন মহিষ ছটকে প'ড়ে একলা খানিক দূরে সরে যায়, তখনই তার রয়্যাল্ টাইগার্ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। একটা প্যান্থার্ যে ঐ রকম একটা মহিষের কাছে ঘেঁষতেই পারে না তা আমি আগেই বলেছি। আমি বলছি গৃহপালিত মহিষেরই কথা। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বুনো মহিষ নাই। সে আরো ভয়ানক এবং বলশালী জানোয়ার। মহিষের এইরকম স্বভাবের জন্য আহত রয়্যাল্ টাইগার্কে অনুসন্ধান করার সময়ে কখন কখন পূর্ণবয়স্ক মহিষের দলের সাহায্য নেওয়া হয়। মহিষের দলকে এগিয়ে দিয়ে শিকারী তার পিছনে পিছনে যায়। আহত বাঘ কোন মহিষকে আক্রমণ করলে মহিষের দল না পালিয়ে সেই অক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং শিকারী সেই অবসরে পুনরায় গুলী করবার সুযোগ পায়। তবে সব জায়গায় এরকম মহিষের দল পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় শিকারে শিক্ষিত হাতীর পিঠে যাওয়াই প্রশস্ত।

তার পর, সেই কোল ছোকরার কথা যা বলছিলাম। বাঘের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলেছি তা থেকে তোমাদের মধ্যে

কেউ কেউ হয়ত বুঝতে পেরে থাকবে কি করে ঐ ছোকরা সেদিন বাঘের হাত থেকে বেঁচে এসেছিল। ঐ বাঘ নিশ্চয়ই ম্যান্-ইটার্ ছিল না। ম্যান্-ইটার্ হ'লে সে একলা একটা মানুষকে পেয়ে তার বদলে শিকারের জন্য একটা বড় মহিষকে ধরত না। ছোকরার সাহস কিন্তু খুবই প্রশংসনীয়। তার সাহসের প্রশংসা ক'রে আমি একখানা পত্র দেওয়াতে ষ্টেট্ থেকে সে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল।

তোমরা ভেব না যেন যে ম্যান্-ইটার্ না হ'লে যখন তখন যেরকম সেরকম অবস্থায় মানুষে বাঘের সম্মুখীন হয়ে বেঁচে যায়। ম্যান্-ইটার্ না হ'লে এবং উত্যক্ত না হ'লে বাঘ খানিকটা দূর থেকে মানুষকে দেখতে পেলেও সাধারণতঃ তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে না, এ আমি ইতিপূর্ব্বেই এক জায়গায় বলেছি। কিন্তু মানুষ যদি বাঘের খুব কাছে গিয়ে পড়ে তা হ'লে তার কি রকম আচরণ হবে তা বলা কঠিন। ঐ অবস্থায় বাঘ ভীত বা বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং তখন তার ঐ মানুষকে আক্রমণ করার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। একটা ঘটনার কথা শোন :—

একটা গ্রাম। গ্রামটা জঙ্গল এলাকার ভিতরে নয়। তবে গ্রামের ধারে ছোট গাছের পাতলা বন আছে। ঐ বনের পরেই খোলা মাঠ এবং মাঠের ভিতর দিয়ে বড় রাস্তা গেছে। শীতকালের সকালবেলায় রাস্তা দিয়ে দু'জন লোক যাচ্ছে। তার মধ্যে একজন অপর লোককে দেখিয়ে দিল, রাস্তা থেকে খানিক দূরে মাঠের মধ্যে আইলের ওপাশে একটা কি কম্বলের মতো ডোরা কাটা পড়ে আছে। তারা বলাবলি করল, "কেউ হয়ত একটা ভোট কম্বল ওখানে কি ক'রে ফেলে গেছে"। তখন তাদের ভিতর

একজন গেল সেই কম্বল দেখতে। মাঝখানে উঁচু আইল থাকায় সেই লোকটি জিনিষটার সবটা ভালো দেখতে পাচ্ছিল না, একেবারে অত্যন্ত নিকটে গিয়ে পড়ল। তখন সেই 'কম্‌লি' লাফিয়ে উঠে লোকটিকে ধরে ফেলল, আর ছাড়ল না। তাকে সেখানে মেরে রেখে সেই গ্রামের বাহিরেই একটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। আসলে 'কম্‌লি'টি ছিল একটি রয়্যাল্ টাইগার্। অপর লোকটি এই দেখে দৌড়ে গ্রামে গিয়ে খবর দিল। গ্রামের লোকেরা মহা ভয় পেয়ে যে যেখানে পারল নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে লাগল। বেশীরভাগ লোক ঘরের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে বসে রইল, আবার তার মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা ঘরের চালে উঠে দেখতে লাগল। তাদের কয়েকজন পরামর্শ ক'রে গাঁয়ের চৌকিদারকে পাঠিয়ে দিল আমার অগ্রজের কাছে যাঁর কথা তোমাদের ইতিপূর্ব্বে বলেছি। তিনি তখন ঐ গ্রাম থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে অপর এক গ্রামে ক্যাম্প্ করছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন এবং বেলা বারটার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁর কথায় গ্রামের কয়েকজন লোক বাগানের নিকটে ঘরের চালের উপর উঠে বাগানের মধ্যে ঢিল ছুড়তে লাগল। এই তাড়া পেয়ে বাঘ ভয়ানক গর্জ্জন ক'রে বাগান থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে ছুটল। দাদা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন তার বিপরীত দিকে বাঘ বাগান থেকে বেরিয়েছিল বলে তিনি তাকে গুলী করবার সুবিধা পেলেন না। তিনি রাইফ্ল্ নিয়ে বাঘ যে পথে গেল সেই পথে ছুটলেন। দু'একজন সাহসী লোক তাঁর সঙ্গ নিল। গ্রামের লোকেরা আগেই সাবধান হয়েছিল বলে কেউ আর বাঘের

সামনে পড়ল না। খানিক রাস্তা যাওয়ার পর সঙ্গের একজন লোক দাদাকে দেখিয়ে দিল যে বাঘটা প্রায় ষাট গজ দূরে একটা বাঁশ-ঝোপের ভিতর বসেছে। ঝোপের নীচের মাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। একটা কুকুর যেমন ক'রে বসে, বাঘ সেই রকম ক'রে বসেছিল। তার মাথাটা বাঁশের পাতায় আড়াল পড়ায় দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু শরীরের বাকী অংশটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেইখান থেকে দাদা ফায়ার্ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে বাঘ আহত হ'ল। বাঁশ ঝোপের পাশেই যে ছোট গাছের অল্প একটু বন মতো ছিল, আহত হয়ে বাঘ সেই বনে ঢুকল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তিনি তাঁর সঙ্গের লোকদের নিয়ে দূর থেকে ঐ বনটার চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন, কোথাও বাঘকে দেখা যায় কি না। দেখলেন এক জায়গায় বনের ধারেই বাঘ সটান শুয়ে পড়েছে। তিনি তখন তার উপর আরও একটা ফায়ার্ করলেন। বাঘ আর নড়ল না, বোঝা গেল তার শেষ হয়েছে। গ্রামবাসীরা তখন বেরিয়ে এসে উৎসব সুরু ক'রে দিল। সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল যে এই বাঘ এল কোথা থেকে, কারণ আগেই বলেছি সে স্থান জঙ্গল এলাকা থেকে অনেক দূরে ছিল। তার পনের ষোল মাইলের মধ্যে এমন জঙ্গল ছিল না যেখানে রয়্যাল্ টাইগার্ থাকে। বাঘটা কোনখান থেকে ঐখানে ছটকে এসে পড়েছিল। তোমরা জান সুন্দরবনে অনেক রয়্যাল্ টাইগার্ আছে। সময় সময় সুন্দরবনের ঠিক উত্তরের জেলাগুলিতে বন থেকে দূরে জঙ্গল-বর্জিত স্থানে ঐরকম দু'একটা ছটকে আসা রয়্যাল্ টাইগার্ দেখা যায়।

অতর্কিত ভাবে মানুষকে আক্রমণ করা ম্যান্-ইটারের স্বভাব হ'লেও কখন কখন এমন ম্যান্-ইটার্ টাইগারের কথা শোনা যায়, যে বাঘ নিতান্ত নির্ভীক, এবং যে এতই বেপরোয়া ভাবে মানুষ শিকার করে, যে জঙ্গলের ভিতরে দিনের বেলায় দলবদ্ধ হয়ে মানুষ চলবার সময়েও প্রকাশ্য ভাবে এসে দলের ভিতর থেকে একজনকে নিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করে না, এবং অনেক সময় দলের লোকেরা খানিক দূর থেকেই দেখতে পায় যে বাঘ আসছে। বাঘকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি চীৎকার ক'রে তাকে বাধা দেবার বা তাড়াবার চেষ্টা করলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, এক-জনকে না একজনকে ধরে নিয়ে যাবেই। আমি ময়ূরভঞ্জের এক-জন ঐ দেশীয় শিকারী ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম যে এই রকম বাঘকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'ভয়না' বাঘ বলে। বোধ হয় নিতান্ত নির্ভীক বলে তাকে ঐ নাম দেওয়া হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ১৯৩৭ সালে, ময়ূরভঞ্জের শিমলীপাল নামে যে বৃহৎ পাহাড়শ্রেণী এবং জঙ্গল আছে তারই এক অংশে এই রকম একটা রয়্যাল্ টাইগারের উপদ্রব হয়েছিল। কাঠের ব্যবসায়ীদের অনেক করাতী, পাহাড় থেকে কাঠ টেনে নামাবার লোক, ইত্যাদি জঙ্গলের মধ্যে নানা স্থানে কাজ করছিল। তাদের কয়েকজনকে বাঘে ধরবার পর সমস্ত লোক পাহাড় থেকে পালিয়ে এল। তার পর কয়েক মাস ধরে ব্যবসায়ীরা আবার সেখানে কাজ করবার জন্য যতবার লোক পাঠাল ততবারই ঐ বাঘের উপদ্রবে তাদের পালিয়ে আসতে হ'ল। দলবদ্ধ হয়ে গরু মহিষ নিয়ে কাঠ টানবার লোকেরা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলেই ঐ বাঘ দেখা দিত, আর দলের ভিতর থেকে একটির পর একটি লোককে নিয়ে

যেত। ফলে ঐ জায়গায় ব্যবসায়ীদের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে আসল, তারা বিপদে পড়ল। তখন তারা সকলে মিলে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করল যে ঐ বাঘ মারবার বন্দোবস্ত করা হোক। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ঐ দরখাস্ত পেয়ে নিজে ঐ বাঘ শিকার করতে গেলেন। অনেক লোক আর হাতী নিয়ে ঐ বাঘের এলাকায় পাহাড়ের মধ্যে ক্যাম্প্ ফেললেন। জঙ্গলের ভিতর স্থানে স্থানে মহিষ বাঁধা হ'ল। পর পর তিনটা মহিষ বাঘে মেরে দিল এবং তিনটা মড়ির উপরেই মহারাজা রাত্রিতে বসে ১২ দিনের মধ্যে তিনটা রয়্যাল্ টাইগার্ মারলেন। তার মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড় বাঘ সেইটাই ম্যান্-ইটার্ ছিল। দিনের বেলায় দলের ভিতর থেকে মানুষ নিয়ে যেত বলে অনেক লোকে ঐ বাঘটাকে দেখেছিল এবং তার শরীরের কয়েকটা চিহ্ন চিনে রেখেছিল। ঐ বাঘ মরার পর থেকে ঐ এলাকাতে বাঘে মানুষ মারা বন্ধ হয়েছিল। অত অল্প দিনের মধ্যে পর পর তিনটা রয়্যাল্ টাইগার্ পাওয়া খুব কম শিকারীর ভাগ্যে ঘটে থাকে। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান মহারাজার নাম সার্ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর, কে, সি, আই, ই। শিকারে এঁর অসাধারণ অধ্যবসায় এবং নিপুণতা। তাঁর শিকারের সংখ্যা করা যায় না। কখন কখন আমি তাঁর শিকারের সঙ্গী হয়েছি। মহারাজার আকৃতি যেমন দীর্ঘ তেমনি শক্তিব্যঞ্জক, অথচ অত্যন্ত সুদর্শন। উড়িষ্যার রাজগণের মধ্যে এরূপ বলিষ্ঠ ও পুরুষোচিত আকৃতির ব্যক্তি খুব কমই আছেন। যে সকল খেলাতে শক্তিমত্তার এবং ইচ্ছানুরূপ সুকৌশল ক্ষিপ্র অঙ্গ-চালনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় ইনি প্রায় সবগুলিতেই অভ্যস্ত। এখনও সময়ে সময়ে স্কুলের ছেলেদের

সঙ্গে মিশে তাদেরই এক জনের মতো হয়ে খেলা করেন। অমায়িকতা এই রাজ-বংশের একটি প্রধান গুণ। ইনি আরও বহু সদ্‌গুণের আধার, কিন্তু সে সকলের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

অনেক দিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে (বোধ হয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে) এই রকম এক জোড়া বাঘ ও বাঘিনীর কথা পড়েছিলাম। ব্রহ্ম-দেশের এক অংশে একটি বড় গবর্ণমেণ্ট্ সার্ভে পার্টি জরিপ করার উদ্দেশ্যে বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে স্থানে স্থানে ক্যাম্প্ করতে করতে যাচ্ছিল। সেই সময় ঐ দুইটা ম্যান্-ইটার্ তাদের অনুসরণ ক'রে ঐ দলের একটির পর একটি মানুষ ধরে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। দলের লোকেরা শত চেষ্টাতেও বাঘের ঐ কাজ নিবারণ করতে পারেনি। দিনে হোক রাত্রিতে হোক দু'চার দিন অন্তর তাদের মধ্যে একটি লোককে বাঘে নিয়ে যাবেই। ক্যাম্পে দিন রাত্রি বন্দুকধারী প্রহরী পাহারা দিলেও মাঝে মাঝে ক্যাম্প্ থেকেও লোক ধরে নিয়ে যেত, এমন কি ঐ প্রহরীদের মধ্যেও কয়েকজন বাঘের কবলে গিয়েছিল। একটা ক্যাম্প্ ভেঙ্গে দুই দিনের রাস্তা গিয়ে অন্য ক্যাম্প্ করলেও বাঘ তাদের অনুসরণ ক'রে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হত। কিছু দিনের মধ্যে বাঘের উপদ্রবে ঐ সার্ভে পার্টির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। মনে হয় প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে "Man-eaters of Tsavo" বলে একখানা বই পড়েছিলাম। তাতে আফ্রিকার নিউবিয়া প্রদেশে এই রকম এক জোড়া সিংহ সিংহীর কীর্ত্তির কথা আছে। সেই প্রদেশে একটা রেল লাইন নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে ঐ

সিংহ সিংহীর উপদ্রব হয়। তার মধ্যে একটা ঘটনার কথা এখনও আমার কতকটা মনে আছে। ঐ দলের জনকয়েক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী রাত্রিতে রেল লাইনের কোন সাইডিং-এ অবস্থিত একখানা সেলুন্ কারে ঘুমুচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় সিংহ দুইটার মধ্যে একটা ঐ গাড়ীর ভিতর ঢুকে একজনকে ধরেছিল। অন্য সকলে জেগে ওঠায় সিংহ তার শিকার নিয়ে যেতে পারল না, কিন্তু মেরে রেখে গেল। জানোয়ার দুইটার উপদ্রব ক্রমশঃ এত বেশী হয়েছিল যে শেষটায় রেলওয়ে নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল এবং এই ব্যাপার নিয়ে পার্লামেণ্ট্ সভায় পর্য্যন্ত আলোচনা হয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর ম্যান্-ইটার্ দুইটা নিহত হ'লে তখন আবার কাজ আরম্ভ করা হয়। শিকার ধরা সম্বন্ধে সিংহের আচরণ যে বাঘের আচরণ থেকে কতকটা বিভিন্ন তা ঐ বইখানা পড়লে বোঝা যায়। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ বইখানা এবং সিংহ সম্বন্ধে অন্যান্য ইংরাজী বই পড়, তা হ'লে বাঘের আচরণ সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত যা বলেছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এ কথা বুঝতে পারবে। সিংহের আচরণ কতকটা বেশী খোলাখুলি ও নির্ভীক, আর বাঘের আচরণ এখনি যে দুইটা ঘটনার কথা বললাম, ঐ রকম দু'এক ক্ষেত্রে ছাড়া অধিকাংশ সময়ে গুপ্ত এবং সতর্ক।

ভারতবর্ষ থেকে সিংহ জন্তুটি প্রায় লোপ পেয়ে এল। বেশী নির্ভীক বলে এবং বাঘের মতো অত গোপনভাবে থাকতে জানে না বলেই কি এটা হ'ল? আগে ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই সিংহ দেখা যেত, আর এখন কেবলমাত্র গুজরাট অঞ্চলে দু'-চারটা দেখা যায়, এবং সেগুলি আফ্রিকার সিংহ বা ভারতীয়

রয়্যাল্ টাইগারের চেয়ে আকারে ছোট ও কম শক্তিশালী। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু বাঘের চেয়ে সিংহের অনেক বেশী উল্লেখ দেখা যায়, আর সেখানে সিংহের ক্ষমতার কথা যা পড়া যায় তা এখনকার ভারতীয় সিংহের সম্বন্ধে খাটেনা। সেকালের কবিরা তাঁদের রচনায় সিংহকে "গজারি" অর্থাৎ হাতীর শত্রু নাম দিয়েছিলেন, এবং তাদের নখের বর্ণনা করে গেছেন—"করিকুম্ভ-বিদারণক্ষম" বলে। পূর্ব্বকালে সিংহের এত শক্তি থাকা কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা নয়, কারণ অন্যত্র তার ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক H. G. Wells রচিত "The Outlines of History"তে এই কথা দেখতে পাবে ঃ—

"There were still lions in the Balkan Peninsula, and they remained there until about 1000 or 1200 B. C. The lions of Wurtemberg and South Germany in those days were twice the size of the modern lion", (Book II, ch. X, § 4, p 51)

অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০ বা ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের বল্কান্ দেশগুলিতে সিংহ দেখা যেত এবং ঐ সিংহের আকার বর্ত্তমান কালের সিংহের আকারের দ্বিগুণ ছিল।

এখনকার দিনে একটা পূর্ণবয়স্ক আফ্রিকার সিংহ লম্বায় ৯ ফুটের কম নয়, এবং ওয়েল্‌স্ সাহেব নিশ্চয় "আধুনিক সিংহ" বলতে ঐ সিংহেরই কথা বলেছেন। তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে সিংহ অন্ততঃ ১৮ ফুট লম্বা এবং সেই অনুপাতে উঁচু আর শক্তিশালী ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত

সাহিত্যে বর্ণিত সিংহও এইরূপ বিরাটদেহ ও বিপুল শক্তিশালী জীব ছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না। এ না হ'লে তার নখ "করিকুম্ভবিদারণক্ষম" হয় না; আর তার মুখেই এই গর্ব্বের কথা শোভা পায় যে "আমি ভবানীপাদার্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠ।"

এখনকার ভারতীয় সিংহ ত দূরের কথা, তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী একটা পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল্ টাইগার্ও একটা পূর্ণবয়স্ক হস্তী বা হস্তিনীর সঙ্গে ইচ্ছা ক'রে লড়তে চাইবে না। কখন কখন দেখা যায় বটে রয়্যাল্ টাইগার্ হাতীর বাচ্ছাকে মেরেছে, কিন্তু এ তখনই ঘটে যখন বাচ্ছাটি মা'র অনবধানের জন্য তার কাছ থেকে খেলা করতে করতে দূরে সরে যায়, নতুবা নয়। হাতীর কোল থেকে তার বাচ্ছা কেড়ে নিতে পারে একটি মাত্র জীব,—আর সেই ভয়ানক জীবটি হচ্ছে মানুষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাঘের সম্বন্ধে আর দু'একটা গল্প বলে ঐ প্রসঙ্গ শেষ করব। আমি কিন্তু আগে হতে বলে দিচ্ছি যে বাহাদুরীর গল্প আমার কাছে নাই। প্রকাণ্ড বাঘ আসল, বা তার সামনে গল্পের নায়ক গিয়ে পড়লেন, আর অমানুষিক বীরত্ব দেখিয়ে এবং অতি আশ্চর্য্য উপায়ে, যেমন নাকি ঘুষি মেরে না হয় কুস্তির প্যাঁচ দিয়ে ফেলে দিয়ে, বা ম্যাজিকের মতো কিছু ক'রে তিনি বাঘকে মারলেন বা বেঁধে ফেললেন,—এ সব চমক লাগান আজগুবি গল্প যদি চাও তা হ'লে আমি তোমাদের সে আশা পূর্ণ করতে পারব না। সে গল্পের জন্য তোমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে আর পাবেও ঢের। এখন একটা একটু মজার গল্প বলি, শোন।

আমার একটি ঐ দেশী 'হরিজন' মোটরকার ড্রাইভার ছিল। কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিল সে। তার সকলের চেয়ে প্রিয় জিনিষ ছিল—মদ বা হাঁড়িয়া। কোল সাঁওতালেরা ভাত রেঁধে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে একরকম মাদকে পরিণত করে, আর তাকেই হাঁড়িয়া বলে। হাঁড়িয়া ঐ সব লোকের নিত্যকার খাদ্যও বটে, আবার মদের মতো পানীয়ও বটে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই নিজের ঘরে জিনিষটা তৈরী ক'রে স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি বালক-বালিকা নির্বিশেষে খায়, এবং তাতে কিছু মাত্র দোষের মনে করে না। আমার ড্রাইভার যখন আমার সঙ্গে

সফরে যেত তখন তার হাঁড়িয়া খাওয়ার বিশেষ সুবিধা হত। সে খুব গল্প করতে পারত, আর গল্প ক'রে মফস্বলের প্রজাদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে হাঁড়িয়া চেয়ে খেত। ফলে কখন কখন সে এত নেশায় বিভোর হয়ে পড়ত যে সে সময় তাকে দিয়ে মোটর চালান আমার বিপজ্জনক বলে মনে হত এবং তখন তাকে বসিয়ে রেখে আমি নিজেই চালাতাম। শুনেছিলাম যে গল্পের মধ্যে সে তার মনিবের এবং তার নিজের বীরত্বের মনগড়া গল্পই বেশী বলত, এবং সে যে কতবার তার মনিবকে শিকারের সময়ে বড় বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে সে সংবাদ ঐ সব সরল-বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করত। অন্য হিসাবে সে লোক মন্দ ছিল না।

একবার এক গ্রামে শিকারে গিয়েছি। গ্রামের বসতির পাশেই বাঘে গরু মেরে রেখে গেছে। মড়ির খুব কাছে এক দিকে একটা বড় আম গাছ। বিপরীত দিকের পতিত জমি ছোট ছোট গুল্মে ভরা, আর সেগুলো গিয়ে ঠেকেছে অল্প দূরে একটা নীচু পাহাড়ে, যেখানে পাথরের ভিতর প্যান্থারের লুকোবার মতো কয়েকটা গুহা আছে। একটা মুরুম্ বা কঙ্করের তৈরী মোটরকার চলবার মতো পাকা বড় রাস্তা ঐ পতিত জমির মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আম গাছটাতে গ্রামের লোকেরা মাচান তৈরী ক'রে রেখেছে। গ্রামের সব চেয়ে কাছের ঘরটা মড়ি থেকে যাট সত্তর গজের বেশী হবে না। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে-ছিলাম সেখানে। গাড়ীটা দূরে রাস্তার একপাশে রেখে ড্রাইভার গেল গ্রামের মধ্যে, আর আমি সন্ধ্যার পরেই মাচানে বসলাম। যেরকম জায়গায় মড়িটা ছিল আর যেরকম জ্যোৎস্না রাত্রি,

তাতে মনে হ'ল যে খুব সম্ভব আমাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে এবং বেশী রাত্রিতে গ্রাম নিশুতি হ'লে তবে বাঘ আসবে। আমাকে কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না। রাত্রি নয়টা বেজেছে, তখনও গ্রামের বসতির ভিতর থেকে মানুষের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, এবং অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই পাকা রাস্তা দিয়ে কয়েকখানা গরুর গাড়ী যাবার শব্দ শোনা গেছে, এমন সময় প্যান্থার্ এসে মড়ির কাছে বসল। আমি ফায়ার্ করা মাত্র সে মহা গর্জ্জন ক'রে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাশের ঝোপের ভিতর ঢুকল এবং ঐ রকম ক'রে গুল্মগুলোর ভিতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগল। দশ বার সেকেণ্ড চুপ ক'রে পড়ে থেকে আবার ঐ রকম গর্জ্জনের সঙ্গে হুটোপুটি করতে করতে খানিকটা দূর গিয়ে থেমে যায় এবং চুপ ক'রে থাকে। রাত্রিতে ঝোপের ভিতর থাকাতে তার শরীরটা ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেইজন্য পুনরায় ফায়ার্ করবার অবসর পাই নি। তার গর্জ্জন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠতে লাগল। আহত হয়ে বার বার অত গর্জ্জন করতে আমি আর কোন বাঘকে দেখিনি। বুঝলাম যে তার দেহের কোন অংশ অবশ হয়ে গেছে, কিন্তু শীঘ্র মরছে না। আর অল্পদূর গেলেই সে পাহাড়ে পৌঁছে যাবে, তাকে আর পাব না। সম্ভবতঃ আমি কাছে গেলেও সে আমাকে লাফিয়ে বা ছুটে এসে ধরতে পারবে না, এই অনুমান ক'রে আমি তখন মাচান থেকে বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে বাঘের দিকে দৌড়ে যেতেই সে ঐরকম গর্জ্জন ক'রে সাম্‌নের ছু'পায়ের উপর ভর দিয়ে তার পিছনের অবশ শরীরটাকে টেনে নিয়ে আমার দিকে আসতে

লাগল। আর একটা ফায়ার্ করায় তার গর্জ্জন থেমে গেল এবং সে স্থির হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাঘ স্থির হয়ে যাওয়ার পরই শুনলাম গ্রামের মধ্যে এক ভারী হৈ চৈ বেধে গেছে। মানুষের জোর গলার শব্দ প্রথম ফায়ারের পরই শুনেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ওদিকে মন দেওয়ার মতো অবস্থা আমার ছিল না। এখন কাণ পেতে শুনলাম একজন পুরুষ আর স্ত্রীলোক কা'কে চীৎকার ক'রে কি বলছে আর স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে কান্নার সুরে গালাগালি দিচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি গ্রামের ভিতর গেলাম। যেতে যেতে দেখলাম যে বাহিরে একজন লোকও নাই, সকলেই বাঘের গর্জ্জন শুনে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিয়েছে। যে বাড়ীতে গোলমাল হচ্ছিল, সেই বাড়ীতে পৌঁছে যা দেখলাম তাতে আমার হাসি সামলান দায় হয়ে উঠল। বাড়ীতে একটি মাত্র ঘর, ঘরের দোর ভিতর থেকে খিল বা হুড়কো দিয়ে বন্ধ। দরজার বাহিরে দু'জন সাঁওতাল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, তারা মাঝে মাঝে দরজা ঠেলছে আর ভিতরের লোককে বেরিয়ে আসতে বলছে। স্ত্রীলোকটির গলায় কান্নার সুর। উঠানে তিনটা পাথর বসিয়ে সদ্য তৈরী করা একটা উনানে আগুন জ্বলছে, তার পাশে শাল পাতায় চামড়া ছাড়ান পরিষ্কার করা আস্ত একটা মুরগী, পাতার ঠোঙায় একটু তেল নুন, গোটা দু'এক লঙ্কা আর কিছু কুচোনো পিয়াজ। পাশে একটা খালি হাঁড়ি এবং একটা কাঁসার জাম বাটিতে খানিকটা হাঁড়িয়া। আমাকে দেখেই স্ত্রীলোকটি মহা উত্তেজিত হয়ে তার ভাষায় বলল,—"তোর ডাইবরের কাজটা দেখ্না। তাকে হাঁড়িয়া দিলাম, সে গাঁ থেকে মুরগী আর হাঁড়ি

এনে রাঁধতে বসল আমার উঠানে, আমি তাকে রাঁধবার জোগাড় ক'রে দিলাম। আর সে গিয়ে আমার ভাত-ঘরে ঢুকে আমার সব নষ্ট ক'রে দিল। ঘরের ভিতর দৌড়ে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিল, বাঘ আসলে আমরা কোথায় যাব—হ্যাঁ?" সাঁওতালের ভাতঘরের মধ্যে যদি অন্য জাত ঢোকে, তা হ'লে তাদেরও হাঁড়ি নষ্ট হয়, তারা সে হাঁড়ি এবং তাতে যা কিছু থাকে ফেলে দেয়। স্ত্রীলোকটি যখন এই সব বলছে, তখন ড্রাইভার আমার গলার স্বর শুনে বেরিয়ে এসেছে। স্ত্রীলোকটি তাকে মারে আর কি। পুরুষটি বিশেষ কিছু আর বলল না, বিরক্ত মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন কাজ সে কেন করল। সে মাথা নীচু ক'রে চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে ঘাড়টা চুলকে একবার শুধু বলল—"হুজুর"। বাস্, তার সব কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়ে গেল। আমি স্ত্রীলোকটিকে তার খেসারত বাবদ একটি আধুলি দিলাম, সে ভারি সন্তুষ্ট হ'ল। তার পর গাড়ীটা বাঘের কাছে রাস্তার উপর এনে, যাতে ঝুলে প'ড়ে মাটির সঙ্গে ঘর্ষণ না লাগে এমন ক'রে তার হাত পা গুলো আর লেজটা গুটিয়ে নিয়ে ভালো ক'রে গাড়ীর ক্যারিয়রের উপর বেঁধে নিয়ে, সেখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে বাড়ীতে ফিরে এলাম। ড্রাইভার মুরগীটাকে ছেড়ে আসে নি, সেটা তার পা-দানিতে রাখা জড়ান শাল পাতা দেখে বুঝেছিলাম, কিন্তু বেচারা হাঁড়িয়াটা কি করল তা বলতে পারলাম না। তোমরা অনুমান ক'রে নিও।

তোমরা বোধ হয় হাসছ, বাঘের হাতের কথা শুনে। তা, তার যে থাবার জোর তাতে তাকে হাত বললেই বা দোষ হয় কি?

হাতীরও ত হাত আছে, বাঘের দাবী তার চেয়ে না হয় একটু কম।

এই রকম গ্রামের বসতির নিতান্ত কাছে এমন কি দু'একবার গ্রামের বসতির মধ্যেও রাত্রিতে মড়ির উপর ব'সে আরও কয়েকটা প্যান্থার্ মেরেছি, ও জন্তুটি এতই মানুষ-ঘেঁষা। এ কথা আমি আগেই বলেছি। আমার এলাকার মধ্যে একটা বড় গ্রাম ছিল। গ্রামটি আগে মহকুমার হেড্কোয়ার্টার্ ছিল। খুব ঘন বসতি, বাজার, ডাক্তারখানা, ডাক-বাংলো, স্কুল, বোর্ডিং এখনও সবই আছে সেখানে। থানা আর ডাক-বাংলো পরস্পর সংলগ্ন, তার পরেই একটা পাথরের টিলা বা উঁচু বড় ঢিবি। টিলার অপর পাশেই স্কুল আর ছেলেদের বোর্ডিং। টিলাটা একটা ছোট এবং অনুচ্চ পাহাড়ের একদিকের শেষ অংশ। ঐ মহকুমার প্রধান পাকা রাস্তাটি স্কুল এবং টিলার পাশ দিয়ে এসে গ্রামে ঢুকেছে। রাত্রি দশটার সময় টিলার পাশে ঐ রাস্তার ধারেই একটা ছাগলের মড়ির উপর বসে প্যান্থার্ মেরেছি। সেখানে একটা বড় গাছ পর্য্যন্ত ছিল না। একটা ছোট আগাছার উপর সাত ফুট মাত্র উঁচু এক মাচান ক'রে বসতে হয়েছিল। টিলার সে পাশে মাচান থেকে ৬০ গজের মধ্যে বাঙ্লো। গ্রামের বহুলোক বাঘ শিকার দেখবে বলে বাঙ্লোর হাতার মধ্যে সন্ধ্যার পর থেকে এসে অপেক্ষা করছিল, আর মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলছিল। একটা ছোট ঝোপের মধ্যে মড়িটা ছিল। বাঘ মড়ির কাছে আসা মাত্রই ফায়ার্ করলাম। সে সেখানেই পড়ল, দ্বিতীয় ফায়ার্ আর করতে হ'ল না।

এই শিকারটাতে গল্প করার মতো কিছু নাই। ভালো

মানুষটির মতো মাচানে বসে আছি, বাঘ এল, ফায়ার্ করলাম, আর সে ভালো মানুষটির মতো মরে পড়ে রইল—এ ত আমার বহুবার ঘটেছে। শুধু এই জানোয়ার কত মানুষ-ঘেঁষা তাই দেখানর জন্য এই ঘটনাটা বললাম।

ঐ গ্রামেই আর একবার একটা বেশ বড় প্যান্থার্ মেরেছিলাম, সে আবার দিনের বেলায়। বাঘ রাত্রিতে গ্রাম থেকে একটা ভেড়া ধ'রে গ্রাম-সংলগ্ন ছোট পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে খেয়েছিল। সকাল বেলায় কয়েকজন লোক ভেড়া খুঁজতে গিয়ে বাঘ দেখে তাকে দূর হতে তাড়াহুড়ো করায় সে পাহাড় থেকে নেমে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি খবর পেলাম বেলা এগারটার সময়, আর সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম একটার সময়। আমি পৌঁছুতেই অনেক লোক জড়ো হয়ে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল। যেখানে নিয়ে গেল সেখানটা খুব ঘন বসতি। সেখানে যেতেই একটি লম্বা চওড়া জোয়ান ব্রাহ্মণ যুবক একটা বাড়ী দেখিয়ে দিল! যুবকটির মুখে সদ্য ক্ষতর চিহ্ন দেখলাম, আর তা থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। শুনলাম যে গ্রামে বাঘ ঢুকেছে শুনে সে একখানা তলোয়ার নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। বাঘ গ্রামের লোকের তাড়া পেয়ে ঐ রাস্তায় দৌড়ে যেতে যেতে লোকটি সামনে পড়ায় তাকে আক্রমণ করে, আর তার পর তাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে। যে কারণেই হোক যুবকটি বাঘকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করবার সুবিধা পায়নি। বাড়ীটাতে কয়েক খানা খড়ে ছাওয়া ঘর, তার মধ্যে একখানা মাটি-কোঠা অর্থাৎ মাটির দেওয়াল দেওয়া দোতলা ঘর। একজন বলল যে বাঘটা এসে নীচের কোন ঘরে না

ঢুকে পাশের একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ঘরে চ'লে যায়, তখন দোতলায় কোন লোক ছিল না। বাঘ উপরের ঘরে ঢুকলো দেখে গৃহস্বামী সাহসের সঙ্গে নিঃশব্দে সিড়ি দিয়ে উঠে ঘরের একটি মাত্র দোর বা'র থেকে টেনে বন্ধ ক'রে শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। দোতলার ঘরের দেওয়ালে আলো যাবার জন্য একটি মাত্র ছোট ছিদ্র ছিল, সেটার ভিতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, ঘর অন্ধকার, আর যতটুকু দেখতে পাওয়া গেল তার মধ্যে বাঘ ছিল না। আমার সন্দেহ হ'ল বাঘ ওখানে আছে কিনা, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল বাঘ নিশ্চয় ঐ ঘরে আছে। তখন আমি কয়েক জনকে নিয়ে ঘরের চালে উঠে এক জায়গায় একটু খড় সরিয়ে ছিদ্র ক'রে ঘরের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করলাম। আমি দেখছি এমন সময় ছিদ্রটার মুখে ধপ্ ক'রে জোরে শব্দ হ'ল, আর চালাটা কেঁপে উঠল। বোঝা গেল বাঘ লাফিয়ে ছিদ্রের মুখে থাবা মারল। ভাগ্যে আমি ছিদ্রের সঙ্গে চোখ লাগিয়ে দেখছিলাম না, না হ'লে হয়ত আমার চোখ নষ্ট হয়ে যেত। বাঘকে কিন্তু তখনও দেখতে পেলাম না। আর একটা এমন জায়গায় ছিদ্র করলাম যাতে সূর্য্যের কিরণ সোজা গিয়ে ঘরের মধ্যে পড়তে পারে। এইটা করা মাত্র দেখতে পেলাম যে বাঘ ঘরের এক কোনে বসে ভয়ানক ভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। একটা ফায়ারেই বাঘের শেষ হয়ে গেল।

যে ব্রাহ্মণ যুবককে বাঘে আক্রমণ করেছিল তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে এসেছিলাম যে বাঘের দাঁত বসানতে যে ঘা হয় তা প্রায়ই বিষিয়ে ওঠে এবং তাতে জীবন-সংশয় হয়, সুতরাং সে যেন তখনই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভালো ক'রে চিকিৎসা করায়।

সে কি করেছিল জানিনা। কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে সংবাদ পেলাম যে তার মুখের ঘা বিষাক্ত হয়ে ভীষণ আকার ধারণ করেছে এবং সে বিকারগ্রস্ত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। সে যাত্রা বোধ হয় সে অত্যন্ত বলবান লোক বলেই অনেকদিন ভুগে বেঁচে গেল, কিন্তু তার মুখ জন্মের মতো বিকৃত হয়ে গেল বড় বড় ক্ষত চিহ্নতে। ঘটনার দিন আমি যে সব ঘা তার মুখে দেখে এসেছিলাম সেগুলো গভীর ছিল বটে কিন্তু মোটেই চওড়া ছিল না। মানুষের উপর বাঘের আক্রমণ আমার যতবারের কথা জানা আছে, প্রায় ততবারই দাঁত বসান ক্ষতগুলোকে বিষাক্ত হতে দেখেছি। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে বাঘের দাঁতে বিষ আছে, তা এক হিসাবে অমূলক নয়। তাদের দাঁতের ভিতর দিয়ে সাপের মত বিষ নিঃসৃত হয় না বটে, কিন্তু পচা মাংস খায় বলে তাদের দাঁত এবং লালা ভয়ানক ভাবে ঐ পচা মাংসের বিষে বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং তা মানুষের রক্তে সঞ্চারিত হ'লে দু'এক দিনের মধ্যে শরীর বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে। বোধ হয় ঘরে পোষা বাঘ, যাকে টাটকা রক্ত মাংস খেতে দেওয়া হয়, তার মুখে ওরকম বিষ জন্মায় না। পোষা বড় বাঘের বাচ্চা আমাকে এবং আমার চাকরদের কয়েকবার কামড়ে রক্ত বা'র ক'রে দিয়েছে, কিন্তু ঐ সব ক্ষত কখনও বিষাক্ত হয়নি। আমরা কিন্তু কামড়ান মাত্র ঘা'য়ে টিংচার্ আইওডিন্ লাগিয়ে দিতাম। ভালুকে কামড়ানর ক্ষতগুলো গভীর হ'লেও খুব কমই ও রকম বিষাক্ত হতে দেখেছি।

দিনের বেলায় গ্রামের মধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছে, এমন আরও তিনটা প্যান্থার্ আমি মেরেছি। তার মধ্যে একবার

আমার বেশ বিপদ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। খবর পেয়ে গ্রামে যাওয়াতে গ্রামের লোকেরা তাদের বসতির পাশেই একটা বড় লতার ঝোপ দেখিয়ে দিয়ে বলল যে ঐ ঝোপে বাঘ আছে। একটু দূর থেকে ভালো করে লক্ষ্য ক'রে দেখছি এমন সময় বাঘটা লাফ দিয়ে গ্রামের রাস্তার উপর পড়েই দ্বিতীয় লাফে অদৃশ্য হ'ল। লোকগুলিও যে যেদিকে পারল ছুটল। আমি রাস্তা ধরে যেতে যেতে, একটা ঘরের চালের উপর থেকে একজন আমাকে তার পাশেই রাস্তার ধারে অন্য একটা মাটির দেওয়াল দেওয়া চালা ঘর দেখিয়ে বলল যে বাঘ ঐ ঘরে ঢুকেছে। ঐ ঘরে জানালা ছিল না এবং তার দোর রাস্তার দিকে না থেকে ভিতরের উঠানের দিকে ছিল। আমি অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়ে খোলা উঠানের বাহিরে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যে ঘরের ঠিক দোরের মুখে বাঘ বসে আছে। তার মুখটা উঠানের দিকেই ছিল, কিন্তু সে আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। আমি সেখান থেকে ফায়ার্ করায় বাঘ একবার পড়ে গিয়েই পর মুহূর্ত্তে ঘরের মধ্যে এক পাশে সরে গেল, আর দেখতে পেলাম না। আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে উঠানের মধ্যে দাঁড়ালাম, কিন্তু একেবারে দোরের মুখে যাওয়া উচিত মনে করলাম না। কারণ যদি গুলির আঘাত সাংঘাতিক না হয়ে থাকে তা হ'লে আমি তাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাবার আগে সে আমাকে আক্রমণ করার বেশী সম্ভব। ঘরের দরজা ফাঁক ছিল, তাতে তক্তা বা কোন ফ্রেম লাগান ছিল না, যে আমি সন্তর্পণে গিয়ে দরজাটা টেনে দেব। ঘরের চাল ফুটো করাও বৃথা, কারণ বাঘ যদি সতেজ

থাকে তা হ'লে চালের ছিদ্র দিয়ে ফায়ার্ করতে করতে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পালাবে। সেইজন্য আমি উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে বন্দুক ঠিক ক'রে ধরে ঘরের দরজার উপর লক্ষ্য রেখে গ্রামের লোকদের চেঁচিয়ে বললাম রাস্তার দিকে দেওয়ালে ছিদ্র ক'রে দেখতে—বাঘের কি হ'ল। যদি বাঘ বেঁচে থাকে আর দেওয়াল ফুটো করার শব্দে বেরিয়ে পড়ে আমি উঠানের পাশ থেকে গুলী করতে পারব। খানিকক্ষণ পরে লোকেরা বলল যে তারা ছিদ্র করেছে এবং দেখতে পাচ্ছে যে ঘরের মেঝেয় বাঘ শুয়ে পড়েছে। আমি তখন রাস্তায় গিয়ে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাঘকে দেখে নিলাম এবং তার পরে আবার ঘুরে এসে ঘরে ঢুকলাম। বাঘ চোখ বুজে সটান শুয়ে আছে দেখে মনে করলাম যে মরে গেছে। খুসী হয়ে যেমন তার লেজটা টেনেছি অমনি সে মাথাটা একটু তুলে 'ঘাঁক্' করে একটা ছোট গর্জন করেই আবার নেতিয়ে পড়ল। আমি তৎক্ষণাৎ তার মাথায় ফায়ার্ করায় সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হ'ল। বাঘটা যদি আর একটু সতেজ থাকত—তা হ'লে আমার সেদিন অত্যন্ত বিপদ ঘটত।

বন্দুকের গুলিতে আহত বাঘ মরার মতো পড়ে আছে, কিন্তু মানুষ তার কাছে যেতেই উঠে সেই মানুষকে সাংঘাতিক-ভাবে আক্রমণ করল, এরকম ঘটনা অনেক শোনা যায়। গুলীর দ্বারা প্রচণ্ডরূপে আহত হয়ে কখন কখন বাঘ প্রথমটা ঐরূপ নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। আঘাত যদি তখনি তখনি সাংঘাতিক না হয়, তা হ'লে খানিক পরে সামলে নিয়ে আবার পড়ে, এবং সেইজন্য প্রথম আঘাতের পর অল্প সময়ের

মধ্যে ঐরকম শুয়ে পড়া বাঘের কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। বাঘ যখন ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকে, দূর থেকে খুব ভালো করে দেখতে হয় যে সে মরেছে কি না। সকলের চেয়ে ভালো, একেবারে তার নিকটে যাওয়ার আগে একটু দূর থেকে তার কোন মর্ম্মস্থান, যেমন মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড, লক্ষ্য ক'রে আর একটা ফায়ার্ করা। তাতে যদি সে না নড়ল বা জীবনের কোন চিহ্ন দেখা না গেল, তখন একেবারে কাছে যেতে পারা যায়। তবে কোন কোন শিকারী মিছা-মিছি কার্ত্তুস্ খরচ করতে বা বার বার গুলী মেরে জানোয়ারের চামড়াটা নষ্ট করতে চান না। ঐ দ্বিতীয় কারণটা অনেক সময় শিকারের জন্তুর উপর আমার বার বার গুলী করার পক্ষে অন্তরায় হত। ঐরূপ ক্ষেত্রে দূর থেকে ঢিল বা পাথর ছুড়ে বাঘের গায়ে মেরে পরীক্ষা করা যায়, সে বেঁচে আছে কিনা। এই শিকারটায় আমার প্রথম ফায়ারের গুলী বাঘের বুকের একপাশে লেগে তার হৃৎপিণ্ড স্পর্শ না ক'রে একটি মাত্র ফুস্‌ফুস্ ভেদ ক'রে পিঠের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য তার মরতে একটু দেরী হচ্ছিল।

সময়ে সময়ে গুলীর আঘাতের অনেকক্ষণ পরেও নির্জীবের মতো পতিত বাঘের হাত থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। শীতের রাত্রিতে প্রথম প্রহরের শেষেই ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে একটা প্যান্থার্‌কে গুলী করেছিলাম। ক্ষীণ জ্যোৎস্নাতে ঠিক বুঝতে পারলাম না, শরীরের কোথায় গুলী লাগল। সে সেখানেই পড়ল না, পালিয়ে গেল। রাত্রিতে ক্যাম্পে ফিরে এসে পরদিন প্রাতে বেশ রৌদ্র উঠলে নিকটের গ্রামের লোকদের নিয়ে বাঘ খুঁজতে

গেলাম। রক্তের দাগ অনুসরণ ক'রে জঙ্গলের ভিতর ঢুকলাম, আমার পিছনে লোকগুলি আসছিল। অনেকটা গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের প্রায় ৫০ হাত আগে পাশাপাশি দাঁড়ান দুইটা শালগাছের মাঝখানে বাঘের পিছনের অংশ দেখা যাচ্ছে। বাঘটা পেট মাটিতে দিয়ে এবং পিছনের পা দু'খানা মাটির উপর ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে বলে মনে হ'ল। আমার সঙ্গের লোকেরা বাঘ দেখে যখন চেঁচিয়ে বলাবলি করতে লাগল—"বাঘ মরেছে" তখনও বাঘের নড়বার চিহ্ন দেখা গেল না। একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। যে জমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম সেটা ছোট বড় পাথরে ভরা ছিল আমি মুখ নীচু ক'রে দেখতে দেখতে পাথরগুলো এড়িয়ে চলছিলাম, হঠাৎ পিছনের লোকগুলি বলে উঠল—"দেখ্, হুজুর দেখ্"। আমি সুমুখে চেয়ে দেখি বাঘ নাই। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম—"বাঘ এখনই দাঁড়িয়ে উঠে একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে বনের মধ্যে ঢুকল।" আমি তখন বাঘ যেখানে ছিল সেখান থেকে ৩০ হাত মাত্র দূরে আছি। বাঘটা উঠবার আগে আমি যদি আর একটু এগিয়ে গিয়ে থাকতাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আক্রমণ করত, কারণ তার পরেই যা ঘটল তা থেকে বোঝা গেল যে সে নিতান্ত নিস্তেজ হয়নি। বাঘ অদৃশ্য হওয়ার পরে লোকগুলিকে পল্টার লাইন ক'রে চলতে বললাম এবং আমি তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। প্রায় ১০০ গজ চলার পর লাইনের একপাশ থেকে কয়েকজন বলে উঠল যে তারা তখনি বাঘটাকে সামনে একটা নালার মধ্যে ঢুকতে দেখল। সেদিকে গিয়ে

দেখলাম নালাটা সরু ও অগভীর, জল নাই, কিন্তু ঐ রকম নালা যেমন হয়ে থাকে, ছোট গাছের জঙ্গলে ভরা। নালার ধারে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে লক্ষ্য করায় কিছু দেখতে পেলাম না। একজন লোককে বললাম—নালার পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে। সে নালার পাশে পাশে আমার কাছ থেকে সাত আট হাত দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেমন দেখছে, বাঘটা গর্জ্জন ক'রে নালার ভিতর থেকে লাফ দিল, আর সেই সঙ্গে লোকটিও লাফ দিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বাঘ লাফিয়ে, যেখানে লোকটি দাঁড়িয়ে দেখছিল সেইখানে আমা হ'তে অন্য দিকে মুখ ক'রে পড়ল, এবং সে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে, আমার দিকে ফিরবার আগেই, ফায়ার্ ক'রে তাকে শেষ করলাম।

সময় বিশেষে প্যান্থারগুলো যে কত বেশী মানুষ-ঘেঁষা হয়, আর কি আসাধারণ ধৃষ্টতার পরিচয় দেয় তার একটা সেরা গল্প বল্‌ছি। আমি যে সময়ে এই পরিচ্ছেদ লিখতে আরম্ভ করেছি, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটে। আজ ৩০শে নভেম্বর, আর ঘটনার তারিখ ২৬শে নভেম্বর। আমার পুত্র যার দু'একটা শিকারের কথা আগে বলেছি—এটা তারই একটা শিকারের ঘটনা। ঘটনাটা এই ঃ—

ময়ূরভঞ্জে আমার পুত্রের একটা কাঠের ব্যবসায় আছে। কিছুদিন আগে যে জঙ্গলে তার করাতীরা কাজ করছিল সেখানে ম্যান্‌-ইটার্ প্যান্থারের উপদ্রব হয়। তাতে তার এবং তার নিকটের অন্যান্য কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তখন মহারাজার আদেশে একজন শিকারী গিয়ে ঐ বনের নিকটে ঐ বাঘে মারা একটি মানুষ মড়ির উপর বসেন,

এবং বসবার অল্পক্ষণ পরেই একটা প্যান্থার্‌কে মারেন, আর তার পর মড়ি সেইখানেই রেখে চলে আসেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে রাত্রিতে মড়ির আরো খানিকটা অংশ বাঘে খেয়ে গেছে। এতে বোঝা গিয়েছিল যে খুব সম্ভব ম্যান্‌-ইটার্‌ প্যান্থার্‌ ওখানে একটা নয়,—একজোড়া ছিল। যখন ঐ একটা প্যান্থার্‌ নিহত হবার পরেও মানুষের উপর বাঘের উপদ্রব বন্ধ হ'ল না, তখন লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল। মাঝে মাঝে একটি ক'রে মানুষ প্যান্থার্‌ দ্বারা নিহত হতে লাগল। করাতী বা যারা কাঠ টানে তাদের সঙ্গে যে দু'একজন বালক জঙ্গলে যায় বেশীর ভাগ ঐ বালকদের উপরেই রাত্রিতে ঐ বাঘের গুপ্ত আক্রমণ হ'ত। এই সংবাদ পেয়ে আমার পুত্র ঐ বাঘকে মারবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে গিয়ে তার নিজের লোকদের আশ্রয় দেবার জন্য জঙ্গলের ভিতর তৈরী একটা চালা ঘরে কিছুদিন ছিল। ঐ সময়টা আর কোন উপদ্রবের কথা শোনা না যাওয়ায় সে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। আজ থেকে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে পুনরায় সংবাদ পায় যে বাঘটা আবার দু'একটি বালককে হত্যা করেছে। তার পরেই ২৬শে নভেম্বর সে সংবাদ পায় যে জঙ্গলের ভিতরে তার ঘরের সংলগ্ন অপর একজন হিন্দুস্থানী কাঠের ব্যবসায়ীর ঘরের হাতার ভিতরেই বাঘে একটা গরু মেরে গেছে। এই সংবাদ পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ তার বাসা থেকে রওনা হয়ে ২২ মাইল পথ গিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় সেখানে পৌঁছুল। ঐ পথের শেষের সাত মাইল পাহাড়ের কঠিন চড়াই রাস্তা, সেই পথটা হেঁটে যেতে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেখানে পৌঁছে সে তার জন-

কয়েক লোককে তার নিজের ঘরে রাত্রির জন্য খাবার তৈরী করতে বলে দিয়ে ঐ হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীর ঘরে উপস্থিত হ'ল।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি এবং শিকার দেখবার জন্য কৌতূহলী একটী বাঙ্গালী যুবক আমার ছেলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আর সেখানে ঐ ব্যবসায়ীর আরও পাঁচ ছয় জন লোক সঙ্গে জুটল। ঘরটির দেওয়াল কাঠের রলার উপর মাটির লেপ দিয়ে তৈরী। ঘরের চার দিকে বারান্দা। সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুইটা বড় উঠান, আর জঙ্গলের ভিতর যেমন হয়, ঘর মায় উঠান কাঠের তক্তা শক্ত ক'রে মাটিতে পুতে তৈরী করা প্রায় সাত ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐ বেড়াতে ভিতরে ঢুকবার দোর মাত্র একটা। ঘরের যে বারান্দা দোরের বিপরীত দিকে, সেখানে একটা খোঁড়া বলদ বাঁধা থাকত। পূর্ব্ব রাত্রিতে ঘরে কোন লোক ছিল না এবং ঐ রাত্রিতেই বাঘ বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে বলদটিকে মেরে তাকে বারান্দা থেকে টেনে ঘেরা হাতার মধ্যেই এক কোণে নিয়ে গিয়ে খানিকটা মাংস খেয়ে গেছে। বেড়াটা উঁচু বলেই সে গরুটাকে হাতার বাহিরে নিয়ে যেতে পারে নি। ছেলে এই সব দেখে নিয়ে, বেশী রাত্রিতে বাঘ আবার মড়ির উপর আসবে এই অনুমান ক'রে, সকলকে যথাসম্ভব শীঘ্র আহারাদি ক'রে নিয়ে চুপ চাপ শুয়ে পড়তে ব'লে, ঘরের দেওয়ালে মড়ির দিকে দুইটা ছিদ্র করতে আদেশ দিল, উদ্দেশ্য বাঘ আসলে ঘরের ভিতর থেকেই গুলী করবে। অন্ধকার রাত্রি, টর্চের আলো ফেলতে হবে, সেইজন্য দুইটা ছিদ্রের দরকার। সাবল কুড়ুল দিয়ে একটা ছিদ্র করা হ'ল, তার পর অপর ছিদ্রটা করা হচ্ছে। ঘরের ভিতর সব শুদ্ধ আটজন লোক। যারা ছিদ্র

করছে, ছেলে সাধারণ গলায় তাদের বলে দিচ্ছে কি রকম ছিদ্র করতে হবে, দেওয়ালের উপর তাদের কুড়ুল সাবলের জোর খটাখট্ শব্দ হচ্ছে, ঘরে হারিকেন লণ্ঠনের আলো জ্বলছে, হাতার বাহিরেই ছেলের ঘরের বারান্দায় তার লোকেরা আগুন জ্বেলে রান্না চড়িয়েছে, রাত্রি মোটে সাড়ে সাতটা, এমন সময়ে কড়্মড়্ শব্দ শুনে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি আমার পুত্রকে বলে উঠলেন,—"বাবু, বাঘ ত আ'গিয়া মালুম হোতা।" তৎক্ষণাৎ পুত্রের কথায় সব চুপ হয়ে গেল, কেবল বাঘের খাওয়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল। পুত্রের আদেশে একজন লোক একটা ছিদ্র দিয়ে মড়ির উপর টর্চের আলো ফেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ছিদ্রটা অসম্পূর্ণ থাকায় সহজে ফেলতে পারল না। দুই তিনবার চেষ্টার পর যেমন আলো মুহূর্ত্ত মাত্র বাঘের উপর পড়ল পুত্র তৎক্ষণাৎ অপর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ফায়ার্ করল। ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ অল্প দূর বেগে দৌড়ে গিয়ে বেড়াটা লাফ দিয়ে পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল। শিকারী বুঝতে পারল না গুলী লাগল কিনা। একটু পরেই অল্প দূরে বাঘের কষ্টসূচক মৃদু গর্জ্জন দুইবার শোনা গেল এবং জলের উপর দিয়ে চলবার ছপ্ছপ্ শব্দ হতে লাগল। নিকটে একটা অগভীর বহতা নালা ছিল, সকলে অনুমান করল যে বাঘ নালা পার হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু শোনা গেল না। আমার পুত্র ও কয়েকজন লোক সেই রাত্রিতে সেই ঘরেই শুয়ে রইল। যদি রাত্রিতে বাঘ এসে আবার মড়িকে টানাটানি করে, এই ভেবে মড়িতে একটা সূতা বেঁধে সেটাকে দেওয়ালের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এনে পুত্র তার নিজের পায়ের সঙ্গে বেঁধে ঘুমুল, উদ্দেশ্য যে সূতাতে

টান পড়লেই সে জেগে উঠবে। প্রাতঃকালে 'বাঘরে, বাঘরে' বলে একটা গোলমাল হওয়াতে তার ঘুম ভাঙ্গল। বেরিয়ে এসে শুনল যে তখনি কয়েকজন একত্র হয়ে নালাতে জলশৌচ করতে গিয়ে দূর থেকে একটা বাঘকে নালাতে শুয়ে থাকতে দেখে পালিয়ে এসেছে। পুত্র তার বন্দুক নিয়ে নালার ধারে গিয়ে দেখে যে বাঘটা নালার ভিতর অল্প জলে পড়ে রয়েছে, এবং দেখেই বুঝতে পারল যে জানোয়ারটা জীবিত নাই। কাছে গিয়ে দেখল যে গুলী বুকের এক পাশে ঢুকে শরীর ভেদ ক'রে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে তখন বাঘটাকে তার বাসস্থান ময়ূরভঞ্জের প্রধান সহর বারিপদাতে নিয়ে আসল। বাঘটা লম্বায় পুরা সাত ফুট ছিল।

মনে হচ্ছে বাঘের সম্বন্ধে অনেক গল্পই বলা হ'ল। গল্প ত আছে আরও অনেক, কিন্তু সে সব গল্প এ পর্য্যন্ত যা বলেছি সেইগুলোর কোনটার না কোনটার মতোই হবে, তাতে একই গল্পের পুনরুক্তির মত শোনাবে, তোমাদেরও ভাল লাগবে না। যে গল্পগুলো বলেছি তা কতকটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে,—সে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঘের স্বভাবের কিছু পরিচয় দেওয়া আর বাঘ শিকার জিনিষটা কি তা বুঝিয়ে দেওয়া। প্রায়ই দেখতে পাই অতি-রঞ্জিত আর উচ্ছ্বাসময় গল্প শুনে শুনে লোকের মনে বাঘের বা বাঘ-শিকারীর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থেকে যায়। যাতে তোমাদের সেই রকম ভুল ধারণা না জন্মায় আমি তারই চেষ্টা করেছি, কতদূর সফল হয়েছি তোমরাই জান।

এইবার এমন একটা ঘটনার কথা বলব যা মনে করতে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হয়। তখন ভাদ্র মাস, বেলা নয়টার

সময় খবর পেলাম সেই দিনই ভোরের বেলায় এক গ্রামের একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গ্রামের বাহিরে রাস্তায় চলতে চলতে একটা প্যান্থারের একেবারে সামনে পড়ে যায়, এবং তৎক্ষণাৎ প্যান্থার্‌টা তাকে আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকটির চীৎকারে গ্রামের লোক ছুটে আসায় বাঘ তাকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ধারে একটা ধান ক্ষেতের মধ্যে চলে যায়। গ্রামের লোকেরা তখন থেকে ধান ক্ষেতের চার দিকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে কিন্তু বাঘকে আর দেখা যাচ্ছে না। গ্রামের একজন লোক এসে আমাকে এই সংবাদ দিল। আমার বাসা থেকে ঐ গ্রাম চার মাইল দূরে এবং রাস্তার অধিকাংশটা মোটর রাস্তা। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলাম। ধান ক্ষেতটা প্রায় আধ মাইল লম্বা আর ততখানিই চওড়া। সমস্ত ক্ষেতটা সরু আইল দিয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত এবং কিছু কম প্রায় এক হাঁটু জলে ভরা। আইলগুলির মাথা আর ধান গাছ জলের উপর জেগে রয়েছে। সমস্ত ক্ষেতের মাঝখানটাতে ধান গাছ বেশ বড় আর ঘন, যেন ঝোপের মতো হয়ে রয়েছে। আমি বাঘের পায়ের দাগ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে সে আইলের উপর দিয়ে যায় নি। বরাবর জলের ভিতর দিয়েই ক্ষেতের মাঝখানের দিকে গেছে, কেবল যেখানে আইল পার হয়েছে সেইখানে আইলের উপর তার পায়ের চিহ্ন পড়েছে। যতক্ষণ না ক্ষেতের মাঝখানটার কাছাকাছি পৌঁছুলাম ততক্ষণ ঐ চিহ্ন অনুসরণ ক'রে যেতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না, কারণ ঐ পর্য্যন্ত আইল-ঘেরা খণ্ডগুলোতে ধান গাছ খুব ঘন ছিল না।

আইলের উপর দাঁড়ালেই প্রত্যেক খণ্ডের সবটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, বাঘ থাকলে তখনই নজরে পড়বার কথা। যখন মাঝখানের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, তখন আমাকে বেশী সতর্ক হতে হ'ল, কারণ সেখানে ধান গাছ ঘন থাকায় তখন আর খণ্ড ক্ষেতগুলোর ধারে দাঁড়িয়ে তার সমস্তটা একেবারে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার সঙ্গে গ্রামের দশ বার জন লোক টাঙ্গি, তীর ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে আসছিল, আর তাদের মধ্যে ছয় ফুটের উপর লম্বা বেশ জোয়ান একজন চৌকিদার একটা চার হাত লম্বা মোটা এবং ভারী শালের রলা নিয়ে চলেছিল। ঐখানে গিয়ে আমি সঙ্গের লোকদের একটু পিছনে সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক খণ্ড-জমির চার পাশের আইলের উপর সাবধানে বাঘের পায়ের দাগ লক্ষ্য করতে করতে বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম,—ঐ খণ্ড থেকে পরের খণ্ডে বাঘ গেছে কিনা। এই রকম সাবধানে এগিয়ে যেতে যেতে একটা জমির ধারে গিয়ে পৌঁছুলাম, যার মধ্যে ধান গাছ বেশ ঝোপের আকার ধারণ করেছে। আমার সঙ্গের একজন লোক ঐ জমিটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বলল,—"বাঘ সম্ভবতঃ ঐ ঝোপের মধ্যে আছে, কারণ ঐ স্থানের ধান গাছগুলো একটু একটু নড়ছে বোধ হচ্ছে"। এই শুনে আমি ভালো ক'রে দেখব বলে যেমন আইলের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছি, বাঘ ঝোপের ভিতর থেকে গর্জ্জন ক'রে লাফ দিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। যেখান থেকে সে লাফ দিল সেখান থেকে আমি তখন মাত্র ১২।১৩ হাত দূরে। এই আক্রমণের জন্য আমি যে পূর্ব্ব হতেই সম্পূর্ণভাবে

প্রস্তুত হইনি এইটাই হয়েছিল আমার ভয়ানক ভুল। আমি রাইফ্‌লের নলার মুখটা মাটির দিকে নীচু ক'রে রাইফ্‌ল্‌টাকে এক হাতে ধ'রে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সেটাকে লক্ষ্য করার মতো ক'রে ধরা ছিল না, সুতরাং লাফের সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার্ করা সম্ভব হ'ল না। ঐ অবস্থায় মানুষ না ভেবেচিন্তে কলের মতো আপনা আপনি যা ক'রে বসে আমি তাই করলাম। সে আমার দিকে যেমন সোজা লাফাল আমি সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে দাঁড়াবার জন্য আমার বাম পা আইলের পাশে জলের ভিতর চালিয়ে দিলাম, আর তৎক্ষণাৎ কাদায় পিছলে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। ডান পা তখন আমার আইলের উপরে, আর বাঘ এসে পড়ল সেই পায়ের উপর। আমার পনের ষোল হাত পিছনে লোকেরা চীৎকার ক'রে উঠল। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঘ আমাকে আর আক্রমণ না ক'রে সেখান থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে ঐ লোকদের মধ্যে পড়ে তাদের আক্রমণ করল। আমি তখনি উঠে দাঁড়ালাম আর রাইফ্‌ল্ তুললাম গুলী করবার জন্য। কিন্তু আমার হাতের রাইফ্‌ল্ হাতেই রয়ে গেল। আমি গুলী করব কাকে? তখন যে বাঘে মানুষে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, আমি গুলী করলেই যে সেই গুলীতে দু'এক জন লোক মরবে। সে কি যুদ্ধ! যারা কখনও বাঘের আক্রমণ না দেখেছে, বর্ণনা ক'রে তাদের বোঝান শক্ত যে সে আক্রমণ কি তীব্র আর কি ভীষণ ক্ষিপ্র। বাঘ বিদ্যুৎগতিতে একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরছে, আর সকলে মিলে চেষ্টা করছে তাকে আঘাত করবার জন্য, কিন্তু বাঘের বিদ্যুতের মত চঞ্চলতায় তাদের আঘাতগুলো প্রায়ই ব্যর্থ হচ্ছে। এই দেখে

আমি রাইফ্‌লের নলার আগাটা দুই হাতে মুঠো ক'রে লাঠির মতো ধরে ঐ যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য ছুটলাম। আমি তাদের ভিতর গিয়ে যেমন পৌঁছেছি তৎক্ষণাৎ ঐ জোয়ান চৌকিদারের ভারী শাল দণ্ডের এক প্রচণ্ড আঘাত পড়ল বাঘের একেবারে মাথায়, ঠিক যে সময় বাঘ চৌকিদারের পাশের লোকের উরু কামড়ে ধরেছে। একখণ্ড বাঁশ শক্ত মাটিতে জোরে আছড়ালে যেমন শব্দ হয় সেই রকম শব্দ হ'ল আঘাতের। মাথায় এই আঘাতে বাঘ যেন হঠাৎ চেতনা হারাল, তার শরীর একটু শিথিল হয়ে পড়ল, যাকে কামড়ে ধরেছিল তাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে বসে গেল। সেই মুহূর্ত্তে তার উপর উপর্য্যুপরি টাঙ্গির আঘাত আর বল্লমের খোঁচা পড়াতে সে শুয়ে পড়ল, এবং লোকেরা তখন টাঙ্গির আঘাতে তাকে প্রায় খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলল। পূর্ণ বয়স্ক হ'লেও বাঘটা মাঝারী আকারের, আর তার একটা দাঁত ভাঙ্গা ছিল, তবু তার এত বিক্রম। সমস্ত ঘটনাটাতে এক মিনিটের বেশী সময় লাগেনি বলে আমার ধারণা।

আমি দেখলাম যে লোকগুলির কয়েকজনের শরীরে বাঘের নখের আঁচড় লেগেছে আর তিন জনের শরীরে বাঘ গভীর ভাবে দাঁত বসিয়েছে, কিন্তু কারও কোন মর্ম্ম-স্থানে আঘাত লাগেনি বা বড় রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হয়নি। দাঁত বসান ঘাগুলো সবই মাংস ভেদ করায় (flesh wound) হয়েছিল, একজনের ঘাড়ে আর বাহুমূলে, একজনের পিঠে আর একজনের উরুতে। আমি জানতাম যে ঘাগুলো, বিশেষতঃ দাঁতবসান ঘাগুলো,—বিষাক্ত হবার বেশী সম্ভাবনা। আমি সেইজন্য ঐ তিনজন লোককে

আমার মোটরকারে চড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে এলাম এবং অপর আহত লোকদের হেঁটে আসতে বললাম। হাসপাতালে এসেই ডাক্তারকে (সাব্-এসিষ্টাণ্ট্ সার্জন্‌কে) যা বলেছিলাম তা আমার মনে আছে। আমি বললাম—"ডাক্তার, ভেব না যেন এরা সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়নি বলে এ সব কেস্ সহজ হবে। আমার বিবেচনায় বিষধর সাপে কামড়ালে লোকের যেমন জীবন-সংশয় হয় এদেরও তাই। ভালো ক'রে চিকিৎসা কর আর এদের ছেড়ে না দিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নাও।" এই বলে আমি বাসায় চলে এলাম।

এতক্ষণ একটা দারুণ উত্তেজনার আর তার পর আহত লোকদের সম্বন্ধে করণীয় কাজগুলো করবার জন্য উদ্বেগের মধ্যে থেকে সময়টা আমার স্বপ্নের অবস্থার মতো কেটেছিল। কিন্তু বাসায় ফিরে এসে আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ হ'ল। আমি ভাবতে লাগলাম—এ হ'ল কি ? আমার হাতে রাইফ্ল্ থাকতে এতগুলো লোককে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারলাম না, এই দুঃখ আমাকে বড়ই পীড়া দিল, মনে হ'ল আমার বন্দুক ধরা নিরর্থক। সে দিন স্নানাহারে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। তার পরেও তিন চার দিন লোকের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারিনি।

সকলের চেয়ে মর্ম্মান্তিক হ'ল তার পরে যা ঘটল তাতে। আমি হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর ঐ তিন জন আহত লোকদের আত্মীয় স্বজন—মেয়ে পুরুষে এসে বলে যে তারা ঐ লোকদের বাড়ী নিয়ে যাবে, হাসপাতালে থাকতে দেবে না। আহত লোকগুলিও হাসপাতালে থাকতে রাজী হয়নি। কাজেই

ডাক্তার তাদের ঘা ধুইয়ে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই দিনই পুনরায় বৈকালে হাসপাতালে গিয়ে এই কথা ডাক্তারের মুখে শুনলাম। আমি তাঁকে বললাম— "এদের ছেড়ে দিয়ে ভাল করলে না।" হ'লও তাই। দেহ বিষাক্ত হয়ে সাত দিনের মধ্যে সেই তিনটি লোকেরই জীবন শেষ হ'ল। এই সংবাদে আমার মনে যে ব্যথা লেগেছিল তা কখনও ভুলিনি। এ দশ বৎসর আগেকার কথা, কিন্তু এখনও যখন মনে পড়ে তখন যেন সমস্ত ঘটনা চোখের উপর দেখতে পাই, এবং অনুতাপ হয় হাতে বন্দুক থাকতে লোকগুলিকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বলবার মতো বাঘের গল্প ত একরকম শেষ করেছি, এখন জঙ্গলের অন্য দু'একটি জানোয়ারের কথা বলব। সে সম্বন্ধে বেশী গল্পের সঞ্চয় আমার নাই, কারণ সেগুলোতে বৈচিত্র খুব কম। হরিণের কথাই আগে বলি। গল্প বলতে বসে সব প্রথমেই বলেছি যে হরিণের সম্বন্ধে দু'একটা গল্প বলবার ইচ্ছা আছে।

ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে সচরাচর তিন রকম হরিণ দেখতে পাওয়া যায়—সম্বর, চিত্র হরিণ বা চিতল, আর কুটারি। ভারতবর্ষে যত রকম হরিণ আছে তার মধ্যে সম্বর হচ্ছে সবচেয়ে বড় জাতের। একটা পূর্ণ বয়সের পুরুষ সম্বরের আকার একটা মাঝারি আকারের ঘোড়ার মতো হবে। এদের শিংগুলো ডাল পালা দেওয়া, বড়, আর খুব শক্ত। হরিণের স্বভাব খুব ভীরু বলে সকলে জানে, কিন্তু এই জাতের পুরুষ হরিণগুলো নিতান্ত ভীরু স্বভাবের নয়, আক্রান্ত হ'লে তারা লড়তে প্রস্তুত হয়। তা বলে এ নয় যে রয়্যাল্ টাইগার্ দ্বারা আক্রান্ত হ'লে লড়াই করবার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এদের গায়ের রং পাট্‌কিলে, গায়ে মোটা মোটা লোম। তোমরা যদি আলিপুর পশুশালায় যাও তা হ'লে সম্বর দেখতে পাবে। চিত্র হরিণ তোমরা সকলেই দেখেছ, তার আকৃতির কথা আর বলতে হবে না। কুটারি এক রকম ছোট জাতের হরিণ, এ'কে ঐ দেশে 'বনছেড়ি'ও বলে, কারণ আকারে এগুলো

ছাগলের চেয়ে বড় হয় না। এদেরও গায়ের রং পাট্‌কিলে, তবে সম্বরের মতো অত ঘন রং নয়। কৃষ্ণসার হরিণ ময়ূরভঞ্জে নাই।

আর এক রকম হরিণজাতীয় অতিশয় সুন্দর ছোট জানোয়ার ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতে দেখা যায়, যদিও তারা সংখ্যায় খুব কম। উঁচুতে এরা দশ এগারো ইঞ্চির বেশী হয় না। এই হরিণের ঐ দেশী নাম "গেণ্ডুয়া" হরিণ, এর ইংরাজী নাম মাউস্ ডিয়ার্ (mouse deer) বা মুসা হরিণ। এদের শরীরের গঠন কতকটা ইন্দুরের মতো বলেই বোধ হয় ঐ নাম দেওয়া হয়েছে, দেখলে হঠাৎ হরিণ বলে বোধ হয় না। দেহের গঠন অতি সুকুমার এবং রংএর বৈচিত্রও মনোহর, দেখলেই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা হয়। শুনেছিলাম এই জানোয়ার বেশ পোষ মানে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে এই সুন্দর জীবটিকে পোষা ঘটেনি, কখনও জীবিত অবস্থায় এ'কে পাইনি। একবার একটি এই জাতীয় হরিণকে ধরতে চেষ্টা ক'রে বড়ই পরিতাপের কারণ ঘটেছিল। সেটা বলছি।

পাহাড়ের ভিতর গভীর জঙ্গলে একটা ছোট বেড় শীকার করাচ্ছি। মাচান করবার সময় ছিল না, আমি মাটিতেই দাঁড়িয়েছি। বিটে শিকার করবার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। বিটার্‌রা যখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে তখন দেখলাম এই জাতীয় পাঁচ-ছয়টি জানোয়ার আমার চারদিকে লাফাচ্ছে। দু'একবার লাফিয়ে সবগুলোই বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। ইচ্ছা করলে দু'একটাকে মারতে পারতাম কারণ ছট্‌রা দেওয়া কার্ত্তুস্ ভরা সাদা-নলী বন্দুকও একটা তখন আমার সঙ্গে ছিল,

কিন্তু আমার মারতে ইচ্ছা হ'ল না। আমার সামনে প্রায় ৪০ ফুট্ দূরে একটা গাছ ছিল, আর তার কাছে কোন ঝোপ ছিল না। একটা হরিণকে ঐ গাছের নীচে লাফাতে দেখলাম, তার পরে আর তাকে দেখতে পেলাম না। মনে করলাম হরিণটি গাছের ওপাশে লুকিয়েছে, বিটার্‌রা আসলেই তাদের গাছটাকে ঘেরাও ক'রে হরিণকে ধরতে বলব। বিটার্‌রা আসতেই তাদের ঐ কথা বললাম। তারা সাবধানে গাছটার একটু দূর থেকে চারপাশ ঘেরাও ক'রে এগিয়ে গেল, কিন্তু হরিণ দেখতে পেল না। আমি আশ্চর্য্য হলাম, কারণ আমি গাছের উপরে নজর রেখেছিলাম, গাছের গোড়া থেকে হরিণ অন্য দিকে সরে গেল নিশ্চয় দেখতে পেতাম, সে জায়গাটা এমনি পরিষ্কার ছিল। তখন একজন বিটার্ গাছের গুঁড়ির চারপাশে ঘুরে দেখতে দেখতে বলল—"গেণ্ডুয়া এই গাছেই আছে। গুঁড়িটা ফোঁপরা, আর মাটির কাছে গুঁড়িটাতে একটা ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্র দিয়ে গেণ্ডুয়া ফোঁপরার মধ্যে ঢুকেছে।" আমি কাছে গিয়ে দেখলাম যে তাই বটে, আরও দেখলাম যে মাটি থেকে প্রায় দুই ফুট্ উঁচুতে গুঁড়িতে আর একটা ছিদ্র আছে যার ভিতর দিয়ে ঐ ছোট জানোয়ারটি বেরিয়ে আসতে পারবে। দুইটা ফুটোতেই চোখ লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কিন্তু গুঁড়িটা মোচড়ান (twisted) মতো থাকায় ফোঁপরার ভিতরটা দেখতে পেলাম না। উপরের ছিদ্রতে কাণ লাগিয়ে, শোনায় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। ছিদ্র দুইটাতে কাঠ পুরে দিয়ে তাড়া দেওয়ার অনেকবার চেষ্টা করাতেও সে কিছুতেই বেরুল না, আর কাঠ দেওয়াতে আরও ভালো ক'রে বোঝা গেল যে ফোঁপরার ভিতরটা সরল নয়,

প্যাঁচালো। তখন একজন বিটার্—"আমি হরিণ বা'র করে দিচ্ছি"—এইকথা বলে কতকগুলো শুক্‌নো ডাল আর পাতা এনে নীচের ছিদ্রের মুখ থেকে আধ হাত দূরে সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া ভিতরে যেতেই জানোয়ারটি উপরের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল এবং তাকে স্পষ্ট দেখা গেল, কিন্তু সেই ছিদ্রের মুখে মানুষ তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে রয়েছে দেখেই সে আবার ভিতরে চলে গেল। ইতিমধ্যে আগুন বেশ জ্বলে উঠেছে আর তার শিখা নীচের ছিদ্রের ভিতর পর্য্যন্ত এক এক বার চলে যাচ্ছে। আমি বলছি—"আগুন সরিয়ে নাও,—হরিণ পুড়ে মরে যাবে যে", এই বলতে বলতে একটা শব্দ হ'ল আর দেখলাম হরিণ ছিদ্রের মুখে পড়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ একজন আগুনের মধ্যেই হাত দিয়ে তাকে তুলে নিল। দেখা গেল তার শরীরের স্থানে স্থানে লোম পুড়ে গেছে এবং সে নির্জীব হয়ে পড়েছে। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করা গেল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হ'ল। বড় কষ্ট পেয়েছিলাম সে দিন, ঐ জীবটিকে কারও মারতে ইচ্ছা ছিল না।

আমার হরিণ শিকারের গল্প কোনটাই ভালো গল্প নয়। ভালো হবে কি ক'রে? নিরীহ প্রাণীর শিকার, যার ভিতর বিপদের সম্ভাবনা নাই, ভালো গল্পের বিষয় হয় না।

আর একদিন একটা হরিণ শিকারে লজ্জিত হয়েছিলাম। বেড় শিকারে মাচানে বসেছি। দেখলাম দূরে একজোড়া হরিণ আসছে—তার মধ্যে একটা শিঙাল্ অর্থাৎ পুরুষ। আসতে আসতে কতকগুলো গাছের আড়ালে তারা চলে গেল—আর দেখতে পেলাম না। আমি সেই দিকেই চেয়ে রইলাম, কোথায়

আবার তাদের দেখা যাবে। একটু পরেই দেখলাম একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে শিং তুইটা দেখা যাচ্ছে। ঝোপ থাকায় হরিণের নীচের অংশ দেখা যাচ্ছিল না। শিং তুইটা স্থির হয়ে ছিল, তার মানে হরিণ এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। শিংএর একটু পিছনে লক্ষ্য ক'রে ফায়ার্ করাতে শিং আর দেখা গেল না। বুঝতে পারলাম না গুলী লাগল কিনা। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে খানিকক্ষণ পরে প্রায় ঠিক সেই খানেই শিং তুইটা পুনরায় দেখা গেল। আবার ফায়ার্ করলাম আর এই বার পুরুষ হরিণটা একবার লাফিয়ে উঠল, তার পর আর দেখা গেলনা। বিট্ যখন শেষ হ'ল, তখন গিয়ে দেখলাম তুইটা হরিণই,—অর্থাৎ পুরুষ হরিণ এবং হরিণী,—মরেছে। আমার প্রথম ফায়ারের সময় হরিণীটি ঝোপের মধ্যে হরিণকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল, আর ঐ ফায়ারের গুলী তারি কণ্ঠনালী ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ফায়ার্টা পুরুষ হরিণের পার্শ্বদেশ ভেদ করেছিল। অজানিত ভাবে হরিণীকে মেরে, শিকারের নিয়ম-বহির্ভূত কাজ ক'রে লজ্জিত হয়েছিলাম।

কোল সাঁওতালদের মধ্যেও যে শিকারে নিয়মানুবর্ত্তিতার এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতার, অর্থাৎ যাকে Sporting spirit বলা যেতে পারে, তার অভাব নাই,—তার সুন্দর পরিচয় একবার একটা হরিণ শিকারে পেয়েছিলাম। বেড় শিকারে আমার মাচানের সামনে দিয়ে একটা সম্বর হরিণ মহাবেগে ছুটে যাচ্ছে এমন সময় তাকে গুলী করল্যম। হরিণটা পড়ল না, পালিয়ে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই বিট্ শেষ হ'ল। মাচান থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি, সেই সময় খানিক দূরে একটা

ভারী গোলমাল শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখলাম অনেকগুলি বিটার্ ছুটোছুটি করছে আর তাদের ভিতর কয়েকজন বনের মধ্যে কি একটাকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছুড়ছে। আমি দৌড়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে ২৫।৩০ হাত দূরে একটা সম্বর তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করায় লোকগুলি বলল যে তারা যেতে যেতে দেখতে পেল যে ঐ সম্বরটা আস্তে আস্তে চলেছে, আর দেখেই তারা তীর মেরে তাকে ফেলেছে। আমার মনে হ'ল যে আমি যে সম্বরকে গুলী করেছিলাম এ সেইটাই, এবং সে নিশ্চয় আমার গুলীতে আহত হয়েছিল, কারণ তখনি বিট্ শেষ হয়েছে, মাচান থেকে ঐ জায়গা আধ মাইলের মধ্যে, ও অবস্থায় সম্বর আহত না হ'লে ঐ রকম জায়গায় ধীরে ধীরে যেত না, বিটার্দের দেখেই দৌড়ে পালাত। আমি ঐ লোকদের বললাম যে ঐ সম্বর আমার গুলীতে আহত এবং সেই জন্যই তারা তাকে মারতে পেরেছে। এই কথা শুনে তাদের ভিতর থেকে একজন আধাবয়সী লোক, যার চোখে মুখে কর্ত্তৃত্বের ছাপ রয়েছে, বেরিয়ে এসে বলল—"তুই এখন আর সম্বরের কাছে যাস্‌নে, এইখান থেকে বল্ সম্বরের কোথায় গুলী করেছিস্।" আমি বললাম যে আমি সম্বরের ডান পাশে গুলী করেছি, আর খুব সম্ভব গুলী তার পেটে লেগেছে। পেটে লেগেছে একথা বলার কারণ এই যে আমার শক্তিশালী (high velocity) রাইফ্‌লের গুলী সম্বরের বুকে লাগলে সে কখনই অতদূরে আসতে পারত না, আর পায়ে লাগলেও পা চূর্ণ হয়ে যেত, তিন পায়ে এর মধ্যে অতটা পথ চলে আসতে পারত না, রাস্তাতেই পড়ত। আমি কোন্ দিক

থেকে কি ভাবে গুলী করেছি সে কথা শুনে সেই লোকটি বলল—"আয়, এইবার দেখি গিয়ে।" তখন সকলে মিলে সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার কথাই ঠিক, গুলী সম্বরের তল-পেটের ডান পাশে লেগে তলপেট ভেদ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একটা বড় সম্বরের শরীরে এপার ওপার ছিদ্র ক'রে দিয়ে বেরিয়ে যায় এত বড় আঘাত তীরের দ্বারা হওয়া কঠিন। এই দেখে তখনি সেই প্রৌঢ় লোকটি তার সঙ্গীদের সম্বোধন ক'রে বলল,—"এ সম্বর আমাদের নয়, এটা বাবুর সম্বর", এবং এই কথা বলা মাত্র সকলে সম্বর থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তখন আমি তাদের হেসে বললাম,—"না, এ আমি নেব না, তোমরা নাও, চামড়াটা আমাকে দিও।" এই বলতেই প্রৌঢ় লোকটি উড়িয়া ভাষায় বলে উঠল,—"আরে, এ ত রজা পরি হেলা"—অর্থাৎ "এ যে রাজার মতো হ'ল", তার মানে আমার আচরণটা রাজার মতোই উদার হ'ল। এতই খুসি তারা হয়েছিল সম্বরটা পেয়ে। এক ঘণ্টার মধ্যেই এক খণ্ড মাংস আর চামড়াটা আমার ক্যাম্পে পৌঁছুল। জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম, প্রৌঢ় লোকটি একজন 'দেশপ্রধান',—অর্থাৎ যে তার জাতির সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের নির্দ্দেশক এবং বিচারক, এবং ঐ বিষয়ে যার আদেশ জাতির সকলে মানতে বাধ্য। শিকারে নিহত জন্তুর উপর দাবী নিয়ে যদি এদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন দেশপ্রধানই সে বিবাদের নিষ্পত্তি করে।

জঙ্গল বিট্ করা ছাড়া আরও অনেক উপায়ে হরিণ শিকার করা হয়। কয়েক রকম বনের ফল হরিণের বড় প্রিয়, ঐ সব

ফল পাকলে হরিণ প্রায়ই সেই গাছের গোড়ায় আসে, আর শিকারী ঐ রকম জায়গায় লুকিয়ে বসে থেকে মারে। জঙ্গলের ধারে যে সব শস্যের ক্ষেত থাকে, যেমন মুগ, কলাই, অড়হর ইত্যাদি, রাত্রিতে ঐ ক্ষেতের কাছে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকলেও হরিণ শিকার করা যায়। শস্যের ক্ষেতে চিতল হরিণই আসে, সম্বর নয়। সম্বর গভীর বনেই থাকতে ভালোবাসে, লোকালয়ের কাছে খুব কম আসে। চিতল হরিণ কিন্তু অনেকটা মানুষঘেঁষা। বেশী দিন হরিণ শিকার বন্ধ থাকলে এদের এত বেশী বংশবৃদ্ধি হয় যে তখন জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী ক্ষেতগুলিতে কৃষিরক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে ময়ূরভঞ্জের প্রধান সহর বারিপদার সংলগ্ন রক্ষিত (Reserved) জঙ্গলে চিতল হরিণ এত বেশী হয়েছিল যে সন্ধ্যার পরে সহরের কাছেই প্রধান মোটর রাস্তার উপরে দলে দলে তাদের দেখা পাওয়া যেত, এবং ক্ষেতের ভিতর ঢুকে ফসল নষ্ট করা তাদের নিত্যকার ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তখন শিকারীদের অবাধ হরিণ শিকারের অনুমতি দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কিছুদিন পরে হরিণের সংখ্যা কতক কমে যাওয়াতে পুনরায় হরিণ শিকারের নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হয়েছে।

তোমরা বোধ হয় সকলে জান না যে, যে সব জন্তু মাংসাশী নয়, ঘাস পাতা ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাদের মাঝে মাঝে নুন খাওয়ার বড় দরকার হয়। এ না হ'লে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, আর সেই জন্য নুন খাওয়ার প্রবৃত্তি ঐ সব জন্তুর একটা স্বভাবজ সংস্কার। তোমাদের মধ্যে যাদের ঘরে ঘোড়া গরু বা মহিষ আছে তারা দেখে থাকবে যে ঐ সব

জন্তু নুন খেতে কত ভালোবাসে। ঐ সব গৃহপালিত পশুকে মাঝে মাঝে নুন খেতে দিতেই হয়। বনের হরিণ, গয়াল (যার কথা পরে বলছি) এমন কি হাতীও ঐ রকম নুন খেতে ভালোবাসে। বলতে পার তারা নুন পায় কোথায়? বনের মধ্যেই তাদের নুন জোটে। বনের মধ্যে স্থানে স্থানে লোনা মাটি থাকে, তারা ঐ মাটি চাটে। বিশেষতঃ যে সব নির্ঝরের উৎপত্তি-স্থান লবণাক্ত এবং সেই কারণে যেখানে লোণা মাটি সর্ব্বদাই ভিজে থাকে বা মাটিতে লোণা জল জমে থাকে সেখানে ঐ সব জানোয়ারের গতিবিধি অত্যন্ত বেশী। ঐ সব জায়গায় গেলেই দেখা যায় মাটিতে বহু হরিণ গয়াল আর হাতীর পায়ের দাগ; তারা স্থানটি মাড়িয়ে, চট্‌কে কাদা করে রেখে গেছে। এই রকম জায়গার ঐদেশী নাম হচ্ছে—"ভোল্", এবং এ'কে ইংরাজীতে বলে Salt lick। এই ভোল্ হরিণ বা গয়াল শিকারের একটি প্রকৃষ্ট স্থান। ভোলের কাছে মাচান ক'রে রাত্রিতে বসে থাকলে প্রায়ই ঐসব জন্তুর দেখা পাওয়া যায়। আমি বহুবার ভোলে বসেছি। ভোলে যে সব জন্তু আসে তারাও খুব সতর্ক হয়ে আসে, কারণ মানুষের মতো বাঘও ঐ সব ভোলের কাছে গুপ্তভাবে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে। আমি যত ভোল্ দেখেছি তার অনেকগুলোর কাছেই নরম মাটিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। সেইজন্য রাত্রিতে একা ভোলের কাছে মাচান থেকে নামা বিপজ্জনক। আমার মনে হয় সম্বর জানোয়ারটি চিতল হরিণের চেয়ে বেশী সতর্ক স্বভাবের, কারণ দেখেছি যে চিতল হরিণ একবার ভোলের কাছে আসলে প্রায়ই নুন না চেটে ফিরে যায় না,

কিন্তু সম্বর বড়ই ইতস্ততঃ করে, ভোল্ থেকে দূরে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং কখন কখন সেখান থেকে ডাকতে আরম্ভ করে। সম্বরের ডাক বড় অদ্ভুত শুনতে, অনুকরণ করা কঠিন। ডাক খুব চড়া এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা হলেও গম্ভীর। গভীর রাত্রিতে বনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলে সে ডাক যখন আকাশে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে যায় তখন যারা এটাকে হরিণের ডাক বলে না জানে তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়।

গভীর জঙ্গলে সম্বর শিকারের আর একটা জায়গা আছে। পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ সম্বরের একটা আশ্চর্য্য অভ্যাস আছে। পাহাড়ের উপত্যকায় সমতল বনভূমির উপর দিয়ে যে সমস্ত ছোট পার্ব্বত্য নদী বয়ে যায় সেগুলোর দুই তীরে জায়গায় জায়গায় খানিকদূর পর্য্যন্ত মাটি এত ভিজে আর নরম থাকে যে তার উপর দিয়ে চলতে গেলে কাদায় পায়ের পাতা ডুবে যায়। পৌষ মাঘ মাসে যখন পাহাড়ের মধ্যে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হয় তখন বড় পুরুষ সম্বরগুলো এসে জলের ধারে ঐ কাদায় রাত্রিতে শুয়ে পড়ে থাকে আর গড়াগড়ি দেয়। প্রত্যেক সম্বরের তার নিজের পছন্দ করা একটা ক'রে নির্দ্দিষ্ট জায়গা থাকে শুয়ে থাকবার জন্য। একই জায়গায় রোজ শুয়ে থাকতে থাকতে জায়গাটা একটা লম্বা গর্ত্তে পরিণত হয়ে গিয়ে ছোট নৌকার খোলের মতো আকার ধারণ করে, আর তার উপরটা বেশ মসৃণ হয়। এ গর্ত্তগুলোকে ঐ দেশের লোকেরা 'পটিয়া' বলে। 'পটিয়া' মানে পাটি বা মাদুর—যার উপর শোয়া বা বসা যায়। পর্ব্বতের ধারে একটি গ্রামের অধিবাসী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি শীতকালে মাঝে মাঝে পর্ব্বতের

উঁচু উপত্যকার মধ্যে পটিয়া দেখতে যেতাম। যেখানে যেখানে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন প্রত্যেক জায়গায় পাঁচ ছয়টা ক'রে পটিয়া রয়েছে দেখতে পেতাম। পটিয়াগুলি ভালো ক'রে দেখলে দেখা যায় সবগুলিতেই সম্ভরের মোটা মোটা লোম কাদার সঙ্গে মিশে রয়েছে। আমি দু'একবার পটিয়ার উপর মাচানে বসেছি, কিন্তু আমি বসে থাকতে সম্ভর আসেনি, খানিকদূরে দাঁড়িয়ে ডেকে ফিরে গেছে। বোধ হয় মানুষের গন্ধ নাকে যাওয়ায় পটিয়াতে আসতে সাহস করেনি। ঐ ভদ্রলোকের প্রধান কাজই ছিল কয়েকজন খড়িয়া বা বাথুড়ি (ঐ দেশের আর একটি অনার্য্য জাতি) অনুচরের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে হরিণ শিকার করা। তাঁর এক অত্যন্ত পুরানো জোড়নলী গাদা (muzzle loading) রাইফ্‌ল্‌ ছিল,—তাই দিয়ে তিনি ঐ কাজ করতেন। সমতলবাসী লোকদের ভিতর ওরূপ পাহাড়ে চড়তে দক্ষ লোক আমি খুব কম দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সম্ভরের ঐ রকম শীতকালে পটিয়াতে শোবার অভ্যাসের কারণ কি ? তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজেও ঠিক জানেন না, তবে দুইটি কারণের কথা শুনেছেন। একটি হচ্ছে যে, যে কারণেই হোক ঐ সময়ে পুরুষ সম্ভরের দেহে বেশী চর্ব্বি সঞ্চিত হয়ে শরীর গরম হয়ে যায়, আর সেই অস্বস্তি নিবারণের জন্য তারা পটিয়াতে শোয়। অপর কারণ, ঐ সময়ে পাহাড়ে উপত্যকায় এক রকম লম্বা ঘাসের ফুল ফোটে যাতে কাঁটার মতো লম্বা আর সরু সরু কাঠি থাকে, সেই কাঁটা সম্ভরগুলোর গায়ে বিঁধে জ্বালা দেয় আর চুলকানির সৃষ্টি করে, আর তাই নিবারণ করবার জন্য তারা ঐ উপায় অবলম্বন করে।

আমি কিন্তু শেষের কারণটা সঙ্গত বলে মনে করি না। যদি তাই হত তা হ'লে কেবল পুরুষ সম্বরগুলোই পটিয়াতে আসবে কেন? স্ত্রী সম্বরগুলোর গায়ে কি কাঁটা ফোটে না?

হরিণ শিকারের আর এক উপায় আছে, এবং তাকেই যথার্থ মৃগয়া বলা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে বনের মধ্যে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে তাকে শিকার করা। এটা মোটেই সহজ কাজ নয়, এবং নিপুণ শিকারী না হ'লে করতেই পারে না। শিকারী বনের মধ্যে এক জায়গায় হরিণের সদ্য পদচিহ্ন দেখতে পেল আর সেইটাকে দেখতে দেখতে নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রে চলল। যেতে যেতে মাঝে মাঝে সে চিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যেতে লাগল আর শিকারী অনেকটা ঘুরে বেড়িয়ে অনুসন্ধান ক'রে পুনরায় ঐ চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে তাই ধরে চলল। সময়ে সময়ে অন্য হরিণের পদচিহ্নের সঙ্গে মিশে খানিকদূর গিয়ে আবার আলাদা হয়ে দেখা দিল। এই রকম সতর্ক হয়ে নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে হয়ত হরিণের দেখা মিলল, না হয় অনুসরণ একেবারেই নিষ্ফল হ'ল। হয়ত বা হরিণের দেখা পাওয়া মাত্র গুলী করবার আগেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল, শিকারী আবার তাকে অনুসরণ ক'রে চলল। যে সব বনে বাঘ ভালুক আছে সে বনে এইরূপ অনুসরণ মোটেই নিরাপদ নয়, অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে চলতে হয়। যারা সর্ব্বদা জঙ্গলে বেড়াতে অভ্যস্ত নয় তাদের আর এক মুস্কিল আছে। গভীর জঙ্গলে ঢুকে বিভিন্ন দিকে কয়েকবার ঘোরার পর ঐ রকম লোকের দিক্‌ভ্রম হয়, সে তখন সহজে বন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই দিক্‌ভ্রম

তোমার আমার হবে, কিন্তু যারা জঙ্গলের ধারে বাস করে এবং সর্ব্বদা জঙ্গলে বেড়াতে অভ্যস্ত তাদের সহজে হবে না, তাদের অপরিচিত নতুন জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও নয়। সেই জন্য গভীর বনে জানোয়ারের পদচিহ্ন অনুসরণ করার সময় আমি সর্ব্বদাই ঐ রকম একজন লোককে সঙ্গে নিতাম। সে আমার পিছনে আসত এবং হারিয়ে যাওয়া চিহ্ন আবার খুঁজে বা'র করতে সাহায্য করত।

পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে শিকার শীতকাল বা গ্রীষ্মকালে হয় না, বর্ষাকালই তার পক্ষে প্রশস্ত সময়। এর কারণ কি বলে দিতে হবে? শীত বা গ্রীষ্মকালে মাটি শুকিয়ে এত শক্ত হয়ে থাকে যে অধিকাংশ জায়গায় তার উপর জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন পড়ে না। বর্ষাকালেও যখন কয়েক দিন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে থাকে তখন ঐ রকম শিকারে সুবিধা হয় না, কারণ তখন একেবারে সদ্য নূতন পদচিহ্নের ও দু'এক দিন আগেকার পদচিহ্নের পার্থক্য অনেক সময় ভালো বুঝা যায় না, আর পদচিহ্ন একেবারে নূতন না হ'লে তা অনুসরণ ক'রে কোন লাভ নাই। এই রকম শিকারের সকলের চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে যখন কয়েকদিন ধরে একাদিক্রমে ঝড় বৃষ্টি চলেছে। ঐ রকম সময়কে ঐ দেশে চলতি কথায় বলে 'ঝড়ি'। ঝড়ির সময় জঙ্গলে ঢুকে শিকার ক'রে বেড়ান যে খুব কষ্ট-সহিষ্ণু আর দৃঢ় স্বাস্থ্যের লোকের কাজ তা বলাই বাহুল্য। শিকারে কৃতকার্য্য হ'লে তখন কিন্তু আর ও কষ্টের কথা মনে থাকে না।

শুধু যে শিকারের উত্তেজনা বা শিকারে সাফল্য এই কষ্টের লাঘব করে তা নয়। জঙ্গলের একটা মোহ আছে তাতে অনেক

সময় মনকে বড়ই আকৃষ্ট করে। তোমরা অনেকে বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় নদী দেখেছ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বিশালকায়া নদীর বর্ষণস্ফীত খরস্রোতমুখর উন্মার্গজলবাহী দিগন্তপ্রসারিত বিপুল গৈরিক-প্লাবনের বিরাট রূপ মনকে অভিভূত করে সন্দেহ নাই। সে এক বিশাল সৌন্দর্য্য। কিন্তু পাহাড়ের কোলে বনে বনে বর্ষার যে রূপ ফুটে ওঠে তাও অপরূপ। ছেলে বেলায় যখন কবিদের ঋতুবর্ণনা পড়তাম, তা একালের হোক বা সেকালের হোক, তখন ভাবতাম যে, যে সব সৌন্দর্য্য-কণার উপকরণ দিয়ে তাঁরা যে কোন ঋতুর বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, কোন একটা জায়গায় সেগুলির একত্র সমাবেশ কি সত্যই দেখতে পাওয়া যায়? তার পর পরিণত বয়সে বর্ষাকালে পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াবার সময় দেখতাম যে যা কিছুতে বর্ষার সত্যকার রূপ ফুটিয়ে তোলে তা সেখানে সব একত্র হয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এসে সজোরে আঘাত ক'রে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও সমস্ত চেতনাকে অধিকার ক'রে বসে, এবং মনকে নিস্পন্দ ক'রে দেয়। জলগর্ভ ঘনমেঘে আকাশ কালো হয়ে গেছে, সে রং পাহাড়ের গায়ে বনের কালো রংএর সঙ্গে মিশে সব একাকার ক'রে দিয়েছে। ঐ কালোর নীচে মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড ছিন্নপ্রান্ত ধূসর মেঘ পাখা বিস্তার ক'রে আকাশের এক দিক থেকে জোর হাওয়ায় ভর ক'রে এসে বনের উপর দিয়ে বৃষ্টির ধারা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বনের মধ্যে কোলাহল তুলে এক এক বার দমকা বাতাস ছুটে আসছে, তার আঘাতে গাছের মাথা অধীর ভাবে আছাড়ি বিছাড়ি ক'রে দুলে উঠছে, আর পাতায় পাতায় সঞ্চিত জলভার ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরে পড়ছে।

ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদীগুলি ফুলে উঠে কল কল শব্দে নাচতে নাচতে ফেণা তুলে ছুটেছে, তাদের রূপ-গর্ব্বের সীমা নাই। বনের অন্য সব পাখীরা নীরব, কেবল থেকে থেকে "ষড়্‌জসংবাদিনী দ্বিধাভিন্না" কেকারবে ময়ূর ডেকে উঠছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ভিতর থেকে হাতীর বৃংহিতধ্বনি আর্দ্র বাতাসে ভেসে আসছে, আর বর্ষার মেঘের মৃদুগম্ভীর গর্জ্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দের সঙ্গে ঐ সব শব্দ মিশে গিয়ে এমন এক সুরের সৃজন ক'রে তোলে, যাকে বর্ষার অন্তরের সুর বলা যেতে পারে। শিকারের অন্বেষণে চলতে চলতে ঐ সুরে তন্ময় হয়ে, মাথায় বৃষ্টির ধারা নিয়ে, বন্দুকের উপর ভর দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যাওয়ার স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিকারযোগ্য বন্যজন্তু আর কয়েকটার বিষয় সংক্ষেপতঃ ব'লে আমার কথা শেষ করব, কারণ মনে হচ্ছে যেন গল্পের বোঝা ইতিমধ্যে ভারী হয়ে উঠেছে। এই জানোয়ারগুলির সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলবার মত গল্পও আমার কাছে বড় একটা নাই, শুধু সাধারণভাবে তাদের কিছু কিছু পরিচয় দিতে চাই।

একটু আগে গয়াল বলে একটি জানোয়ারের নাম করেছি। এর আর একটা নাম হচ্ছে গওর, জানোয়ারটি গো-জাতীয়। উড়িষ্যার জঙ্গলে যত রকম জানোয়ার আছে তার মধ্যে আকারে হাতীর পরেই গয়ালের স্থান। তোমরা আমেরিকার বাইসনের কথা পড়েছ আর তার ছবিও দেখেছ। কি বিরাট দেহ তাদের, আর মাথার উপর ও ঘাড়ে লম্বা লোমে তাদের দেখতে কত সুন্দরই করেছে। গয়ালকে ভারতীয় বাইসন্ বলে। গয়ালের কিন্তু বাইসনের মতো গলায় ঘাড়ে অত বড় বড় লোম নাই। একটা পূর্ণ বয়সের গয়াল একটি গৃহপালিত বড় মহিষের চেয়েও আকারে বড় হয়। এদের শিং মহিষের শিঙের মত চ্যাপ্টা নয় বা ঘাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পিছনদিকে বিস্তৃত হয় না, গরুর শিঙের মত গোল, আর গরুর শিঙের মতোই বক্রভঙ্গীতে উর্দ্ধমুখে মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে, দেখতে ভারী সুশ্রী। মহাশক্তিমান বিপুল কালো দেহ নিয়ে এরা যখন বনের মধ্যে

চলে তখন দেখলে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়, যেমন বড় দাঁতাল বুনো হাতী দেখলে হয়। হাতীর মতোই এরা দলে থাকতে ভালোবাসে এবং হাতীর মতোই দলের পুরুষগুলোর মধ্যে কোন কোনটা "রোগ্" অর্থাৎ দলভ্রষ্ট হয়ে একক আর দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে। তবে "রোগ্" হাতীর কথা যেমন প্রায়ই শোনা যায়, "রোগ্" গয়ালের কথা অত শোনা যায় না। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমি একবার মাত্র রোগ্ গয়ালের কথা শুনেছিলাম। আমার এলাকার বাহিরে বনের ভিতর দিয়ে পাহাড় অতিক্রম ক'রে একটা বড় রাস্তা গিয়েছিল, সেই রাস্তার উপরে ঐ জানোয়ারটির উপদ্রব হয়। গয়ালটা যখন রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে চরত, তখন ঐ রাস্তা দিয়ে লোক যেতে দেখলেই তাকে তেড়ে এসে আক্রমণ ক'রে মেরে ফেলত। এই রকম তিন চারটা মানুষ মারার পর ঐ রাস্তায় লোকের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, লোকে বহুদূর ঘুরে ঐ পাহাড় অতিক্রম করতে লাগল। চার পাঁচ মাস পরে আবার যখন ঐ রাস্তায় লোকের যাতায়াত সুরু হ'ল তখন কিন্তু আর ঐ গয়ালের উপদ্রবের কথা শোনা গেল না। তার কি হ'ল, কেন সে অন্তর্ধান করল তা জানতে পারিনি। কোন শিকারীর হাতে তার শেষ হওয়ার কথা শুনিনি, আর সেরূপ হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সে কথা আমার কাণে আসত।

ময়ূরভঞ্জের সমতল ভূমিতে যে বন আছে তাতে গয়াল নাই বললেই হয়। পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতরে গভীর বনে এই জন্তুটির দেখা পাওয়া যায়। সেখানেও এদের সংখ্যা আগেকার চেয়ে কমে এসেছে। এটা কেন ঘটেছে তা বলা কঠিন। গয়াল

শিকার বহুদিন থেকে নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে তবুও পর্ব্বতের মধ্যে বড় বেড় শিকারেও আজকাল গয়াল খুব কম দেখা যায়।

ইতিপূর্ব্বে হাতীর কথা কিছু বলেছি, এখন তার সম্বন্ধে আরো দু'একটা কথা বলতে চাই। আগেই বলেছি ময়ূরভঞ্জের বনে হাতীর সংখ্যা খুব বেশী। সেখানে মাঝে মাঝে ষ্টেট্ থেকে হাতী ধরার বন্দোবস্ত করা হয়। যে উপায় অবলম্বন ক'রে হাতী ধরা হয় তাকে "খেদা" বলে। সাধারণতঃ শীতকালে এই উপায়ে হাতী ধরা হয়। "খেদা" ব্যাপারটা কি তা সংক্ষেপতঃ বলছি।

প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে খেদার স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়। অভিজ্ঞ লোকেরাই এ কাজ ক'রে থাকে, কারণ কাজটি নিতান্ত সহজ নয়। যেখানে সেখানে খেদা করা চলে না, অনেক দিকে নজর রেখে স্থান ঠিক করতে হয়। পাহাড়ের বা বনের যে দিকে অধিকাংশ সময়ে হাতীর দলগুলিকে চরতে দেখা যায় সেই দিকে বা তার কাছাকাছি বনের মধ্যে খেদার স্থান হওয়া চাই। ঐ স্থান আবার লোকালয় থেকে খুব বেশী দূরে হ'লে নানা বিষয়ে অসুবিধা হয়। খেদার স্থানের সন্নিকটে এরূপ জলাশয় বা বহতা নালা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন যেখানে হাতীরা সহজে জল খেতে পারে, কারণ এ না হ'লে হাতীর দলকে দূর থেকে খেদার কাছে আনা যাবে না বা তার কাছে রাখতে পারা যাবে না। তোমরা জান না বোধ হয় যে হাতীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে জলপান করা অভ্যাস, আর ঐ সময়ে জল না পেলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ প্রাতে আর সন্ধ্যার সময় এরা জলপান করে। তোমাদের মধ্যে যারা মূল সংস্কৃত রামায়ণে "দশরথ-

বিলাপ” বা তার অনুবাদ পড়েছ তাদের মনে থাকবে মহারাজ দশরথ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বড় দুঃখে তাঁর যৌবনের অপকর্ম্ম সিন্ধুমুনির হত্যার করুণ কাহিনী রামজননী মহারাণী কৌশল্যাকে বর্ণনা করতে করতে বলছেন কেমন ক’রে তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন নদীতীরে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, কখন হাতী জলপান করতে নদীতে আসবে আর তিনি শব্দভেদী বাণের দ্বারা তাকে শিকার করবেন।

স্থান ঠিক করা হ’লে সেখানে খানিকটা জায়গা একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এই ঘেরা জায়গাটাকে “খেদা” বলে। ঘেরা জায়গা সচরাচর চতুষ্কোণ হয় এবং তার আয়তন এত বড় হওয়া দরকার যার ভিতরে পনের কুড়িটা হাতী স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে। এই বেড়া যেমন তেমন বেড়া নয়, হাতীর দলকে তার মধ্যে আটক ক’রে রাখবার মতো বেড়া। মোটা মোটা গাছ কেটে তার গুঁড়ি গুলো ঘেঁষাঘেঁষি ক’রে মাটিতে গভীর ভাবে পুতে দিয়ে এত শক্ত ক’রে বেড়া তৈরী করা হয় যাতে বনের প্রকাণ্ড হাতী তাকে প্রাণপণে ঠেলেও না ভাঙ্গতে পারে। আরও অনেক মোটা মোটা গাছ কেটে এনে গাছের গুঁড়িগুলো বেড়ার বাহিরে গাদা ক’রে শুইয়ে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাতীর দল ভিতর থেকে ঠেলা দিয়ে বেড়াটাকে একটুও না টলাতে পারে। বেড়ার উচ্চতা অন্ততঃ পনের ষোল ফুট হওয়া দরকার।

বেড়ার দুইদিকে দুইটা ফাঁক থাকে যার ভিতর দিয়ে একটা মাত্র বড় হাতী সহজে চলে যেতে পারে। ফাঁক দুইটার উপরে ঐ রকমই শক্ত কাঠের অতি দৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত ফ্রেমের দরজা

দড়া দিয়ে ঝোলান থাকে, যেটাকে ইচ্ছা করলেই ফেলে দিয়ে ফাঁক বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়। ফাঁকের উপরেই মানুষ লুকিয়ে বসে থাকবার জায়গা ক'রে রাখা হয়, দরকার হ'লে ঐ লোক দড়া কেটে ঝোলান দরজা ফেলে দিয়ে ফাঁক বন্ধ ক'রে দেবে। তুইটা ফাঁকের একটার ঠিক মুখে, বেড়ার বাহিরে, আর একটা
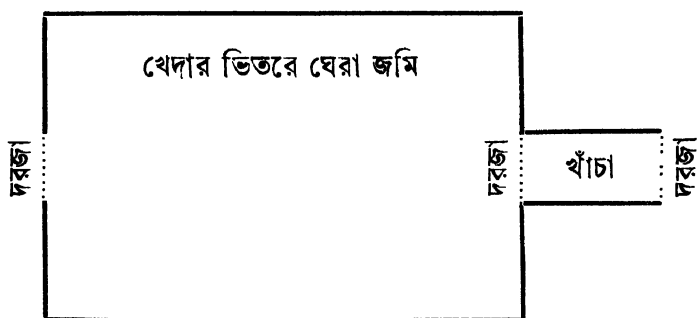
ছোট চতুষ্কোণ জায়গা ঠিক ঐ রকম শক্ত ক'রে বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়। এই ছোট জায়গাটা ফাঁকের মতোই চওড়া আর যাতে একটি মাত্র বড় হাতী দাঁড়াতে পারে ততখানি লম্বা। এটাকে একটিমাত্র হাতীকে আটক ক'রে রাখবার মত একটা খাঁচা বলা যেতে পারে। এর ভিতর দাঁড়ালে হাতী ঘুরতে ফিরতে পারবে না। খাঁচার বাহিরের মুখেও ঐ রকম ঝোলান দরজা থাকে যা ইচ্ছামত ফেলে বা তুলে দিয়ে ঐ মুখ বন্ধ ক'রে বা খুলে দেওয়া যায়। মোট কথা খাঁচাটা এমনভাবে করা হয় যাতে তার ভিতরের দিকের অর্থাৎ আসল খেদার দিকের দরজা খুলে রেখে খেদার ভিতরে আবদ্ধ যে কোন হাতীকে তাড়া দিলে হাতী ঐ

দরজা দিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে সব গাছের গুঁড়ি দিয়ে খাঁচার বেড়া তৈরী করা হয় সেগুলো অল্প একটু ফাঁক ফাঁক ক'রে পোতা হয় যাতে ঐ ফাঁকগুলোর মধ্য দিয়ে একজন মানুষ সহজে খাঁচার ভিতরে হাত চালিয়ে দিতে পারে।

খেদা প্রস্তুত করা হ'লে কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে পাঠান হয় হাতীর দলকে খেদার কাছে আনবার জন্য। এই কাজের জন্য বেশী লোকের দরকার হয় না, পনের কুড়ি জন হ'লেই হয়, তবে লোকগুলি এই কাজে দক্ষ হওয়া চাই। তারা দূর থেকে বুনো হাতীর দলকে সকৌশলে ধীরে ধীরে চালিত ক'রে খেদার কাছে নিয়ে আসে। এই লোকগুলি কখনও হাতীর দলকে তাড়া দেয় না, বেশী গোলমাল না ক'রে কেবল দূব থেকে বাঁশী, মাদল ইত্যাদি বাজিয়ে বা অনুরূপ শব্দের দ্বারা জানিয়ে দেয় যে ঐদিকে মানুষ আছে, আর তাতে হাতীর দল ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করে। এইসব লোকদের অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা যথেষ্ট, তারা বেশ বুঝতে পারে কোন্ দিক থেকে কি ভাবে চালিত করলে হাতীর দল খেদার কাছে যাবে। তারা এক বার কোন দলের দেখা পেলে সেই দল সহজে তাদের দৃষ্টির বাহিরে যেতে পারে না। দলে কি রকমের কতগুলি হাতী আছে তার নাড়ী নক্ষত্র তখন তারা বলে দেবে। হাতীর দলকে এইরূপে চালিত ক'রে আনতে সময় লাগে, এক দিনের মধ্যে হয় না। অতিশয় সতর্কতা আর সহিষ্ণুতার দরকার।

এই লোকগুলি যখন এই কাজে নিযুক্ত থাকে তখন খেদার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি থেকে প্রায় দেড় দুই হাজার লোক জঙ্গলের বাহিরে সংগ্রহ করা হয়। হাতীর দল খেদার নিকটে চালিত

হয়ে আসামাত্র চালকেরা সংবাদ দেয়। তখন ঐ সব গ্রামবাসীরা হাতীর দলকে ঘিরে ফে'লে একটা প্রকাণ্ড বৃত্তাকার বেড় ক'রে জঙ্গলের ভিতর বসে যায়। এই বেড়ও প্রথমটায় যথাসম্ভব নিঃশব্দে সম্পন্ন করা হয়, যাতের হাতীর দল ত্রস্ত হয়ে না ওঠে। বেড়ের আয়তন এত বিস্তীর্ণ হওয়ার দরকার যাতে বেড়ের মানুষের সঙ্গে হাতীর দলের সর্ব্বদা দেখাদেখি না হয়। ঐরূপ একটা বেড়ের পরিধি সাধারণতঃ তিন চার মাইলের কম হয় না, অর্থাৎ তার ব্যাস অনেক সময় এক মাইলেরও বেশী হয়। খেদা এবং হাতীদের জল পান করবার স্থান যে বেড়ের মধ্যে রাখতে হয় তা সহজেই বুঝতে পার। মনে রাখবে বেড় আর খেদার বেড়া এক জিনিষ নয়, বেড় মানে জঙ্গল ঘেরাও করা মানুষের লাইন। বেড়ের লোকেরা জঙ্গল থেকে খুঁটি আর পাতা কেটে এনে তাদের লাইনের উপর ছোট ছোট ঘর বানিয়ে তাতে আশ্রয় নেয় আর দিনের পর দিন ঐ ঘরে বাস করতে থাকে। নিকটের গ্রামগুলি থেকে ঐ সব লোক সংগ্রহ করা হয় বলে একই দল লোককে বেশীদিন ধরে লাইনের উপরে থাকতে হয় না, পাঁচ সাত দিন অন্তর লোক বদলী করা হয়। তারা মাদল, বাঁশী, কেন্দ্রা (বেহালার মত যন্ত্র) ইত্যাদি বাজিয়ে, গান গেয়ে গল্প ক'রে সময় কাটিয়ে দেয়। রাত্রিতে পাতার ঘরগুলোর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় আর পালা ক'রে লোক জেগে থাকে, তাতে রাত্রিতেও হাতীর দল লাইনের কাছে আসতে সাহস করে না। খেদা সাধারণতঃ শীতকালে করা হয় ব'লে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না, আর সেইজন্য বেড়ের লোকদেরও অসুবিধা হয় না।

বেড় একবার বসে গেলে হাতীর দল ঘেরাও করা জঙ্গলের ভিতর যে সব গাছপালা তাদের খাদ্য তাই খেয়ে চরে বেড়ায়, মানুষের লাইন ভেদ ক'রে যেতে চেষ্টা করে না। বেড়ের লাইনের লোকেরাও তাদের তাড়া দেয় না, কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে কয়েকদিন লাইন রক্ষা ক'রে বসে থাকে। তারপর লাইন ক্রমশঃ ছোট ক'রে আনা হয়। লাইনের লোকেরা একটু একটু ক'রে তাদের লাইন এগিয়ে নিয়ে যায়, তাতে হাতীর দল তাড়া পায় না, কিন্তু ঘেরাও করা বনের আয়তন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। ইতিমধ্যে হাতীগুলি বেড়ের ভিতরে তাদের স্বাভাবিক বনজাত খাদ্যের ভাণ্ডার খেতে খেতে প্রায় শেষ ক'রে আনে এবং কিছু দিনের মধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে তাদের খাদ্যাভাব ঘটে। ঐ সময় খেদার একটি দরজা (খাঁচার বিপরীত দিকের দরজা) খুলে রেখে গোপন ভাবে খেদার বাহিরে আশে পাশে প্রচুর হাতীর খাদ্য,—যেমন ধানশুদ্ধ খড়ের স্তূপ, কলাগাছ ইত্যাদি রেখে দেওয়া হয় এবং খেদার বেড়ার মধ্যেও ঐরূপ খাদ্য রাখা হয়।

এখন তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেন হাতীর দল খেদার বেড়ার ভিতরে আসতে বাধ্য হয়। তাদের খাদ্যাভাব ঘটলে তারা বাইরে ফেলে রাখা খাবার খেতে খেতে ক্রমশঃ সাহস সঞ্চয় ক'রে বেড়ার ভিতরে রাখা খাবারের লোভে সেখানে ঢুকে পড়ে। সমস্ত দলটা প্রায়ই একবারে ঢোকে না। প্রথমে দু'একটা বেড়ার ভেতর ঢুকে খাবার খেয়ে পুনরায় বেরিয়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় ঢুকতে আরম্ভ করে। দ্বাররক্ষক যখন তার গুপ্তস্থান থেকে দেখে যে হাতীগুলিকে আটক করবার

মতো উপযুক্ত সংখ্যায় বেড়ার মধ্যে ঢুকেছে তখন সে ঝোলান দরজা ফেলে দিয়ে খোলা মুখটা বন্ধ ক'রে দেয়। তার পরেই অন্যান্য লোক প্রকাশ্যভাবে বেড়ার কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং হাতীগুলোকে বশ করবার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম কয়েকদিন তাদের বেশী উত্ত্যক্ত করা হয় না। ঐ সময়ে অবরুদ্ধ বড় হাতীগুলো,—বিশেষতঃ দাঁতাল পুরুষ হাতীগুলো—প্রাণপণে চেষ্টা করে বেড়া ভেঙ্গে বেরুবার জন্য। বেড়ার এবং দরজার ফ্রেম খুব মজবুত ক'রে তৈরী করা হ'লেও কখন কখন বড় দাঁতাল হাতীর আক্রমণের জোর এত বেশী হয় যে বেড়া, বিশেষতঃ ফ্রেমের দরজা, রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঐ সময় দরজার বাহির থেকে ফ্রেমের ভিতর দিয়ে বল্লমের বা জ্বলন্ত কাঠের খোঁচা দিয়ে, অথবা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ক'রে ঐ হাতীকে ফেরাবার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলে সময়ে সময়ে হাতীও জখম হয়ে পড়ে। কখন্ কখন এক একটা বড় পুরুষ হাতী আহার পরিত্যাগ করে, আর তা হ'লে তাকে বাঁচান কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বেড়ার ভিতরে রাখা হাতীর খাবারও নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তাদের অনাহার ঘটতে থাকে। ফলে অবরুদ্ধ হাতীগুলো কিছু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন বড় পুরুষ হাতীগুলোকে আগে বেড়ার বাহিরে আনবার চেষ্টা করা হয়। বেড়ার যে দরজার মুখে খাঁচা তৈরী করা হয়েছে সেই দরজা খুলে দিয়ে ঐ রকম একটা হাতীকে বেড়ার উপর থেকে ভয় দেখিয়ে, খোঁচা দিয়ে, তাড়িয়ে খাঁচার মধ্যে ভরা হয়। যে হাতী বার বার বেড়ার দরজা আক্রমণ করেছে সে দরজা খোলা পেলে আপনিই ঐ খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে। হাতী খাঁচার

মধ্যে ঢুকলেই ঐ দরজা আবার ফেলে দিয়ে খেদা থেকে খাঁচার ভিতর যাতায়াতের পথ রুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় হাতী আর ঘুরতে ফিরতে পারে না। তখন ঐ কাজে শিক্ষিত দুই জন লোক হাতীর পিছন দিকে খাঁচার দুই পাশে মোটা আর খুব দৃঢ় দড়ি নিয়ে দাঁড়ায় এবং বেড়ার ফাঁক গুলির মধ্য দিয়ে হাত চালিয়ে হাতীর পিছনকার পা দুইটা দড়ি দিয়ে ছেঁদে বাঁধতে আরম্ভ করে। দড়ি দুই পায়ে জড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধতে বাঁধতে নীচু থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত বাঁধনটা তুলে, গিরো দিয়ে ছেড়ে দেয়। এতে বড় অল্প সময় লাগে না এবং কাজটা নিতান্ত নিরাপদ নয়, কারণ খাঁচাতে আবদ্ধ হাতী ঘুরতে ফিরতে না পারলেও শুঁড় দিয়ে ঐ লোকদের হাত ধরতে চেষ্টা করে।

পা বাঁধা হয়ে গেলে হাতীর ঘাড় বেঁধে ফেলা হয়। একটা খুব মোটা দড়াতে বড় একটা ফাঁস ক'রে খাঁচার উপর থেকে সেই ফাঁসটা হাতীর মাথা লক্ষ্য ক'রে নামিয়ে দেওয়া হয়। মাথার উপরে ফাঁসটা নামলে হাতী শুঁড় দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, আর এই করতে গিয়ে শুঁড়টা ফাঁসের মধ্যে চালিয়ে দেয়। তখন সেই দড়াকে উপর থেকে টানলেই ফাঁসটা উঠে হাতীর ঘাড়ের ও গলার চারদিকে বসে যায়। এ আর বলে দিতে হবে না যে এই টানটা খুব জোরে দিতে হয়, কারণ এ পাখী-ধরা ফাঁস নয়। গলায় ফাঁস পড়ে গেলে খাঁচার বাহিরের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ার অপর মুখটা দুইটা বড় পোষা পুরুষ হাতীর শরীরে বেঁধে দেওয়া হয়। বলতে ভুলেছি যে আমি যে প্রকার খেদার বর্ণনা করছি তাতে কয়েকটা বলবান পোষা হস্তী ও হস্তিনীর নিতান্ত দরকার,

এবং তারা খেদার কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকা চাই। পোষা হাতীর সঙ্গে খাঁচার হাতী বেঁধে দেওয়া হ'লে তখন সেই হাতীটাকে খাঁচা থেকে ব'ার ক'রে নেবার সময় আসে। তাকে পিছন থেকে বল্লমের খোঁচা দিয়ে তাড়না করা হয় এবং তার সঙ্গে বাঁধা পোষা বড় পুরুষ হাতী তুইটিও তাকে টানতে থাকে, আর তার তুই পাশে তুইটা হস্তিনীকে তার গা ঘেঁষে চালিত করা হয়। সে তখন ধীরে ধীরে চ'লে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে। তাকে ঐ পা-বাঁধা অবস্থায় চালিয়ে একটা বড় গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে গলার দড়াটা বেঁধে দেওয়া হয় এবং তার পিছনের পা তুইটাকেও অপর তুইটি গাছের সঙ্গে লম্বা দড়া দিয়ে বাঁধা হয়। বাঁধার পর যখন পোষা হাতীগুলোকে মাহুতেরা সরিয়ে নিয়ে যায় তখন নতুন-ধরা হাতীটি নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করবার জন্য যে ভয়ানক চেষ্টা করে তা দেখলে খুব নির্দ্দয় লোকেরও মনে কষ্ট না হয়ে যায় না। ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করতে করতে সে বার বার মাটিতে তার অত বড় প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে, মনে হয় যেন তার বিরাট দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা এইরূপ করার পর যখন দেখে যে তার সমস্ত চেষ্টাই নিস্ফল, তখন সে কতকটা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে কোন কোন হাতী পান ও আহার একেবারে ত্যাগ করে আর তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে, মনে হয় যেন আত্মহত্যা করল। আমি একবার এই রকম একটি বৃহদ্দন্ত মহাকায় হাতীর মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম ব্যাপারটা কি করুণ, একটা ঢলঢল নিটোল বৃহৎ প্রাণলীলার কি নিদারুণ অবসান।

এই গেল বড় দাঁতাল হাতীগুলিকে আয়ত্ত করার বিবরণ। খেদার মধ্যে যে সব হস্তিনী বা অল্প বয়সের হাতী আবদ্ধ হয় সেগুলোকে আয়ত্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। দাঁতাল বুনো হাতীগুলোকে এক এক ক'রে খেদা থেকে ব'ার ক'রে নিয়ে যাবার পর কয়েকটি পোষা বড় দাঁতাল হাতী মাহুতের দ্বারা চালিত হয়ে খেদার বেড়ার মধ্যে ঢোকে। ঐ হাতীগুলোকে দেখেই আবদ্ধ হস্তিনী ও ছোট হাতীগুলি ভয় পায়, এবং জড়সড় ভাবে খাঁচার একদিকে দলবদ্ধ হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। পোষা দাঁতাল হাতীগুলির পিছনে কয়েক জন দক্ষ লোক দড়া নিয়ে খেদার মধ্যে প্রবেশ ক'রে একে একে বুনো হাতীগুলোর পিছনের পা দুইটাকে ছাঁদনের প্রথায় বেঁধে ফেলে। ঐ সময়ে পোষা হাতীর মাহুতেরা অতিশয় সতর্ক থাকে যাতে কোন বুনো হাতী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কোন বন্ধনকারী মানুষকে আক্রমণ না করে, এবং ঐ রূপ কোন চেষ্টা দেখলেই মাহুত তার নিজের হাতীকে আদেশ করে আক্রমণকারী হাতীকে শাস্তি দিতে, আর হাতীও আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দন্তপ্রহার ক'রে শাস্তি দেয়। পিছনের পা বাঁধা হয়ে গেলে বন্য হস্তীগুলির ঘাড়ও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মোটা দড়া দিয়ে বাঁধা হয়, আর তার পর পোষা হাতীগুলির সাহায্যে তাদেরও এক এক ক'রে বাহির ক'রে নিয়ে বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়।

খেদা জিনিষটা কি তার কতকটা আভাস দিলাম। এর আরও আনুষঙ্গিক ব্যাপার অনেক আছে, সে সব বলতে গেলে বর্ণনা অনেক বড় হয়ে পড়বে। ধৃত হওয়ার পর হাতীগুলিকে কি ক'রে বশ করা হয় আর আদেশ পালন করতে শেখান হয়

সে সব কথাও শিকারের গল্পের সঙ্গে বলা চলে না। সম্পূর্ণ বশ করতে কয়েক মাস সময় লাগে এবং তার প্রক্রিয়াও অনেক। অনেকদিন পর্য্যন্ত হাতীগুলির মেজাজ খারাপ থাকে। আমি একবার দেখেছিলাম একটি গর্ভিণী হস্তিনী ধরা পড়বার প্রায় এক মাস পরে একটি বাচ্ছা প্রসব করল, কিন্তু ঐ বাচ্ছাকে সে কাছে আসতে দিল না, বা তাকে স্তন্যপান করাল না। বাচ্ছা কাছে আসলেই তাকে শুঁড় দিয়ে মারতে চেষ্টা করত। বাচ্ছাটিকে গরুর দুধ খাইয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু বাঁচল না।

এইখানে "রোগ্" বা গুণ্ডা হাতীর সম্বন্ধে আর একটা বিষয় উল্লেখ ক'রে হাতীর কথা শেষ করব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি যে শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা রোগ্ বলে ঘোষিত হ'লেই তবে ঐ হাতীকে মারা যায়, নতুবা হাতী মারা অপরাধের মধ্যে গণ্য। এখন জিজ্ঞাসা করতে পার যে শিকারী কি ক'রে ঘোষিত রোগ্‌টাকে চিনতে পারবে? এর উত্তর হচ্ছে যে ঐ ঘোষণার মধ্যে রোগ্ হাতীটার বর্ণনা নিশ্চয় দেওয়া থাকে। রোগ্ হলেই সে হাতীকে নিশ্চয় অনেক লোক দেখেছে, কারণ মানুষের উপর অত্যাচার না করলে রোগ্ বলে ঘোষিত হয় না। সচরাচর কোন্ জঙ্গলে সে থাকে, তার শরীরের বিশেষ চিহ্ন কিছু আছে কি না, তার দাঁত-গুলোর দৈর্ঘ্য আন্দাজ কতটা, তার উচ্চতা—এ সব বর্ণনা ঘোষণার মধ্যে থাকে। হাতীর উচ্চতা না মেপেও সর্ব্বদাই প্রায় ঠিক বলে দেওয়া যায়। কোন হাতী নরম মাটির বা বালির উপর দিয়ে চলে গেলে তার সম্মুখের পায়ের যে সুস্পষ্ট ছাপ মাটিতে পড়ে সেই ছাপ থেকে হাতীর উচ্চতা বলা যেতে পারে। হাতীর উচ্চতা ঐ ছাপের পরিধির দ্বিগুণ হয়ে থাকে,—অর্থাৎ পরিধির

মাপ যদি ৪ ফুট হয় তা হ'লে হাতীর উচ্চতা ৮ ফুট হবে। উচ্চতার এইরূপ গণনায় ২।১ ইঞ্চির বেশী ভুল হয় না। এই উপায়েই 'রোগ্' হাতীর উচ্চতা স্থির করা হয় এবং তা ঘোষণাতে উল্লেখ করা হয়। শিকারী অবশ্য রোগ্ হাতীকে দাঁড় করিয়ে মেপে ঘোষণার সঙ্গে উচ্চতা মিলিয়ে নিয়ে গুলী করে না, কিন্তু সে যে হাতীকে শিকার করল তার উচ্চতা যদি ঘোষণাতে বর্ণিত উচ্চতা থেকে বিভিন্ন হয় তা হ'লে জানতে হবে যে শিকারী সেই রোগ্‌কে মারতে পারেনি।

হাতীর কথা এইখানে শেষ ক'রে আর হু'একটা জঙ্গলের জানোয়ারের কথা বলছি। এদের সঙ্গেও আমার পরিচয় নিতান্ত কম হয় নি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বন্য বরাহ। এই জন্তুটি বাংলার সমতল ভূমিতে সাধারণতঃ জলার ধারে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। বর্ষাকালে যখন ঐ সব জায়গা জলে ডুবে যায়, তখন এরা গ্রামের ভিতরে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীদের ত্রস্ত ক'রে তোলে, এবং এগুলোকে মারবার জন্য গ্রামের বন্দুক ও বল্লমধারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ জেগে ওঠে। আমার শিকার-জীবন যে দেশে কেটেছে সেখানে সমতল ভূমির জঙ্গলে এদের খুব কমই দেখেছি, কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে গভীর বনে শিকার করবার সময় আমি বহুবার বুনো শূয়োরের পাল দেখেছি এবং তার মধ্যে কখন কখন খুব বৃহদাকার দাঁতাল পুরুষ শূয়োর বেছে বেছে শীকার করেছি। এই রকম একটা জানোয়ার শীকারে পড়লে বিটার্‌দের যে কি আনন্দ তা বলবার নয়, কারণ তারা শূয়োরের মাংস অন্য সব মাংসের চেয়ে বেশী পছন্দ করে, এবং ভদ্রলোক শিকারীটি যে এই জন্তুটাকে তাদের নিঃশেষে দিয়ে দেবে সে বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ।

তবে এমনও কখন হয়েছে যে আমার চাকরেরা তাদের কাছ থেকে কিছু মাংস চেয়ে নিয়ে রেঁধে খেয়েছে এবং আমাকেও খাইয়েছে, আর আমি খেয়ে দেখেছি মন্দ লাগে না। তোমরা কেউ কেউ হয় ত এ শুনে "ছি ছি" বলে উঠছ। কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলে দিই। সংস্কৃত রামায়ণে দেখবে যে সীতা-দেবী মহারাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন বনে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শ্বশুরের শ্রাদ্ধ করেছিলেন তখন তিনি অন্যান্য মাংসের সঙ্গে এই মাংসও উৎসর্গ করেছিলেন। বন্য বরাহের মাংস হিন্দুদের পক্ষে অপবিত্র নয়। এখনও পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রিয়েরা এই মাংসকে অতি পবিত্র মনে করেন, এমন কি তাঁরা এই মাংস শুকিয়ে ঘরে যত্ন ক'রে রেখে দেন এবং তাঁদের সামাজিক উৎসবে হিন্দুত্বের চিহ্ন স্বরূপ ঐ শুক্‌নো মাংস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করেন। এটাও মনে রাখবার কথা যে বন্য বরাহ গৃহপালিত শূয়োরের মতো অপবিত্র কুৎসিত খাদ্য খায় না, খেতে পায় না। আর 'শূয়োর' না ব'লে, "বন্যবরাহ" নামটা দিলে মন থেকে অনেকটা অপবিত্রতার ধারণা কেটে যায় না কি? তোমরাই বল।

শূয়োরের স্বভাবের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথা প্রচলিত আছে। তা অনেকটা সত্য। এরা অত্যন্ত জেদী জানোয়ার ব'লে প্রসিদ্ধ। কথায় বলে 'শূয়োরের গোঁ'। এই হচ্ছে একমাত্র জানোয়ার যে না কি বাঘ যেখানে জলপান করে সেইখানে জলপান করবার জন্য আস্‌তে সাহস করে, এই কথাটা আমি যেন কোন খানে একবার পড়েছিলাম। জঙ্গলে বেড়াবার সময় দেখেছি কথাটা মিথ্যা নয়। বনে এমন জলাধার

একাধিক বার দেখেছি যেখানে জলের ধারে একই জায়গায় বাঘের পায়ের চিহ্নের ঠিক পাশে শূয়োরের পায়ের চিহ্ন রয়েছে। অবশ্য, তার মানে এ নয় যে বাঘ আর শূয়োর একই সময়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জল খেয়েছিল। ও থেকে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে যেখানে বাঘ জল পানের জন্য আসা যাওয়া করে, শূয়োরও সেখানে জল পান করবার জন্য যেতে ইতস্ততঃ করে না, যা শূয়োরের মতো অন্য জানোয়ার করতে সাহস করবে না।

জঙ্গলের আর একটি বিস্ময়কর জানোয়ার হচ্ছে বন্যকুকুর। উড়িষ্যাতে এই জন্তুর নাম "করগড়ি"। আকারে এগুলো বাংলা দেশের গ্রাম্য কুকুরের মতো. আর গায়ের রং লালচে হলদে, যা অধিকাংশ গ্রাম্য কুকুরের দেখা যায়। এই জন্তু দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলে বেড়ায়, এবং এদের একটি দল জঙ্গলের যে অংশে বেশী দিন বাস করে সে অংশে শিকারী মানুষ প্রায়ই শিকারে কিছু পায় না, কারণ অন্য জন্তুকে, বিশেষতঃ হরিণকে, দল বেঁধে নাছোড়বান্দা হয়ে অনুসরণ ক'রে হত্যা ক'রে খাওয়াই এই কুকুরগুলোর স্বভাব; কতকটা (Russian wolf) রাশিয়ান্ উল্‌ফের মতো। দলে ভারী থাকলে এরা বৃহৎ ও বলশালী সম্বর হরিণকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। আমি ৩।৪টা থেকে ৮।১০টার দল দেখেছি। একটা আশ্বাসের কথা এই যে এরা কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না, অন্ততঃ আমি কখন শুনিনি যে মানুষকে আক্রমণ করেছে। আমি একবার মাত্র একটাকে গুলী করেছিলাম। পেটে গুলী লেগে অন্ত্র বেরিয়ে পড়ল, আর সে সেই অন্ত্রকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে

ছিঁড়তে প্রাণত্যাগ করল। তার সঙ্গী অপর কুকুরগুলো পালিয়ে গেল। এরা মানুষের কাছে আসতে সাহস করে না বটে, কিন্তু অন্য যে কোন বন্য জন্তুর সম্বন্ধে এদের সাহসের অন্ত নাই। বাঘের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিতেও এরা প্রস্তুত, এতই দুঃসাহসী। বাঘ হরিণ শিকার ক'রে খাচ্ছে এমন সময় এই কুকুর দলবদ্ধ হয়ে যদি সেখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে ঐ বাঘকে আক্রমণ ক'রে শিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে এবং প্রায়ই সফল হবে, যদিও যুদ্ধে এদের কয়েকটা বাঘের হাতে প্রাণ হারাবে। বাঘ শেষ পর্য্যন্ত এদের সমবেত আক্রমণের জ্বালায় অস্থির হয়ে শিকার ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে। এই জন্য ঐ সব স্থানের লোকেরা বলে যে যেখানে করগড়ির দল কিছু দিন থাকে সেখান থেকে বাঘ পর্য্যন্ত অন্য বনে চলে যায়। বোধ হয় কথাটা মিথ্যা নয়। এরা যে মাইলের পর মাইল হরিণকে অনুসরণ ক'রে হত্যা করে এসম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে।

এইবার ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলের আর একটি অতি ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিষয়ে বলে আমার শিকারের কথা শেষ করব। এই জীবটির নাম অহিরাজ বা শঙ্খচূড়, ইংরাজী নাম King Cobra বা Snake-eating Cobra—অর্থাৎ সর্পভুক্ গোক্ষুর। সুন্দরবনে এবং ভারতবর্ষের অন্য অনেক স্থানে এই সাপ দেখা যায়। পৃথিবীর ভয়ানক বিষধর সাপের মধ্যে অহিরাজই আকারে সব চেয়ে বড় আর বলবান। একটা পূর্ণবয়স্ক অহিরাজ লম্বায় ১১।১২ ফুট পর্য্যন্ত হয়। ছোট সাপ এদের একটি প্রধান খাদ্য সেই জন্যই নাম হয়েছে সর্পভুক্। বনে এর স্বাধীন অবস্থায় আমার

বাঘের কাছ থেকে শিকার কেড়ে নেবার জন্য বন্য কুকুরদের মন্ত্রণা (২৫৪ পৃষ্ঠা)।

সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, আর তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই, কারণ আমি স্বীকার করছি যে সশস্ত্র হয়েও এই ভীষণ জীবটির সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে অন্য যে কোন বন্যজন্তুর সম্মুখীন হওয়া নিরাপদ মনে করি। বনে এই সাপের সঙ্গে দেখা না হ'লেও এদের কোন কোন আচরণ আমার বন-ভ্রমণের সঙ্গী ঐ দেশের লোকেরা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছে এবং বহুবার ঐ দেশের সাপুড়েদের কাছে এই সাপ দেখেছি। তাদের কাছে আমি ৯।১০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা সাপ দেখেছি এবং তারা আমাকে বলেছে যে এই জাতের সব চেয়ে বড় সাপগুলিকে তারা প্রায়ই ধরতে পারে না। কেন পারে না সে কথা পরে বলছি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা এই সাপ দেখতে পাবে।

এই সাপ ক্রুদ্ধ হ'লে গোক্ষুর বা গোখ্‌রো সাপের মতোই চক্র বা ফণা বিস্তার ক'রে দাঁড়ায়। একটি সতেজ পূর্ণবয়স্ক সাপের ফণা ঐ অবস্থায় মাটি থেকে প্রায় ৩২ ফুট উঁচুতে থাকে, অর্থাৎ একটি জোয়ান মানুষ বসে থাকলে তার মাথা ছাড়িয়ে অনেকটা উঁচুতে ওঠে। নতুন-ধরা সাপকে খেলাতে দেখেছি বলে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জেলের (Jail) কয়েক জন কয়েদী প্রত্যহ ওয়ার্ডারের সঙ্গে আমার বাগানে কাজ করতে আসত, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সাপুড়ে ছিল। বাড়ীর কর্ত্রীর সদয় ব্যবহারে সে বোধ হয় কিছু মুগ্ধ হয়েছিল। সে জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ী যাবার সময় তাঁকে বলে গিয়েছিল,—"মা, আমি তোমাকে এমন সাপ এনে দেখাব, যা তুমি দেখে তারিফ করবে।" সেই বৃদ্ধই মাস কয়েক পরে ৯২ ফুট লম্বা নতুন-ধরা এক অহিরাজ এনে আমার বাসায় দেখিয়েছিল। বিষদাঁত ভাঙ্গা

সত্ত্বেও সাপটার তখনও এত তেজ যে ঐ প্রবীন সাপুড়ে তার সঙ্গীকে নিয়েও তাকে সামলাতে পারছিল না এবং সাপ তার বিশাল ফণা উদ্যত ক'রে তাকে মাঝে মাঝে সগর্জ্জনে ও সলম্ফে এমন বিদ্যুতের মতো ছোবল মারছিল যে লোকটি যেন সজোরে ধাক্কা খেয়ে বার বার পিছিয়ে আসছিল, আর তার শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত ঝরছিল। সে খেলা আমি বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সাধারণ গোখ্‌রো সাপের আর অহিরাজের চক্রের মধ্যে বিশেষ তফাৎ আছে, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। গোখ্‌রো সাপের চক্র প্রায় চক্রই বটে—অর্থাৎ প্রায় গোলাকার (ঠোঁট বাদ দিলে), এবং ঐ চক্র কেবল সাপের মাথাটাই বিস্তৃত হয়ে হয়, তার গলার বা ঘাড়ের বেশী অংশ চক্রের মধ্যে আসে না। কিন্তু অহিরাজের বিস্তৃত ফণাকে এই হিসাবে ঠিক চক্র বলা চলে কি না সন্দেহ। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা বিস্তার করলে সে বিস্তার মাথার অনেক নীচে গলা হতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ চওড়া হয়ে মাথার কাছে সব চেয়ে বেশী প্রশস্ত হয়। ফলে এই ফণার আকার দেখতে কতকটা ছোট নৌকায় ব্যবহৃত লম্বা হাতবৈঠার কাষ্ঠফলকের মতো, নীচের দিকে সরু এবং মাথার দিকে ক্রমশঃ বেশী চওড়া হয়ে শেষ হয়েছে। শরীরের অনুপাতে গোখ্‌রো সাপের চেয়ে অহিরাজের ফণা বিস্তারে কিছু কম, কিন্তু অনুপাতের হিসাব না ধরলে অহিরাজের ফণা গোখ্‌রোর চক্রের চেয়ে অনেক বেশী চওড়া।

বনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুই চার জন সঙ্গী নিয়ে যখন মাঝে মাঝে বন-ভ্রমণে বাহির হতাম তখন গ্রীষ্মকাল হ'লে দেখতাম যে অধিকাংশ পার্ব্বত্য নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে, কেবল

নদীর পথের উপর স্থানে স্থানে গভীর পাথরের কুণ্ডের মধ্যে খানিকটা ক'রে অপরিষ্কার কালো জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুণ্ড নিতান্ত ছোট না হ'লে তার ধারে মাটির উপর প্রায়ই বন্য জন্তুর ক্ষীণ পদচিহ্ন দেখা যেত। আমার ঐ সব অনার্য্য সঙ্গীরা কোন কোন কুণ্ডের ধার থেকে বনের ভিতর চলে গেছে এরূপ সরু পথের মতো চিহ্ন আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছে যে ঐ সরু পথ হচ্ছে "সাপ ডহর", অর্থাৎ অহিরাজ সাপের ঐ কুণ্ডে যাওয়া আসার পথ। তাদের মুখে শুনতাম যে অহিরাজ সাপ সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং এক একটা দলে কখন কখন ৭।৮টা সাপ দেখা যায়। এই সাপ জল অত্যন্ত ভালোবাসে। গ্রীষ্মকালে গভীর রাত্রিতে তারা সদলে বাসগুহা ছেড়ে অনেক দূরে গিয়েও ঐ রকম কুণ্ডের জলে নেমে খানিকক্ষণ খেলা ক'রে বাসায় ফিরে যায়, এবং কাছে অপর জল না থাকলে একই কুণ্ডে একাদিক্রমে কিছু দিন ধ'রে যাওয়া আসা করতে থাকে, আর তার ফলে ঐ ডহরের সৃষ্টি হয়। ঐ বৃদ্ধ সাপুড়ে এবং অন্যান্য সাপুড়ের কাছ থেকে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলাম। বনের মধ্যে "হাতী ডহর" বা "হরিণ ডহর" দেখে আমি নিজেই বলতে পারতাম সে গুলো কি জানোয়ারের যাতায়াতের পথ। পথের বিস্তার, পথের উপর জানোয়ারের ত্যক্ত মল, পায়ের চিহ্ন, এ সমস্ত থেকে একটু অভিজ্ঞ লোকেই বুঝতে পারে কিসের ডহর। সাপ ডহরে সাপের মল মাঝে মাঝে পড়েছে দেখা যায়। বনে বেশী দিন বেড়াতে বেড়াতে বিভিন্ন প্রাণীর মলের পার্থক্য চিনতে শেখা যায়। এই সব

পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা না জন্মালে ভালো শিকারী হওয়া যায় না।

সেই বৃদ্ধ সাপুড়ের মুখে, কি ক'রে তারা এই প্রকাণ্ড যমের মতো সাপকে ধরে, তার বর্ণনা শুনেছিলাম। অন্যান্য অনেক সাপুড়ে একই কথা আমাকে বলেছিল। তা এই :—

আমি আগেই তোমাদের নিছক জঙ্গলের অধিবাসী খড়িয়াদের কথা বলেছি। এরা জঙ্গলে বেড়াবার সময় যদি উপরে বর্ণিত কোন কুণ্ডের কাছে সাপের ডহর দেখতে পায়, তা হ'লে ঐ কুণ্ডের কাছে জ্যোৎস্না রাত্রিতে কোন উঁচু গাছের উপর সন্ধ্যার পর থেকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অতি সাবধানে লুকিয়ে বসে থেকে দেখে কুণ্ডে কতগুলি আর কত বড় সাপ যাতায়াত করছে। তার পর তারা কোন গ্রামে গিয়ে তাদের পরিচিত কোন সাপুড়েকে সেই সংবাদ দেয়। এই খবর দিলে সাপুড়েরা সংবাদদাতাকে কিছু পয়সা পুরস্কার দেয়, এবং ঐ লোভেই তারা খবর দিতে আসে। সংবাদ পেয়ে ৪।৫ জন সাপুড়ে সাপ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে জঙ্গলে কুণ্ডের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথম রাত্রিতে তারাও খড়িয়াদের মতো গোপন ভাবে সাপগুলির সংখ্যা ও আকার ভালো ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করে। পরদিন সন্ধ্যার আগে তারা শক্ত দড়ির একটা বেশ বড় ফাঁস ফাঁদপাতার মতো ক'রে জলের ধারে এবং ঠিক ডহরের উপরে এমনভাবে পাতে যাতে সাপগুলো ফাঁসের ভিতর দিয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। ঐ ফাঁদের দুই মুখের লম্বা দড়ি জঙ্গলের মধ্যে বেশ খানিক দূরে চালিত ক'রে নিয়ে গিয়ে, তাদের মধ্যে দুইজন দড়ির দুই মুখ ধ'রে বসে যায়। হয় ত

বা তারা দড়ি ধ'রে অল্প উঁচু গাছে আশ্রয় নেয়। অন্য দুইজন লোক একটা লম্বা বাঁশ নিয়ে দূরে বসে থাকে। কুণ্ডের নিকটেই একটা উঁচু গাছে একজন উঠে জ্যোৎস্নার আলোতে কুণ্ড দেখতে থাকে। গভীর রাত্রিতে সাপের দল এসে জলে নেমে অনেকক্ষণ খেলা ক'রে তারপর একে একে ডহর দিয়ে ফিরে যেতে আরম্ভ করে। এই সাপের দলের নিয়ম এই যে তাদের মধ্যে যেগুলো সব চেয়ে বড় সেগুলো এসে আগে জলে নামবে এবং আগে জল থেকে উঠে ফিরে যাবে, আর ছোট সাপগুলো তাদের অনুসরণ করবে। অনুসরণেও একটার ঠিক অব্যবহিত পরে আর একটা চলে না, কিছু দূর আগুপাছু হয়ে যায়। এতেই বুঝতে পারছ যে সব চেয়ে বড় সাপগুলোকে কেন সাপুড়েরা ধরতে পারে না। বড় একটাকে ফাঁসে ধরলেই যে তার পিছনের সমস্ত দলই জানতে পারবে আর সন্ত্রস্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে, তারা সহজে সেখান থেকে যাবে না এবং তখন আবদ্ধ সাপের দিকে যাওয়া মানে নিজের মরণ ডেকে আনা। আমাদের বাংলা দেশে কৃষ্ণসর্প বা কেউটে বলে যে গোখরো জাতীয় সাপ আছে তার রাগ অতি ভয়ানক এবং মানুষ দেখলে সে সাপ দূর থেকে দৌড়ে গিয়ে আক্রমণ করে; অহিরাজের স্বভাবও না কি ঠিক সেইরূপ। নতুন ধরা সাপের খেলা দেখেও আমার তাই মনে হয়েছিল। সে যেন রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

যখন আর সব সাপ কুণ্ড ছেড়ে ডহরের পথে এগিয়ে গেছে এবং সব শেষ সাপটি ফাঁসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তখন গাছের উপরে লোকটি সঙ্কেত করা মাত্র যারা ফাঁসের দড়ি ধ'রে আছে

তারা নিমেষের মধ্যে সজোরে ফাঁস টেনে দেয় আর ফাঁস ঐ সাপের দেহে বসে যায়, সে আছাড়ি বিছাড়ি করতে থাকে। অপর সাপ-গুলো কিন্তু পিছনে না তাকিয়ে এগিয়ে চলে যায়। তার অনেকক্ষণ পরে যে দু'জন লোক বাঁশ নিয়ে দূরে বসেছিল তারা নিঃশব্দে উঠে এসে আবদ্ধ সাপের দুই দিকে দাঁড়িয়ে বাঁশ দিয়ে সাপের মাথার ঠিক নীচেই তার ঘাড়টা মাটির সঙ্গে সজোরে চেপে ধরে এবং গাছের লোকটি নেমে এসে ঐ অবস্থাতেই সাপের বিষ-দাঁত দুইটা সমূলে উৎপাটিত ক'রে দেয়। তারা তখন সাপকে ঐ অবস্থায় খানিকক্ষণ রেখে কতকটা নির্জীব ক'রে দিয়ে তবে পেড়ির (পেটিকা) মধ্যে পুরে বয়ে নিয়ে যায়। আমি এদের মুখে শুনেছি যে বিষদাঁত ভাঙ্গবার আগে যদি ঐ সাপ কোন লোককে একবার কামড়াতে পারে তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়, একটা বাঁধন দেবারও সময় পাওয়া যায় না, দাঁতগুলো এতই গভীর ভাবে মাংসের ভিতর প্রবেশ করে এবং বিষও এতই উগ্র ও পরিমাণে বেশী। এতে অবিশ্বাস করবার কিছু নাই।

আমি এইখানে শিকারের কথা শেষ করলাম। শিকারের ঘটনা এখনও অনেক বলতে পারতাম, কিন্তু আর নয়। যা বলেছি সে সব তোমাদের ভালো লেগেছে বলে যদি বুঝতে পারি তা হ'লে খুবই তৃপ্ত হব

উপসংহার

শিকারের গল্প বলতে বলতে এবং বলা শেষ ক'রেও মানুষের মনের একটা চিরদিনের প্রশ্নের কথা বার বার মনে হয়েছে, আর কথাটা বলবার ইচ্ছাও মনে জেগেছে। এর পরে আর বলার অবসর পাব না জেনে ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা শেষটায় এই খানেই বলা স্থির করলাম। গল্পগুলির পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাদের বয়স হয়েছে এবং চিন্তাশীলতা জন্মেছে, আমার ধারণা যে তাদের মনেও প্রশ্নটা মাঝে মাঝে উদয় হয়েছে, কারণ গল্পে এমন কয়েকটা ঘটনার কথা বলেছি যাতে ওটা মনে উদয় না হয়ে যায় না। আমি দেহধারী জীবের যে দৈহিক ব্যথা শিকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে তার কথা বলছি। সে মানুষ কেমন মানুষ যে শিকারের খেলা খেলতে গিয়ে জীবের যে চরম দৈহিক ব্যথা, তা দিতে কুণ্ঠিত হয় না? তার পরের প্রশ্ন,—প্রকৃতি দেবী একটি জীবের হাতে অপর জীবকে এই বেদনা দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন কেন? তারও পশ্চাতে সেই সনাতন প্রশ্ন,—এই দারুণ বেদনার উপরই জীবের জীবত্ব প্রতিষ্ঠিত কেন? শুধু ত শিকারের খেলায় নয়, পৃথিবী জুড়ে জীবনেরই জন্য যে অশ্রান্ত সংগ্রাম চলেছে তাতে এই মৃত্যুলীলারই ভীষণতা প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। মানুষের প্রতি মানুষের দারুণ হিংসা, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, যাতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানুষের রক্তে পৃথিবীর মাটি নূতন

জীবনের জন্য উর্ব্বর হয়ে উঠছে,—সেও এই জীবনসংগ্রামেরই একাংশ, জীবধর্ম্মেরই এক বিশেষ বিকাশ, মানুষ তাকে অপর যে নামেই অভিহিত করুক।

ধ্যান-চক্ষুষ্মান্ জাতিস্মর বালক সিদ্ধার্থ তাঁর পিতার গৃহে আনন্দময় হলোৎসব দেখছেন। দেখতে দেখতে তাঁর ধ্যানের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল, আনন্দ কোলাহলের অন্তরালে তিনি শুনলেন এক হাহাকারের কলরোল, যা ধরণীর মর্ম্মভেদ ক'রে উঠছে। সে কলরোল—হিংসার গর্জ্জন, মৃত্যুর আর্ত্তনাদ, যন্ত্রণাপীড়িত অসহায় জীবের সজল কাতর ধ্বনি, এই সবেরই সংমিশ্রণ। তিনি দেখলেন শ্রমস্বিন্ন কৃষক দণ্ড দ্বারা হলপশুকে তাড়না করছে, পশু উদ্গত-শ্বাস হয়ে প্রাণপণে হলাকর্ষণ করছে, ঘন শ্বাসে তার দেহের দুই পাশ আকুঞ্চিত ও বিস্ফারিত হচ্ছে। হলাগ্রে কঠিন মৃত্তিকা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর বিদীর্ণ রেখার ভিতর হতে মৃত্তিকার সন্তান অগণিত ক্ষুদ্রজীব তাদের মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হয়ে, বেরিয়ে প'ড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে প্রাণভয়ে ধাবিত হচ্ছে। লোলুপ পাখীর দল এসে তাদের দেহ হতে দেহাংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্ষুধার তৃপ্তি করছে। পাখীদের রঙ্গীন পাখায় সূর্য্যের কিরণ, কণ্ঠে কাকলী, তাদের নখে ও ঠোঁটে ঐ হতভাগ্য জীবগুলির রসরক্তের ক্লেদ।

চেয়ে দেখ,—মানবের প্রেমধর্ম্মকে বিড়ম্বিত ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে, প্রকৃতি দেবী প্রতিপদক্ষেপে তাঁরি সন্তানদের হৃদয়রুধিরে রঞ্জিত চরণের অলক্ত চিহ্ন ধরিত্রীর বুকে অঙ্কিত ক'রে চলেছেন।

শিকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আমার মনকেও যে এই

প্রশ্ন অধিকার করত না তা নয়। রাত্রিতে বনের মধ্যে শিকারে বসেছি। মাথার উপরে আকাশে ছায়াপথের চার পাশ থেকে নক্ষত্রেরা পৃথিবীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, ছায়াপথের ধিকি ধিকি অস্ফুট আলোতে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন বিশ্বের মৃদু প্রাণ-স্পন্দন। নীচে পৃথিবীর বুকে অন্ধকারের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের স্রোত বনের জটিলতায় বাধা পেয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠছে। বনে শিকারান্বেষী শ্বাপদের সতর্ক পদশব্দ, কখন বা আশাভঙ্গজনিত মৃদু গর্জ্জন। মাঝে মাঝে প্রাণভয়ে ভীত শিকারের পশুর দ্রুত পলায়নের শব্দ। আমি আমার আসনের নীচে শ্বাপদ-নিহত মানুষের বা পশুর শবদেহের দিকে চেয়ে উন্মুখ হয়ে বসে আছি, এই মৃত্যু-লীলায় যোগ দিয়ে। এই রকম সময়েই আমার মনকে ঐ চিন্তা অধিকার ক'রে বসত, আর আমার চোখের উপর থেকে বাহিরের সব কিছু মুছে যেত। কেবল প্রত্যাশিত জন্তুর পদশব্দে আমার চমক ভাঙ্গত, আবার বন্দুকটাকে দৃঢ়হস্তে চেপে ধরতাম, ঐ প্রশ্নের ধ্যান অন্তর্হিত হত।

কিন্তু কেউ কখনও এই "কেন" প্রশ্নের অসন্দিগ্ধ উত্তর পেয়েছে কি ? আমার ধারণা মানুষ জীব সেরূপ উত্তর কখনও পেতে পারে না। আমার কাছ থেকেও সে উত্তর আশা কোরো না। আমি কেবল এখানে প্রশ্নটা তুলেছি মাত্র, যা তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে কোন না কোন দিন নিদারুণ সত্য হয়ে সুমুখে এসে দাঁড়াবে। মানুষ, বিশেষতঃ যে একটুও চিন্তাশীল, একবার না একবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে পারে না।

কিন্তু যে দিন এই প্রশ্ন তোমার কাছে মর্ম্মান্তিক সত্য হয়ে

উঠবে, যে দিন মোহিনী নয়, ভীষণা তাঁর মুখের অবগুণ্ঠন খুলে তোমার দ্বারে এসে দাঁড়াবেন, সে দিন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে সাহসী হবে ত? এ কবি কল্পনা নয়,—সত্য, সত্য, পরম সত্য; এ আসবেই। দুর্ব্বল মানুষ কেবলি ঐ মূর্ত্তিকে চোখের আড়ালে রাখতে চায়; ভাবে, চোখে হাত দিয়ে চেপে রাখলেই বুঝি নিস্তার পাবে। কিন্তু তা হবার নয়। আর্ত্তস্বরে বধিরা সে ভীষণা তোমার অসহায় ভীরু হাত চোখের উপর থেকে ফুৎকারে সরিয়ে দিয়ে, তাঁর রক্তধারাচর্চিত কিরণোজ্জ্বল খড়্গ নিয়ে, তাঁর করাল দংষ্ট্রার আভায় তোমার ভিতর-বাহিরের আলো নিষ্প্রভ করে দিয়ে, যখন তোমার সুমুখে এসে দাঁড়াবেন তখন যেন তোমার অন্তরাত্মা তাঁকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হয়, এই প্রার্থনা কর। আমার মনে হয় মানুষের সাধনার মধ্যে এ একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা। মোহিনী যত সত্য, ভীষণাও ততই সত্য। সত্যের পূজা করতে হ'লে একটিকে অতিক্রম ক'রে, মাত্র অপরকে পূজা করলে কোন পূজাই সার্থক হবে না, সময় আসলে দেখা যাবে সবই বৃথায় হয়েছে, কেবলি নিরর্থক ভাববিলাসের পাঁকে গড়াগড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব দুঃখের প্রতীক ঐ অনিবার্য্য অপরিহার্য্য সত্য চিত্রের দিকে অকুণ্ঠ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে শেখা এই সাধনার একটা অঙ্গ। সময়ে নিজে ঐ রক্তস্রোতে স্রোত মিশিয়ে রক্তেরি অঞ্জলী দান করাও এই সাধনার অন্তর্গত, সে রক্ত আপন হৃদয়ের হোক বা অন্যের হোক। দেখছ না, ইউরোপের চীনের জাপানের মানুষ কি করছে? এ নীতিশাস্ত্রের ভালো-মন্দের কথা নয়, অলঙ্ঘনীয় বিশ্ববিধান ও জীবধর্ম্মপালনে যা

অপরিহার্য্য তারি কথা বলছি। এই জন্যই কুরুক্ষেত্র মাত্রেই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র, আর সেখানে বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ আদেশ—"যুধ্যস্ব"।

মানুষের স্বাভাবিক জীবধর্ম্মের অনুভূতিকে অতিক্রম না ক'রে, যে দৃষ্টিতে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ শিকারের আনন্দকে দেখেছিলেন তা তাঁর "বসুন্ধরা" কবিতা পড়লে বোঝা যায়। তিনি বলছেন:—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল,
অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন,—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ—সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভিবার স্বাদ।"

৩৪ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে ঐ অংশটি উদ্ধৃত ক'রে এই কথারই অবতারণা করেছিলাম।*

* প্রবন্ধের নাম—'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা' (বঙ্গদর্শন, নবপর্য্যায়, ১৩১৪ সন, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত)। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখন ঐ প্রবন্ধ পড়, তা হ'লে তাকে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখ' নামে প্রবন্ধটিও পড়তে বলি। এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, পড়লেই বুঝতে পারবে। 'দুঃখ' প্রবন্ধটি ১৩১৪ সন ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং কিছুদিন আগে ঐ প্রবন্ধ অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, পরীক্ষার জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিল।

বলেছিলাম যে সাধারণ মানুষের মনে জীবত্বহেতু যে স্বাভাবিক শোণিত-পিপাসা বর্ত্তমান দেখা যায়, কবির মনে তারি অলক্ষিত প্রতিবিম্ব দেখে আমাদের কুণ্ঠিত হবার কারণ নাই, কেননা যত দিন পৃথিবীর নিদারুণ সত্যবেদনার সম্মুখীন হবার বীর্য্যের উপলব্ধি না হয় তত দিন মানুষের হৃদয়ে এই "হিংসাতীব্র" আনন্দের অস্তিত্ব ভালোই মনে করি। হিংসার সঙ্গে এই বেদনার বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আর সেই জন্য এই হিংসাই অনেক সময়ে সত্য বেদনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে মানুষকে বীর্য্যবান করে। মাত্র রক্তদর্শনের ভয়ে যে মানব হিংসার আনন্দ পান করতে কুণ্ঠিত হয় তার সম্বন্ধে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন :—

"ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে,
কাপুরুষ! দয়ার আধার? ধন্য ব্যবহার!!
মর্ম্মকথা বলি কাকে।"

যে এত ভীরু সে স্বয়ং দয়ার পাত্র, সে কখনও অপরকে দয়া করতে পারে না, মহাযন্ত্রণার সম্মুখীন হবার বীর্য্য তার নাই।

অযাচিত ভাবে ও অনিবার্য্যরূপে যে যুদ্ধ মানুষের সুমুখে এসে উপস্থিত হয় সে যুদ্ধে বিমুখতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভীরুতাজনিত নয় কি? আজ আমাদের গৃহের দ্বারে এই যুদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পশ্চিমদ্বারের বাহিরেই রণ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। আমাদের পূর্ব্বদ্বারের বাহিরে মহাসাগরের বিপুল বিস্তারের উপরে, নদী বন পর্ব্বত ও জনপদের উপরে, স্তরে স্তরে যুদ্ধের মেঘ সজ্জিত হচ্ছে, আর মেঘ থেকে

মেঘে দম্ভ ও বিদ্বেষবাক্যের বিদ্যুজ্জ্বালা খেলা ক'রে যাচ্ছে। জলস্থল স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে, কখন বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে ঝড় উঠবে। মানুষের ইতিহাসে এই নিয়তি-প্রেরিত মহাযুগসন্ধিতে যে কেউ এবং যা কিছু আমাদের বড় আদরের ধন, আমাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত, আমাদের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাদের মুখ চেয়ে এই তামসিকতা বর্জ্জন করবার সময় আসেনি কি? ঘন ঘন যুদ্ধের জন্য ডাক আসছে আজ। মানুষের কণ্ঠের সেই আহ্বানে, একটু আগে যার কথা বলেছি, সেই অমোঘ আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে না কি? যার কণ্ঠ জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতে হোক সে আদেশ বহন ক'রে আনে, সে মানুষের উপরে অভিমানের ছল ক'রে বা অন্য ছলে সেই আদেশে বধিরতার ভাণ যে চিরপোষিত অপৌরুষকে ঢাকবার একটা ছদ্ম আবরণ নয় তা কে বলবে?

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিকারের আনন্দের সম্বন্ধে তাঁর উক্তির কিছু আলোচনা করতে গিয়ে বহু বৎসর পূর্ব্বে যৌবনে যে কথাগুলি মর্ম্মে অনুভব ক'রে বলেছিলাম আজও বার্দ্ধক্যে তার চেয়ে বেশী কিছু নতুন আলো পাইনি। আমি বৃদ্ধ, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি, এর চেয়ে বড় আলো থাকলে তোমরা তার অধিকারী হও।

সবশেষে বলি, আর তোমরাও আমার সঙ্গে বল,—

"অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ"

এই উপসংহার ১৯৪১, সেপ্টেম্বর মাসে লেখা হয়েছে

পরিশিষ্ট ও অশুদ্ধি সংশোধন

'শিকারের কথা' লিখবার সময় একটা বিষয়ে ভুল লেখা হয়ে গেছে, এমন কি মুদ্রণের সময়েও সে ভুলটা আমার চোখে পড়েনি। সেই জন্য পরিশিষ্টতে ঐ ভুল সংশোধন করতে হ'ল। ভুলটা এই ঃ—

১৯৭ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে,—"এখনকার দিনে একটা পূর্ণ-বয়স্ক আফ্রিকার সিংহ লম্বায় ৯ ফুটের কম নয়, এবং ওয়েল্‌স্‌ সাহেব নিশ্চয় 'আধুনিক সিংহ' বলতে ঐ সিংহেরই কথা বলেছেন। তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে সিংহ অন্ততঃ ১৮ ফুট লম্বা এবং সেই অনুপাতে উঁচু আর শক্তিশালী ছিল।"

প্রথমতঃ, এখনকার আফ্রিকার সিংহ লম্বায় সাধারণতঃ ১০ফুট বা তারও কিছু বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ রূপ একটি জন্তুর দ্বিগুণ আকারের জীব লম্বায় ২০ ফুট হয় না, এমন কি ১৮ ফুটও নয় ; কারণ আকারের তুলনা শুধু লম্বার হিসাবে হয় না, ঐ অনুপাতে উচ্চতা ও শরীরের পরিধি বা বেড়ও ধরতে হয়। ঐ অনুপাত ধরলে ২০ ফুট লম্বা সিংহ আকারে ১০ ফুট লম্বা সিংহের দুই গুণ না হয়ে আট গুণ হয়। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে এমন জিনিষের দ্বিগুণ আকার হ'তে গেলে ঐ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার সওয়া অর্থাৎ ১¼ গুণ হ'লেই হয়। কথাটা তোমাদের মধ্যে যারা ঘন ফল কসার নিয়ম জান তারা বুঝতে পারবে। এই হিসাব অনুসারে ওয়েল্‌স্‌ সাহেবের বর্ণিত আগেকার দিনের সিংহ লম্বায় অন্ততঃ ১২½ ফুট ছিল, এবং তার উচ্চতা ও স্থূলতাও সেই অনুপাতে ছিল। ঐরূপ একটা সিংহকেও বিরাট আকারের বললে ভুল হয় না। ১২½ ফুট মাপ ক'রে দেখলেই তা বুঝতে পারবে। উচ্চতার কথা না ধরলে একটা পূর্ণ-বয়স্ক হাতী তার চেয়ে লম্বায় বেশী হবে না,—অবশ্য শুঁড়ের দৈর্ঘ্য বাদ দিয়ে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটা ছাপার ভুল রয়ে গেছে। যথা ঃ—

১১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে "দেওরা"র স্থলে "দেওয়া" হবে।

১৩ পৃষ্ঠার ২৩ লাইনে "Royel"র স্থলে "Royal" হবে।

৫১ পৃষ্ঠার ২২ লাইনে "অমি"র স্থলে "আমি" হবে।

১১৬ পৃষ্ঠার ২০ লাইনে "একট"র স্থলে "একটা" হবে।

১৭৮ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের আরম্ভেই "মড়ির" স্থলে "মূর্ত্তির" হবে।

২৫১ পৃষ্ঠার ২০ ও ২১ লাইনে "শীকার"র স্থলে "শিকার" হবে।

সমাপ্ত